মাদার অফ ডেমোক্রেসি

মাদার অফ ডেমোক্রেসি

ইমরানুল হক চাকলাদার
(বীর মুক্তিযোদ্ধা)

মাদার অফ ডেমোক্রেসি
ইমরানুল হক চাকলাদার সম্পাদিত

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক
শহীদুল ইসলাম সরকার শহীদ

পরিবেশনায়
বিসিসি প্রকাশনী
৩৬, কাকরাইল, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

সার্বিক সহযোগিতায়
ফারুক হোসেন মোল্লা
ফখরুল ইসলাম বিলাস

মুদ্রণ
লতিফ প্রিন্টিং প্রেস
৪৮, ঋষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

মূল্য
৪২০ টাকা

উৎসর্গ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
তারুণ্যের অহংকার দেশনায়ক
তারেক রহমান-কে

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী
সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, বিএনপি

ভূমিকা

বেগম খালেদা জিয়া বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি সমুজ্জ্বল নাম, একটি স্বর্ণালী ইতিহাস। এই ইতিহাস জনগণের স্বাধিকারের ইতিহাস, দেশ ও মাটিকে ভালোবাসার ইতিহাস, দেশের মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার ইতিহাস এবং দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ও জীবন উৎসর্গ করার ইতিহাস।

এরই আলোকে আজকের সম্পাদিত গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি'।

গ্রন্থটিতে যেসকল নিবন্ধ স্থান পেয়েছে সবগুলোই ওই আদলেই লিখিত। সম্পাদক মহোদয় তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় গ্রন্থের নামটিও রেখেছেন বর্তমান সময়ের ক্রান্তিকালে অত্যন্ত যুগোপযোগিতায়। এ জন্য সম্পাদককে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। তিনি গ্রন্থটির ভূমিকা লিখতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অথচ আমার চেয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, গবেষক ও রাজনীতিবিদগণ রয়েছেন, যাঁরা এর জন্য শতভাগ যোগ্য, কিন্তু সম্পাদক মহোদয় আমাকে ভালোবাসেন, ভালো জানেন বিধায় অনভিজ্ঞ অভাজনের নিকটই এই গুরুদায়িত্বটুকু দিয়েছেন। আমি রাজনীতিতে তেমন সরব বা দক্ষ নই। আমি একজন সাধারণ শিক্ষকই বটে। তবে আমি চেষ্টা করি—সতত আমার মানবিক ও মনুষ্যত্ব গুণগুলোকে ধারণ, লালন ও পালন করার জন্য। এ গুণ অর্জন করার এখনো অনেক বাকি, বিশাল সমুদ্রের তীর অতিক্রমের একটি শুভ সূচনা করেছি মাত্র, তাও বিন্দু প্রমাণ।

যাক সে কথা। তবে এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখার জন্য আরেকজন নীরবে-নিভৃতে আমার নাম উচ্চারণ করেছেন, সে হলো হুমায়ুন কবির বেপারী, যে বেশ কয়েকটি সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। বিএনপির একজন নিবেদিত কর্মী, দুঃসময়ের বন্ধু, মিত্র। অথচ আমরা এর মূল্যায়ন করতে পারি না। এটি আমাদের ব্যর্থতা। উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং তাকে মূল্যায়ন করা একটি উত্তম মঙ্গলময় কর্ম। বৌদ্ধ শাস্ত্রের মঙ্গলসূত্রে এটি লিপিবদ্ধ আছে। আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলের মধ্যে এটি একটি অন্যতম মাঙ্গলিক কর্ম। গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শন করা এবং মাতা-পিতার সেবা, স্বজন-পরিজনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, সর্বোপরি আত্মোন্নয়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা—বৌদ্ধ মতে এগুলোই উত্তমকর্ম বা পুণ্যকর্ম।

এখন আসি প্রতিপাদ্য বিষয়ে।

'মাদার অফ ডেমোক্রেসি' একটি ঐতিহাসিক নাম যা বাংলাদেশে প্রথম অভিধাপ্রাপ্ত হলো। দেশের মানুষের কাছে যেমন এই নামটি অত্যন্ত গৌরবের, তেমনি বিশ্বের নানা দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জন্যও অতীব সম্মানের ও শ্লাঘার। শুধুমাত্র যাঁরা বিএনপি করে তাঁদের জন্য নয়, বরং যাঁরা করেন না এবং নানা দল-মতের ঊর্ধ্বে কিংবা জড়িত নন তাঁদের নিকটও শিরোনামটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। কারণ গণতন্ত্র না থাকলে দেশ বা রাষ্ট্র অচল ও প্রাণহীন হয়। এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আপোসহীন নেত্রী, গণতন্ত্রের জননী যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গিত করে জনগণের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি তথা সুখী ও নিরাপদ বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ বছর সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। এই সংগ্রাম স্বাধীনতা, সার্বভৌম রক্ষা এবং জনগণের স্বাধিকার ও গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা, এবং রাষ্ট্রের সকল স্তরে জনবান্ধব তথা জনকল্যাণমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন মোটেই সুখের নয়, বরং জেল-জুলুম, কারাবন্দির। তিনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি সরকারের কঠোর নির্মমতার মধ্যেও নিজের আদর্শ ও চারিত্রিক আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন এবং কারা-নির্যাতনের মধ্যেও গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোরভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। নেলসন ম্যান্ডেলার মতো তাঁর জন্যই 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি' অভিধাটি যথার্থ হয়েছে শতভাগ।

এই উপাধিপ্রাপ্তি নিয়ে নানা অভিযোগ, অনুযোগ ও সমালোচনা উঠেছে। সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ একটু গভীরভাবে আত্মদর্শনে নিমগ্ন হলেই এটি তাঁদের উপলব্ধিতে আসবে। তবে হ্যাঁ, যাঁরা নিদ্রিত, যাঁরা অন্ধ, যাঁদের উপলব্ধি ও অন্তর্দর্শন কম তারা হয়তো এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করবেনই। এ ছাড়া যাঁরা রাজনীতিতে এবং রাজনীতি দর্শনে অনভিজ্ঞ তাঁরাও নানা অনুযোগ, অভিযোগ আনবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বিএনপির প্রতিপক্ষ যারা, তারাতো প্রতিহিংসাবশতঃ বলবেই, এটাইতো বর্তমান রাজনীতির মূল দর্শন।

'মাদার অফ ডেমেক্রেসি' গ্রন্থটি তেমন বৃহৎ-আকার না হলেও যে সকল লেখায় এটি সমৃদ্ধ তাতে গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা যথার্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন—প্রথম যেই লেখাটি, সেটি ম্যাডাম নিজের তিনি লিখেছেন—'১০ বছর শাসনামলে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অধিকার। তাঁর এই নিবন্ধটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন এবং জাতীয়তাবাদী দলের স্বনির্ভর ও উন্নয়নমূলক বাংলাদেশ গড়ার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী দলের ১৯ দফা কর্মসূচিসহ কর্মশক্তিতে নারী ও পুরুষের বৈষম্যহীন দর্শন ও দিকদর্শন প্রতিভাত হয়েছে। ম্যাডাম খালেদা জিয়া নারীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল, দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নারীশক্তিকেই জাগাতে চেয়েছেন। সাথে সাথে শিশু অধিকার, শিশুর লেখাপড়া, শিশুদের যত্ন-সেবা, তাদের সংরক্ষণসহ ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে নতুন দিকদর্শন দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে নারী উন্নয়নের উদাহরণস্বরূপ হেনরি লংফেলো'র বিখ্যাত কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। টীকা-টিপ্পনীসহ প্রবন্ধটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ বলা যায়।

পরবর্তীতে সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা। বিশেষ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়ার ধারণা, বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি, বেগম জিয়ার সৃজনশীল নীতি, বেগম জিয়ার সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি অতি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতিতে বেগম জিয়ার আদর্শবাদিতা, ম্যাডামের ভিয়েতনাম সফর, জাতিসংঘ ও বেগম জিয়া, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা (সার্ক) ও বেগম জিয়া এবং জাতিসংঘ ও বেগম জিয়া প্রভৃতি আলোচনা প্রবন্ধটিকে পররাষ্ট্রনীতি-দর্শনে গুরুগম্ভীর করেছে।

বেগম জিয়ার স্বপ্নের বাংলাদেশ এবং স্বপ্নের পৃথিবী এশিয়ান শতক ও বাংলাদেশ এবং ভিশন-২০৩০—এই তিনটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্বপ্নপূরণের একটি অঙ্গীকার। বলা বাহুল্য বিএনপি বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং আধুনিক আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েই ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন করেছিল। এতে ২৫৬টি ভিশন স্থান পেয়েছিল—যেখানে গণতন্ত্র, জাতিগঠন, সুশাসন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, নৈতিকতার শক্তি পুনরুদ্ধার, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, অর্থনীতি, গবেষণা ও উন্নয়ন, জনমিতিক লভ্যাংশ, শিক্ষা ও মানবসম্পদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিদেশে কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ, মিডিয়া ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, কৃষি ও কৃষক, শ্রমিক কল্যাণ, নিরাপদ খাদ্য ও ওষুধ, স্বাস্থ্যসেবা, যুব-নারী ও শিশু, জলবায়ু পরিবর্তন, পানিসম্পদ নীল অর্থনীতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ (সড়ক, রেল ও নৌপথ), পর্যটন, সম্পদ সংরক্ষণ, সামাজিক ব্যাধির সমস্যা, ভূমিকম্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অনগ্রসর অঞ্চল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮-তে জাতির উদ্দেশ্যে বেগম খালেদা জিয়া সংবাদ সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক ঐতিহাসিক ভাষণ। তিনি প্রথমেই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন—"দেশের জনগণ গণতন্ত্রপ্রিয়। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই এই জাতিকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে এগিয়ে দিয়েছিল।" তিনি আবার বলেছেন, "গণতন্ত্রের প্রতি এদেশের জনগণের প্রবল অনুরাগের কারণেই আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধাত হিসেবে গণতন্ত্রকেই বেছে নিয়েছি।"

বলতে হয়, তাঁর প্রতিটি ভাষণে গণতন্ত্রের কথা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা। এ জন্যই তিনি 'গণতন্ত্রের মা'। ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার কারাবরণ হলেও তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন—"ফিরে আসবো আমি। তোমরা অপেক্ষা করো।" এমনকি গুলশানের বাসা থেকে আদালতের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন সময়েও সকলকে বলছেন, "মন খারাপ করো না, শক্ত থাকো, ফিরে আসবো আমি।" তিনি আরও বলেছেন—"প্রতিহিংসার বিচারে আমি বন্দি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জনগণের আস্থার প্রতীকও আজ বন্দি।" সত্যিই এসব উক্তিগুলো দেশমাতৃকার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, দেশপ্রেম রক্ষা এবং এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে লীন হওয়ার অমোঘ বাণী।

"মাদার অফ ডেমোক্রেসি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা" নিবন্ধটি ম্যাডামের সম্মাননা পাওয়ার উপরই লেখা। এ নিবন্ধে ম্যাডাম খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল সফল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। যাঁরা এ ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন তাঁদের জন্য এ লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও বেগম খালেদা জিয়া"—লেখাটি অধ্যক্ষ মো. তারিকুল ইসলামের। তাঁর লেখায় তিনি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গণতন্ত্র ও সংগ্রামের জন্য নানা রিস্কের কথা তুলে ধরেছেন। এগুলো গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে মহিমাসমৃদ্ধ, গৌরবোজ্জ্বল, অনুকরণীয় বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম-এর লেখাটি ভিন্ন আঙ্গিকের। শিরোনামটি বেশ ভালো। যেমন—খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবদানের

বিপরীতে তাঁর অন্তরীণ থাকা : দেউলিয়া রাজনীতির ঐতিহাসিক স্মারক। এ প্রবন্ধে মা, মাটি ও মানুষের সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং মা কেন? এর বিস্তৃত পটভূমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও।

"ম্যাডাম থেকে মমতাময়ী মায়ের আসনে খালেদা জিয়া"—মোবায়েদুর রহমান-এর লেখাটি তিনপর্বে বিভক্ত দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ। লেখাটিতে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা কূটকৌশল এবং বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে, কারা-অন্তরীণ বা গৃহবন্দি করে তারা বিপদে পড়েছে বা আছেও বলে তিনি মন্তব্য করেছেন এবং লিখিত তিনপর্বে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রুমিন ফারহানার "বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার লড়াই আপনারও" এবং "বেগম খালেদা জিয়া—হৃদয়ে প্রোথিত নাম"—এই দুটি নিবন্ধে রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ঘটনা বিশ্লেষণসহ ম্যাডামের অপরিহার্যতা এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। নেতৃত্বে ও আন্দোলন-সংগ্রামে ম্যাডামের দূরদর্শিতা, ত্যাগ এবং অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছেন এবং ম্যাডামের ক্ষমতার সময়কালীন বহু ঘটনার অবতারণা করেছেন। দুটি নিবন্ধই চমৎকার বর্ণনাময় সমৃদ্ধি।

"বেগম জিয়া—একদলীয় শাসনের পথে একমাত্র বাধা"—লেখাটি বেশ চমৎকার। লেখাটি ড. জাহিদ দেওয়ান শামীমের। নিবন্ধের শিরোনামের সাথে বর্ণনা ও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভীষণ সাজুয্য দেখা যায়। নিবন্ধটি বেশ ঘটনাবহুল ও তথ্যসমৃদ্ধ। "বেগম খালেদা জিয়া : মানচিত্রে মিশে থাকা নাম"—এটি ড. মোর্শেদ হাসান খানের হৃদয়মিশ্রিত নিবন্ধ। লেখাটিতে তিনি শুধু মাত্র ম্যাডামের প্রশংসা করেননি বরং সরকার, জনগণ ও মৌলিক চাহিদা তথা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিএনপির রাজনীতির একটি আদর্শ ধারাকে মূল্যায়ন করেছেন। যেহেতু তিনি কমার্সের অধ্যাপক এবং বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সহ-সম্পাদক সেই আঙ্গিকে এবং ওই দৃষ্টি রেখেই নিবন্ধটি তৈরি করেছিলেন। শিক্ষাখাত, নারীর ক্ষমতায়, টেলিকমিউনিকেশন, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় সম্প্রীতি, ইত্যাদি নানা বিষয় বেশ ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বশেষ সৈয়দ আবদুল আহমদ ও জাকারিয়া চৌধুরীর দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত গ্রন্থটিকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে। টাইটেলও বেশ ভিন্ন—"প্রসঙ্গ : বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ"—এ নিবন্ধে সৈয়দ আবদাল আহমদ বেগম জিয়াকে কেন বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে এবং তাঁর মানসিক দিক, আইনগত অধিকারসহ বহু মূল্যবান তথ্য উপাদান দিয়ে নিবন্ধটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে জাকারিয়া চৌধুরী "বেগম জিয়ার প্রস্তাবনা—একটি স্থায়ী নির্বাচন কমিশন গঠনের রূপরেখা" শীর্ষক নিবন্ধে জাতীয়তাবাদী দল ও ম্যাডাম খালেদা জিয়ার গৌরবনীয় কর্মসমূহকে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া নির্বাচন সম্পর্কিত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নিরপেক্ষতা নিয়ে নানা প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করেছেন। নানাদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটি সংকলিত গ্রন্থ হলেও চমৎকার, তথ্যসমৃদ্ধ ও পঠন-পাঠনসহ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মকাণ্ডের বহু তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে এ নিবন্ধটি।

সর্বশেষ আমার বক্তব্য হলো : গ্রন্থটি অসাধারণ—বর্তমান দেশের ক্রান্তিকালে এবং জনগণের বিবেকবোধ তৈরির ক্ষেত্রে ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। গ্রন্থটি জাতীয়তাবাদী শক্তি ও আদর্শের একটি প্রাণশক্তি হিসেবেও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আবারও বলছি, গ্রন্থের নিবন্ধগুলো চমৎকার ও অসাধারণ বলা যায়। প্রতিটি লেখক তাঁর চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং চিন্তা ও মেধার মৌলিকত্ব দিয়ে রচনা করেছেন। এ জন্য আমি সকল লেখক ও প্রবন্ধকারদেরকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

গ্রন্থটি বিএনপি আদর্শের রাজনীতি চর্চার বিশাল উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। বিএনপির জয় হোক। দেশমাতা খালেদা জিয়ার গৃহবন্দি চিরতরে বিনাশ হোক। শহীদ জিয়া অমর হোক। আগামীদিনের দেশনায়ক তারেক জিয়া দেশে আগমন করুক—এই হোক আমার প্রার্থনা ও কামনা।

বিশ্বের সকল জীব সুখী হোক। সকলেই দুঃখ থেকে মুক্ত হোক। বিশ্বে শান্তি বর্ষিত হোক।

অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া
(একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বৌদ্ধতত্ত্ববিদ)
সুপারনিউম্যারারি প্রফেসর
পালি এন্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সভাপতি, বিশ্ব বৌদ্ধ ফেডারেশন– বাংলাদেশ চ্যাপ্টার
উপদেষ্টা, বিএনপি চেয়ারপারসন।

সম্পাদকীয়

প্রথমে আমি মার্জনা চেয়ে নেই এ গ্রন্থের যাঁরা নিবন্ধ লেখক তাঁদের কাছে। কারণ আমি এ গ্রন্থ সম্পাদনার উপযুক্ত নই, কিন্তু হৃদয়ের টানে এবং বিএনপিসহ ওই আদর্শের সকল সম্মানিত গুণী ও বরেণ্যদেরকে শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসী বলেই আজকে এ বিষয় নিয়ে একটি গ্রন্থ সংকলনের উদ্যোগ নিয়েছি।

দীর্ঘদিন থেকে এরকম একটি গ্রন্থ সংকলনের ইচ্ছা পোষণ করি, বিশেষ করে ম্যাডাম খালেদা জিয়ার অপরিসীম সেই ত্যাগ, গণতন্ত্রের জন্য সেই সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের দুঃখ, বেদনা, কষ্ট কারা-নির্যাতন, গৃহবন্দি ও অন্তরীণ—একথা ভাবলেই মনে প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হয় যেন কিছু করি। এ ছাড়া সম্প্রতি তিনি 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি' যেই মহৎ সম্মান ও উপাধিটি পেলেন সেটি পাওয়ার পর মন আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে যেন কিছু করি এবং কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই আজকের এই গ্রন্থ সংকলন। এখানে আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই, আমি শুধুমাত্র উদ্যোগটা নিয়েছি।

এ মহৎ কর্মে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছে বিএনপির দুঃসময়ের নিবেদিত ও অকুতোভয় কর্মী হুমায়ুন কবির বেপারী। তাঁর প্রেরণায় আমি এ কাজে হাত দিয়েছি এবং সাহস করেছি। কারণ প্রবাস জীবনে থেকে সুদূর মাতৃভূমির এসকল প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব হতো না, যদি সে এগিয়ে না আসতো। তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। সে এ পর্যন্ত আমার এবং আমাদের অনেক মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছে, যা বিএনপির জন্য অনেক গৌরবের। দলের জাতীয়তাবাদী শক্তির জন্য এরকম নিবেদিত কর্মীর প্রয়োজন, যারা পদ-পদবী ছাড়া দুঃসময়ে– সংকটে দলের জন্য জীবন উৎসর্গ করে।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন কৃতী-পণ্ডিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক, শিক্ষায় একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া। তিনি অনেক কষ্ট করে, শ্রম দিয়ে এবং গ্রন্থের মান বৃদ্ধির জন্য সকল দায়িত্ব পালন করে এই ভূমিকাটি লিখেছেন। ভূমিকাটি চমৎকার ও যথার্থ হয়েছে। তিনি সঠিকভাবে সব তথ্য তুলে ধরে, সব নিবন্ধের মান ও লেখকদের বিচার করে তাঁর ভূমিকাটি রচনা করেছেন—এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনিও এগিয়ে না এলে এই গ্রন্থ সংকলনের কাজটি ত্বরান্বিত হতো না। আমি জানি—তিনি আমাকে ভালো জানেন এবং ভালোবাসেন বলেই এই মহৎ কর্মটি তিনি সম্পাদন করেছেন। আমি আবারো স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি নীরোগ-দীর্ঘায়ু হোন।

গ্রন্থটির প্রকাশক এবং নানাভাবে যারা যুক্ত তাদের জন্য রইলো শুভ কামনা এবং অকৃত্রিম দোয়া। গ্রন্থটি জাতীয়তাবাদ শক্তিকে বৃদ্ধি এবং জাতীয়তাবাদ আদর্শের নেতা-কর্মী ও গ্রন্থ পাঠকদের সামান্যতম উপকারে এলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ইমরানুল হক চাকলাদার (বীর মুক্তিযোদ্ধা)

সূচিপত্র

১০ বছরের শাসনামল : নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অধিকার ১৭

সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতি ৪৭

ভিশন-২০৩০ : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি ১০০

জাতির উদ্দেশ্যে বেগম খালেদা জিয়া– সংবাদ-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ ১৪৮

৮ ফেব্রুয়ারি বেগম খালেদা জিয়ার কারাবরণ ১৫৭

মাদার অব ডেমোক্রেসি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা : প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া ১৬১

টার্গেট বাংলাদেশ টার্গেট জিয়া পরিবার : আবদুল হাই শিকদার ১৬৮

বেগম খালেদা জিয়া : মানচিত্রে মিশে থাকা নাম : ড. মোর্শেদ হাসান খান ১৭৪

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও অর্থনীতির ভীত নির্মাণ করেন বেগম খালেদা জিয়া : মোস্তফা কামাল মজুমদার ১৮২

প্রসঙ্গ : বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ : সৈয়দ আবদাল আহমদ ১৮৮

খালেদা জিয়া : মাদার অফ ডেমোক্রেসি : ড. এম মুজিবুর রহমান ১৯৪

বেগম খালেদা জিয়া—হৃদয়ে প্রোথিত নাম : রুমিন ফারহানা ২৪৮

বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার লড়াই আপনারও : রুমিন ফারহানা ২৫২

ম্যাডাম থেকে মমতাময়ী মায়ের আসনে বেগম জিয়া : মোবায়েদুর রহমান ২৫৮

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবদানের বিপরীতে তাঁর অন্তরীণ থাকা : দেউলিয়া রাজনীতির ঐতিহাসিক স্মারক : প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম ২৬৪

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও বেগম খালেদা জিয়া : অধ্যক্ষ মোঃ তারিকুল ইসলাম ২৭০

বেগম জিয়ার প্রস্তাবনা—একটি স্থায়ী নির্বাচন কমিশন গঠনের রূপরেখা : জাকারিয়া চৌধুরী ২৭৮

বেগম জিয়া—একদলীয় শাসনের পথে একমাত্র বাধা : ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম ২৮৩

১০ বছরের শাসনামল
নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অধিকার

ভূমিকা

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্নই ছিল বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ। তাই তিনি বিভিন্ন সময়ে স্বনির্ভর উন্নয়ন প্রকল্পের কথা বলতেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি ধারা ছিল—'দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা' এবং 'নারী জাতিকে সমাজে তাদের ন্যায্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা'।[১] শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণাই করেননি, সেই অনুযায়ী তিনি সমাজ উন্নয়ন ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার কাজও শুরু করেছিলেন। তার অবর্তমানে তার সুযোগ্য সহধর্মিণী বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে এবং নারী ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশের অগ্রগতি অর্জনের প্রধান উপায় হলো সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।[২] বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হলো নারী। একজন নারী বিশ্বের সৃষ্টিধারার ৭০ শতাংশ কাজ করলেও তা মূল্য দ্বারা বিবেচিত না হওয়ায় পুরুষের তুলনায় নারীরা পিছিয়ে রয়েছে সর্বক্ষেত্রে।[৩] একটা সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের নারীসমাজ শিক্ষায় অনগ্রসরতা, সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার, রাজনীতি সম্পর্কে অসচেতনতা, পুরুষ ও সমাজ কর্তৃক নির্যাতন ও নিষ্পেষণের কারণে অনেক পিছিয়ে ছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান ভোগ করতো। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তার সুযোগ্য সহধর্মিণী এই দিকটিতে দৃষ্টি দিয়ে নারীশিক্ষা তথা নারীদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে

বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তাই নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক অধিকার ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের সদিচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে নারীর সোচ্চার ভূমিকা ও দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্য।[৪] আর নারীর এই সোচ্চার ভূমিকা এবং প্রশাসন পরিচালনায় নারীর দৃশ্যমানতা—এর পেছনে অবদানটুকুর অনেকাংশই এদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক মহীরুহ তথা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার অবদান। কারণ তাঁরা দুজনই নারীকে তার অধঃস্তন ভূমিকা থেকে উঠিয়ে এনে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে দাঁড় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে নারীসমাজের উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক। এদেশের মোটামুটি নব্বইভাগ মানুষের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ধর্মে পুরুষদের অগ্রগামী ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। আর ধর্মের প্রভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থাও প্রভাবিত। তাই পুরুষ মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা উপভোগ করে থাকে। নারীদের ভূমিকা এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর তথা অধঃস্তন। এদেশের নারীরা সুবিধাবঞ্চিত এবং বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার। যদিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে বিশ্বব্যাপী মানসভ্যতার অনেক বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারীরা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অগ্রগতির ছোঁয়া পায়নি তেমনভাবে। তারা এখনো সেই সনাতন সমাজব্যবস্থার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। নারীরা এখনো এদেশে অর্থনৈতিভাবে পিছিয়ে, বঞ্চনার শিকার, সম্পদের অধিকার থাকলে বঞ্চিত এবং বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত। আর এই অত্যাচার ও কুসংস্কার থেকে নারীকে মুক্তি দিতে অনেক নারী সংগঠন শুরু করেছে সামাজিক আন্দোলন। এই অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, তার কাজের মূল্যায়ন করা প্রভৃতি। তাই এতো প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও এদেশের নারীরা নিজ নিজ যোগ্যতাবলে এগিয়ে এসেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও জনকল্যাণমুখী কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আর নারীদের এই অগ্রগামী ভূমিকায় সরাসরি সহায়তা দান করে এবং নারী উন্নয়ন ও জাগরণকে আরো দ্রুত করতে এদেশের প্রথম নারী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিনা বেতনে নারী শিক্ষা, নারীদের জন্য উপবৃত্তির প্রচলন, নারীদের জন্য বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়নে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন, অসহায় নারীকে সামাজিক সহায়তা প্রদান, তাদের আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা, দুঃস্থ নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল বৃদ্ধি করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর জন্য শতকরা ত্রিশভাগ কোটা বরাদ্দ করা। তবে সবচেয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন হলো সামরিক বাহিনীতে নারীর অন্তর্ভুক্তি। অর্থাৎ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য এদেশে যা যা করণীয় ছিল তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতের ছোঁয়া রয়েছে। তিনি এদেশের নারীদের সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাবান হিসেবে সব সময় দেখতে চেয়েছেন।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে এনজিওগুলোও তাদের কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পেরেছে। এ সময়ে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি নারী উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের নারীরা তাদের সাধ্যের বেশির কাজ করে যার কোনো মূল্যায়ন নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, যেমন গ্রামীণ নারী সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা কাজ করে থাকে[৫] অথবা ১৪-১৮ ঘণ্টা প্রতিদিন কাজ করে।[৬] এর সঙ্গে বাচ্চাদের লালন-পালন, সাংসারিক কাজ, আশপাশের জমিতে সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, রান্নাবান্না প্রভৃতি কাজ করে থাকে।[৭] নারীরা তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম বর্ণ শ্রেণী, বিবাহিত বা অবিবাহিত নির্বিশেষে এই সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়।[৮] গ্রামীণ নারীরা হলো দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষার নিম্নহার, পুষ্টিক্ষেত্রে নিম্নমাত্রা গ্রহণ, মৃত্যুর অধিক হার প্রভৃতি তাদের এই দুর্দশায় নিয়ে এসেছে। এছাড়া সামাজিক নিষ্পেষণ ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য তারা সাধারণত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না এবং পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও সামাজিক কারণে পর্দার অন্তরালে থাকতে হয় তাদের।[৯] এই পরিস্থিতিকে উন্নত করার জন্য সরকারি অনুমোদনক্রমে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিও বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। ১৯৯১ সালে ব্র্যাক মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং উন্নয়ন প্রোগ্রাম (Women's Health and Development Programme

(WHDP) শুরু করে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করার লক্ষ্যে।[১০] ব্র্যাক এই দিকটিতে অনেক বেশি জোর দিয়েছে। আর এ ধরনের প্রকল্পগুলো হাতে নেয়ার পেছনে ছিল সরকারি অনুমোদন ও উৎসাহ। এর অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন সরকারপ্রধান বেগম খালেদা জিয়া। তাঁকে যারা দূর থেকে দেখেছেন বা দেখছেন, তারা ভাবতেও পারবেন না তিনি কতোটা শক্তধাতুতে তৈরি। তার আবির্ভাবকে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আলোকোজ্জ্বল হিসেবে বর্ণনা করেছেন আল মাহমুদ।[১১] রাজনৈতিক দিক থেকে তার সততা, আপসহীন মানসিকতা, দৃঢ়সংকল্প—এসবই তাঁকে অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়াকে সবকিছুর শীর্ষে তুলে নিয়ে এসেছে। যার জন্যে তার স্বামীর মৃত্যুর পর একজন গৃহিণী হয়েও শক্ত হাতে তিনি দলের হাল এবং পরবর্তীকালে দেশের হাল ধরেছেন। তার চরিত্রের দৃঢ়তা, তার মনোবল, অনমনীয় আচরণ, আপসহীন ব্যক্তিত্ব—এসবই জনগণের কাছে তাকে অনুকরণীয় করেছে। এর মাধ্যমেই তিনি জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনকালে বেগম খালেদা জিয়া যে অমিত বিক্রম এবং আপসহীনতা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। তার এই আপসহীন মনোভাব এবং এর দৃঢ়চেতা নেতৃত্বের কারণে তার স্বামী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপি এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলো শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। এর দলই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত এবং মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন বিএনপি বা বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু এই দলকে শক্ত ভিত্তির ওপর তিনি দাঁড় করিয়ে যেতে পারেননি। তার অকাল প্রয়াণের পর এই গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে তার সুযোগ্য সহধর্মিণীর ওপর। আর এই গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। তারা উভয়েই দেশের উন্নয়ন বলতে বুঝতে গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মসূচি সফল করতে যে বহুদলীয় খোলামেলা গণতান্ত্রিক আবহাওয়া প্রয়োজন একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন তারা দুজনই। এজন্যই রাজনৈতিকভাবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পরাভূত করার শক্তি কারো নেই। সাধারণ মানুষ বিপুল ভোটের মাধ্যমে তাকে জয়ী করেছে কারণ

তার শুধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই নয়, তার মমতাময়ী মাতৃরূপও তাদের ভরসা জোগায়। আর তাদের এই ভরসার কারণেই বেগম খালেদা জিয়ার ওপর দায়িত্ব এখন অনেক।

নারী উন্নয়ন

প্রসিদ্ধ মার্কিন কবি হেনরি লংফেলো (Henry Longfellow)-র একটি বিখ্যাত কবিতার লাইনে বলেছেন : '...আদম হালচাষ করতেন আর হাওয়া সুতা কাটতেন' ('... Adam tilled and Eve span') (যদিও এ কবিতাটি দিয়ে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে তবুও) এতেও বোঝা যায় নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সভ্যতা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়েছে। কালের বিবর্তনে পুরুষ ক্রমশ নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীকে সুদীর্ঘকাল গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে। মহান সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে যেসব নবী প্রেরণ করেছেন তাতে তারা যে ঈশ্বরের বাণী বহন করে আনেন, সেগুলোতে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-র এর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়, তার সমষ্টিগত রূপ কোরআন নামে পরিচিত এবং তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মে প্রথম নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ আসাদ যথার্থই বলেছেন, ইসলাম ধর্মে নারীকে তার নিজ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এ কারণে নয় যে নারী মা, বোন, স্ত্রী অথবা কন্যা হিসেবে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বরং তিনি সম্পত্তির হকদার। তিনি নিজের ব্যবসা চালাতে পারবেন, নিজ সম্পত্তির দেখাশোনা করতে পারবেন এবং তার নিজের বিবাহের বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন।[১২] আগে নারীরা ছিল অবহেলিত, গৃহে আবদ্ধ কিংবা পুরুষ কর্তৃক অত্যাচারিত ও নিগৃহীত। কিন্তু ইসলামের মহানবী তাঁর জীবিত অবস্থায় নারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার দিতেন। নারীদের যে তিনি অত্যন্ত সম্মান, মর্যাদা ও সমঅধিকার দিতেন, তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এ কারণেই তিনি যখন মদিনা থেকে প্রথমবার তার জন্মদান মক্কায় সাহাবিদেরসহ যান, তখন তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী উম্মে সালমাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন যা তাঁর জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়। কারণ সেবার তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ সফলকাম না হলেও মক্কায় কুরাইশদের শত্রুতার কারণে যে বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, তখন হুদায়বিয়ার সন্ধি করে তিনি আপাতদৃষ্টিতে আত্ম-অবমাননাকর শর্তাবলী

মেনে নিয়ে মদিনায় ফিরে যেতে বাধ্য হলেও তাঁর পুরুষ সাহাবিদের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর স্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিয়ে যে সঠিক কাজটি করেছেন পরে তা প্রমাণিত হয়েছে।[১৩] এছাড়া তাঁর দৌহিত্রী জয়নবের কথা বলা যায়, যিনি উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদের রাজধানী দামেস্কের প্রকাশ্য দরবারে বিভিন্ন পণ্ডিতের সমাবেশে বক্তৃতা করতেন। তিনি অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন। স্পেনের মুসলিম শাসনামলে মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটাই মুসলমানদের তৎকালীন বিশ্বে শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপাদান।[১৪] অর্থাৎ সেই আমলেই নারীদের শিক্ষা বিস্তারের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল এবং তাদের প্রকাশ্যে কাজ করার অনুমতিও ছিল।[১৫] বাংলাদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের দিকে প্রথম দৃষ্টি দেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনিই প্রথম মেয়েশিশুদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরে তার সুযোগ্য সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত নারীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এভাবে মুসলিম শাসন আমল থেকে নারীদের তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার দেয়ার প্রচলন শুরু হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে ইসলাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় কৃষ্টি ও আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারীরা ক্রমান্বয়ে গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে পড়তে থাকে।[১৬] বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশেও নারীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে এই এলাকার আচারও সমান অধিকার পায়। অবশ্য মুহাম্মদ আসাদ যথার্থই বলেছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষকে সকল ক্ষেত্রে বিশেষত জৈবিক কারণে তাদের পার্থক্যের জন্য সমদৃষ্টিতে দেখা হয় না।[১৭] বিশেষত সম্পত্তির অধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব কিংবা আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমতা একেবারেই নেই। এতদ্বসত্ত্বেও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা জেন্ডার সমতা মেনে চলে বলে বর্তমানে গর্ববোধ করলেও এবং ইসলামকে অনেকটা হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালালেও পাশ্চাত্য যে মুসলমানদের চেয়ে অধিক সম্মানজনক অবস্থানে আছে একথা মেনে নেয়া কষ্টকর। কারণ সেখানকার নারী অনেক সময়ই নির্যাতিতা এবং সেখানে একক বা Single parent Family অনেক বেশি, তাই সেখানে নারীদের দায়দায়িত্ব মুসলিম নারীদের চাইতে অনেক বেশি। বাংলাদেশেও এই trend শুরু হয়েছে, তাই নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পেলে আমাদের পক্ষে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে

উঠবে। এই দিক দিয়েও তাই নিম্নস্তর থেকেই নজর দিয়েছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং তার সুযোগ্য স্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

আধুনিক যুগে নারী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভূত হয় গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে।[১৮] এ ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় এবং অগ্রণী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে একজন ডেনিশ মহিলা এস্টার বোজেরাপ (Ester Boserup)। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে তার উইম্যানস রোল ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (Woman's Role in Economic Development শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশের মাধ্যমে 'উন্নয়নে নারী' (Woman in Development) বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র পঠিতব্য বিষয় হিসেবে পাঠ করার পথ উন্মুক্ত করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এর পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনভিত্তিক একদল উন্নয়নের পেশার সঙ্গে জড়িত নারী 'উন্নয়নে নারী' (Woman in Development) কথাটির প্রচারণা চালান।[১৯] তখন থেকে উন্নয়নের কাজে সংশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম, যেমন দাতা সংস্থাগুলো, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত নারীরা এটির পক্ষে ওকালতি চালানো শুরু করেন। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী উন্নয়নকর্মীরা সহায়তায় এগিয়ে এসে ১৯৭৬-১৯৮৫ দশককে 'নারী দশক' (Decade for Women) হিসেবে ঘোষণা করেন।[২০] এদের প্রধান কাজ ছিল বিশ্বব্যাপী নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য উন্নত শিক্ষাদান, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্য ও কল্যাণমুখী সেবা প্রদান। মোটের ওপর তাদের দাবির মূলে ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার ও পুরুষের সমানাধিকার। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নারী উন্নয়নে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীকালে নারী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়। সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নারীদের নানামুখী সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনেকগুলো চুক্তি প্রণয়ন, ইত্যাদি।[২১] বাংলাদেশও এর বাইরে ছিল না। বাংলাদেশেও এই উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন বেগম খালেদা জিয়া।

স্বাভাবিকভাবেই জাতিসংঘ এ ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে। জাতিসংঘের

সাধারণ পরিষদ ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' (International Women's Year) ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় মেক্সিকো সিটিতে প্রথমবারের মতো নারীদের বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারী দশক চলাকালে ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় এবং ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।[২২]

ইতোমধ্যে নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে জাতিসংঘ যে প্রকল্পগুলো হাতে নেয় তার অর্থায়নের লক্ষে নারীদের জাতিসংঘ তহবিল (UN Fund for Women, সংক্ষেপে UNIFEM) নামক অঙ্গসংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৭৯ সালে কনভেনশন অন দিন এলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন (Convention on the Elimination Fo Discrimination Against Women, সংক্ষেপে CEDAW) শীর্ষক পদপ্রদর্শনকারী চুক্তিটি গৃহীত হয়।[২৩] নারীদের অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা জাতিসংঘকে বেশ কয়েকটি অঙ্গসংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ডিভিশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব উইমেন (Division For the Advancement of Women) এর কথা যেটি নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয় এবং নারীদের এগিয়ে নেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। এ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ডিভিশনটি নারীদের নীতিনির্ধারক অঙ্গ-সংস্থা কমিশন অব দি স্টেটাস অব উইমেন (Commission of the Status of Women), সংক্ষেপে CSW) এবং নারীদের অধিকার সম্পকিত ১৯৭৯ সালের চুক্তিটি ঠিকমত বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য কমিটি অন দি এলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন (Committee on the Elimination For Discrimination Against Women, সংক্ষেপে CEDAW) নামক যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেগুলোকে প্রশাসনিক সমর্থন জোগায়। এ ডিভিশনটিই এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ আয়োজিত নারীদের ওপর চারটি (উপরে উল্লিখিত তিনটিসহ) বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছে যেগুলো মূলত নারীদের মর্যাদা নির্ধারণের পক্ষে নিবেদিত।[২৪]

নারীদের চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের

অংশগ্রহণের ব্যাপারে চারটি দিক, যথা—সমতা (equality), শিক্ষা (education), নিয়োগ (employment) ও ক্ষমতায়[২৫] (empowerment) সংশ্লিষ্ট থাকলেও শুধু উন্নয়নের নারীদের অবদানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাগুলোর ওপরই বেশি জোর দেয়া হয়। বিশেষত এ কারণে যে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিরসনে ও দারিদ্র্যদূরীকরণে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সুযোগ দেয়ার বিষয়ে এই চারটি দিক (সমতা, শিক্ষা, নিয়োগ ও ক্ষমতায়ন) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কেও জোর দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে নারীর পক্ষে কোনো অবদান রাখার চিন্তা করাও অবাস্তব। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সাধারণত বোঝায় তাদের নিপুণভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে লাগানোর জন্য তাদের সামনে সুযোগ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ 'তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিকাশের পদ্ধতি যা তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অধীনতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোকে নিশ্চিত করবে এবং একই সঙ্গে নারীরা যে সব বহুমুখী ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করে সে অবস্থান থেকে তাদের জীবন, তাদের সংগঠনসমূহ এবং তাদের নির্দিষ্ট প্রসঙ্গসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য গড়ে তোলার বিষয়াবলী' সম্পর্কিত বিষয়গুলো হলো ক্ষমতায়নের আওতাভুক্ত। (... a Process of personal and collective growth that guarantees the challenging of the difirent forms of subordination, as well as the capacity to develop control of their lives, their organizations, and their specific contests from any position and/or from any of the multiple personal and social relationsships is which women participate)।[২৬] বাংলাদেশেও এর ছোঁয়া লেগেছে। মূলত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই এদেশে নারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়টি অধিক দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং গুরুত্ব লাভ করেছে।

নারীদের বিষয় সম্পর্কিত জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সমবেত নারীরা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে যে রক্তপাতহীন বিপ্লব সংঘটিত করতে সমর্থ হন, তার ফলে ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর কালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়। উন্নয়নমূলক কাজে তাদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নারীর অধিকারও একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান পৃথিবীতে আজ সমভাবে স্বীকৃত।[২৭]

বেইজিং সম্মেলনে নারীদের দাবি সংবলিত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রথমত সাম্য, যেখানে বিশেষভাবে সমান কাজের জন্য তাদের পুরুষের সমান মজুরি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় উন্নয়ন, যেখানে নারীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সুবিধাদির প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এবং তৃতীয়ত শান্তি, যেখানে বিশেষভাবে নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক নিপীড়ন দূরীকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮] নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্যও এ সম্মেলন আহ্বান জানায়।[২৯] এই তিনটি বিষয়ই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব বহন করে চলেছে।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, ২০০০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন (UN Mellennium Suummit)-এর বিশ্বের যে ১২০ কোটি লোক অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করে তাদের সংখ্যা ২০১৫ সাল নাগাদ অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু নারী উন্নয়ন দারিদ্র্য দূরীকরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাই ২০০২ সালে যে সহস্রাব্দের লক্ষ্য ঘোষণা (Millennium Goal Declaration) ও ওই একই সালের ১৮ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত মেক্সিকোর মন্টেসবিতে 'উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থান সংক্রান্ত জাতিসংঘ শীর্ষক সম্মেলন (The United Nation Summit on Financing for Development) অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জাপান দরিদ্র দেশগুলোকে প্রদেয় সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করা সম্পর্কিত দরিদ্র দেশগুলোর দাবি মোটামুটি মেনে নিতে রাজি থাকলেও দুঃখজনকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার মুখে বিশ্বব্যাংকের এরূপ আহ্বানকে অগ্রাহ্য করায় তা কার্যকর হতে পারেনি।[৩০] পরের বছরও অর্থাৎ ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও-র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধের কারণে এতদিন যাবৎ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বৈঠকে দরিদ্র দেশগুলোকে উন্নত বিশ্বের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ০.৭ ভাগ আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ হিসেবে দেবার বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্বের দারিদ্র্যদূরীকরণ তথা নারী উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে ২০০৪ সাল থেকে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার অনেকটা নিচে অর্থা শতকরা মাত্র ০.৩ ভাগে নেমে এসেছে।[৩১] এরপর উল্লেখ করতে হয় যে নারীদের ব্যাপারে চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে আরুদ্ধ

আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'নারী ২০০ : একবিংশ শতাব্দীর জন্য জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি' (Women 2000: Gender Equality, Development and Peace fro the Twenty-First Century) শীর্ষক জাতিসংঘ ব্যবস্থার অধীনে জেন্ডারকে প্রধান ধারায় নিয়ে আসা সম্পর্কিত একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ তারিখ পর্যন্ত। সেখানে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম প্লাটফর্ম সম্পর্কিত কার্যাবলীর ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যাতে সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Millennium Development Foals) অর্জনে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়। বেইজিং+১০ নামে পরিচিত এ সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে জাতিসংঘের শিশু তহবিল (United Nation's Childred Fund, সংক্ষেপে UNICEF) নিশ্চিত করে যে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি সংস্থাটির নীতি, কার্যপ্রণালী প্রোগ্রাম পদ্ধতির ম্যানুয়াল প্রতিফলিত হয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (The Food and Fgricultural Organization of the United Nations. সংক্ষেপে FAO জরুরি ও পুনর্বাসন প্রোগ্রামসমূহে জেন্ডার বিশ্লেষণ বিষয়ক নীতি সম্পর্কে নির্দেশাবলী উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে।[৩২]

আইএমএফের রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে সরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দে যেন সদস্য রাষ্ট্রগুলো সামরিক খাতে অত্যধিক খরচ কমিয়ে বেইজিংয়ের কর্ম প্লাটফর্মের অনুরোধ অনুযায়ী অবকাঠামো, মৌলিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অধিক ব্যয় বরাদ্দ করে। অধ্যধিক ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলো উদ্যোগ (Highly Indeted Pool Countries, সংক্ষেপে HIPC Initative)-এ আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাহায্যার্থে যে টার্গেট স্থির করে তাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রীদের হার বাড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে পুঞ্জীভূত ঋণ থেকে অবমুক্তি প্রত্যাহার করা অসাধ্য হয়ে পড়ে।[৩৩]

এ সময় নারী উন্নয়নবিষয়ক সমচেয়ে বড় প্রচেষ্টাটি হলো অত্যধিক দরিদ্র দেশগুলো (Least Developed Countries), ভূ-পরিবেশিষ্টত উন্নয়নশীল দেশগুলো (Land Locked Developing Countries) ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো (Small Island States) এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি উন্নয়ন (International Food and Agricututal Development,

সংক্ষেপে IFAD) একযোগে 'ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন' (Empowering Women through Microcredit)-এর ওপর একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ (International Year of Microcredit) হিসেবে চালু করে। এছাড়াও উন্নত বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অনেক ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি প্রদান করে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেসব দরিদ্র দেশের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ও শহরের বস্তিগুলোতে বসবাসকারী অধিক দরিদ্র নারীর জন্য যা প্রযোজ্য হওয়া জরুরি, তাদের ভাগ্যের তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এখন পর্যন্ত সাধিত হয়নি।[৩৪] যদিও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়টি বাংলাদেশে অনেক সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বিষয়টির উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ উইনূস একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন তথা সমাজের উন্নয়নের কথা বলেছেন এবং এ ব্যাপারে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার স্ত্রীকে কখনোই রাজনীতির পাদপ্রদীপে আনার চেষ্টা করেননি। বিদেশ ভ্রমণেও খুব কমই সফরসঙ্গী করেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ব্যাপারটি পাল্টে গিয়েছিল। এই সময়ে বেগম খালেদা জিয়া শোকবিহ্বল হলেও ছিলেন সুস্থির ও অবিচল। মৃদু ও স্থির প্রতিজ্ঞা।[৩৫] এই সময় বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে থাকলেও তিনি ছিলেন দুর্বল ও ভারাক্রান্ত। তাই নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। দলকে অনিবার্য ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করতে এর কোনো বিকল্প ছিল না। আর তরুণ ও প্রবীণ নেতারাও তাকেই চাইছিলেন। এই প্রেক্ষিতে শক্ত হাতে দলের হাল ধরেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি ছিলেন এদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মতো সংবিধানের ঐতিহাসিক সংশোধনী এসেছে তারই হাত দিয়ে। রাজনীতিতে তার আবির্ভাব ছিল উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য, অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।[৩৬] তার যাত্রা শুরু হয়েছে রাজপথ থেকে, রাজপ্রাসাদ থেকে নয়, কারণ তিনি যখন দলের হাল ধরেছিলেন তখন দলের অবস্থা এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার খুব অনুকূলে ছিল না। কিন্তু এই বৈরী ও অশান্ত পরিবেশেও তার মনোবল ছিল অটুট, তিনি কখনো হতাশাগ্রস্ত হননি, নিজের আদর্শ নিয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে

ছিলেন তিনি এবং সমস্ত বৈরি পরিবেশ থেকে নিজের দলকে বের করে এনে শক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করিয়ে দেন। বেগম খালেদা জিয়ার প্রচেষ্টায়ই বিএনবি আজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল। এই প্রতিকূল অবস্থায় পথচলা এবং শক্ত ভিতের ওপর টিকে থাকা বেগম খালেদা জিয়াকে খেতাব এনে দিয়েছে, 'আপসহীন' দেশনেত্রীর। এই খেতাব তার একদিনে আসেনি। এজন্য তাকে অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনের এক বিপদসংকুল পথ। শুধু বেগম খালেদা জিয়ার কর্তব্যে অটল নিষ্ঠা, তীব্র সাহস, অক্লান্ত সংগ্রাম এবং সাফল্যের বিষয়ে সুনিশ্চিয়তা তাকে দিয়েছে আপসহীন দেশনেত্রীর খেতাব।[৩৭] আর তার এই আপসহীন রাজনৈতিক অবস্থানই তাকে এনে দিয়েছে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব।

রাষ্ট্র পরিচালনা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তিনি বসে থাকেননি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মতোই নিজ দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। সকল ধর্ম, সকল শ্রেণির মানুষের সহাবস্থান, নারীদের পুরুষের মতোই সমমর্যাদা, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সমানভাবে এগিয়ে নেয়া, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা করতে। তার শাসনামলের প্রথম পাঁচ বছর বাংলাদেশে ঈর্ষণীয় সাফল্য এবং অগ্রগতি দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। তার নেতৃত্বেই নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের বিল পাস হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এদেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পথ চলার সূচনা হয় এবং বহু বছর এই পদ্ধতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে সরকার পরিবর্তন হতে থাকে। এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে থাকে। গণতন্ত্রায়ণ ছাড়াও অর্থনৈতিক সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, নারীর শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ, তাদের জন্য প্রথমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় এবং ভবিষ্যতে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার পরিকল্পনা করেন তিনি। শিশু শিক্ষার বিস্তার ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে জোর দেন। জাতয়ি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করেন কলেজগুলোকে একটি ছাতার তলে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, যাতে শিক্ষাবঞ্চিতরা দূরশীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে। এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটে তাঁর সময়ে। গার্মেন্টস্ শিল্পের বিকাশ ঘটে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। তিনি বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করতেন এবং এদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বান কল্পে সুস্থ বিনিয়োগ আবহওয়া গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করতে থাকেন। উন্নতির এই অব্যাহত গতি দেখে বিদেশিরা এ দেশকে 'ইমার্জিং টাইগার' হিসেবে অভিহিত করতে থাকে। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে এ দেশকে তারাই চিহ্নিত করেছিলেন 'তলাবিহীন ঝুড়ি' (A bottomless basket)।

নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সত্যিকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়

যখন কোনো জনগোষ্ঠী বা গ্রুপ কোনো সরকারকে সমর্থন বা প্রভাবিত করতে চায় এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে, তখনই অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সরকার যদি এই অবস্থাকে কাজে লাগানোর সুযোগ প্রদান করে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে তাহলে উভয় পক্ষের জন্যই মঙ্গলময় এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেখানে এক পক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে অন্য পক্ষ সেই সুযোগ ব্যবহার করে নিজেদের চাহিদা প্রকাশ ও পূরণের সুযোগ লাভ করে। এতে করে সরকারের জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পায়, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ফলে জনগণও সন্তুষ্ট থাকে। বিভিন্ন কারণে চিন্তাবিদ গবেষকগণ অংশগ্রহণের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন, সরকারকে সমর্থন প্রদানের জন্য নিজেদের পক্ষে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য, জননীতিকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করার জন্য।[৩৮] এছাড়া অ্যালমন্ড বলেছেন যে অধিকাংশ দেশে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং দক্ষতার ওপর নির্ভর করে উচ্চতর শিক্ষা।[৩৯] যে দেশে নাগরিকদের অংশগ্রহণের হার অধিক, দক্ষ জনগণের সংখ্যা অধিক, স্বভাবতই সেদেশে উচ্চশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও অধিক।

শিক্ষা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যম। শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ জীবন সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করে।

ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, সর্বোপরি জীবন-যাপনের উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে 'আলোকিত মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলে। তাই বেগম খালেদা জিয়ার সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে সবসময়। এই সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, কর্মসূচি এবং প্রতি বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ এবং তার বর্ধিত রূপ তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। আর এই বরাদ্দের অংশীদার শুধু পুরুষ না, একইভাবে নারীও। এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। তাদের পেছনে ফেলে রেখে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন অলীক বা এক কল্পনামাত্র। তাই দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও তার সরকার এ দিকটিতে অনেক জোর দিয়েছিলেন। তার সময় হয়েছে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, নারী নির্যাতন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে খালেদা জিয়ার সরকার ছিল সর্বদা সচেষ্ট। আর এই মানব সম্পদের অর্ধেকই নারী। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তার সরকার জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার ওপর। সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রমাণ হলো বাজেটে অর্থ বরাদ্দের উচ্চ মাত্রা। দারিদ্রের কারণে শিশুরা যেন বঞ্চিত না হয় সেজন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে উপবৃত্তি চালু করেন। প্রায় পঞ্চাশ লাভ দরিদ্র উপবৃত্তির আওতাধীন ছিল ওই সময়ে। এদের মধ্যে মেয়েশিশুর সংখ্যা প্রচুর। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুরোতে শিক্ষা-স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বহুসংখ্যক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। যার অধিকাংশই নারী। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এছাড়াও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার জন্যে অধিকাংশ থানা পর্যায়ে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' নামে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশ যেহেতু দরিদ্র দেশ, এদেশের অধিকাংশ পিতা-মাতাই আগে পুত্রসন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। মেয়েশিশুরা থাকে বঞ্চিত। আবার মেয়েশিশুরা একটি পর্যায়ের পরে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের কারণে। এসব মেয়েশিশুদেরও এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা ছিল এই প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য। নারীশিক্ষার প্রসারে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ফ্রি এবং ছাত্রীদের জন্য ছিল উপবৃত্তির ব্যবস্থা। বই কেনার জন্য তাদের দেয়া হতো আর্থিক সহায়তা এবং পাবলিক

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যও অর্থ সাহায্য দেয়া হতো। কারিগরি শিক্ষায় নারীদের শিক্ষিত করা কথা তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে। পৃথকভাবে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। এটা বাস্তবায়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধূলার ব্যবস্থাও কার্যক্রমের আওতায় ছিল।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উভয়েই তাদের শাসনামলে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্তকরণের ওপর। তাদের উভয়েরই কাছে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা সারা জীবন নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। দেশে শিক্ষার প্রসারে জন্য তারা সবসময় চেয়েছেন মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষক সমাজের অবদান থাকুক। নারীসহ আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যেন জনসম্পদে পরিণত হতে পারে, সেই লক্ষ্যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া গতানুগতিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছেন। এ সময় নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। নকল বন্ধ হয়েছে। নারীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকি তাদের কারিগরি শিক্ষারও কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়াও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ বছর মেয়াদি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরি হয়েছে। এই প্ল্যান তৈরি কমিটিতে কাজ করেছেন দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, যা উচ্চশিক্ষার প্রসারে অনেক জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

দেশে শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক তৈরি ও কার্যকর করতে হলে উভয় পক্ষকেই গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে হবে। আর সবাইকে হতে হবে সৎ ও নিঃস্বার্থ। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সার্বিক জাতীয় উন্নয়নে নারীদেরও তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের শ্রমবাজারে আমাদের নারী শ্রমিকদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। তৈরি পোশাক শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কর্মজীবী নারীকে দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি দক্ষ গৃহিণীও হতে হয়। কারণ তার ওপরই থাকে সংসারের ভার। তাই

ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমজীবী নারীদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মালিকপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মালিকপক্ষ যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাজরীন ফ্যাশনস ও রানা প্লাজার দুর্ঘটনার মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতো না এদেশে। তার শাসনকালে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি এদেশে। বরং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নেও তার সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। তার সময়ে প্রাথমিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা প্রসার লাভ করেছে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের সমতা আনার জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম সাফল্য লাভ করেছে বেগম খালেদা জিয়ার যোগ্য নেতৃত্বে। তাছাড়াও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। মেয়েদের বই কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, পরীক্ষার ফি দেয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধাবী ছাত্রীদের বই কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রভৃতি ছিল তার উল্লেখ্যযোগ্য অবদান। আর পরবর্তী সময়ে ডিগ্রি পর্যন্ত এই সুযোগ বৃদ্ধিরও পরিকল্পনা ছিল তার। এছাড়াও তার শাসনকালে দুটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে। পরে আরো গার্লস স্কুল ও কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল তার।

বেগম খালেদা জিয়ার আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ও মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। বিনা বেতনে শিক্ষার জন্য বিনামূল্যে বই দেয়া শুরু হয়েছিল। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি পরিবর্তন করে এইসময় থেকে নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া ফ্রি করা হয়েছিল। মেধাবী মেয়েদের বৃত্তি দেয়া হতো। তাদের জন্য বিভিন্ন জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছিল। তাদের ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগকে আলাদা মন্ত্রণালয় করা হয়। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার বিতরণ করা হয়। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। শিক্ষক

কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠন করা হয়। বেসরকারি শিক্ষক অবসরভাতা আইন প্রবর্তিত হয়েছে। এ আমলেই একটি বছরকে সুশিক্ষা বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার শিক্ষকদের যোগ্য মর্যাদা দানের জন্য প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষক দিবসও ঘোষিত হয়েছে। বহু স্কুলকে এমপিভুক্ত করা হয় এ সময়। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় এই আমলে। খালেদা জিয়া বিশ্বাস করেন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। ঘরে ঘরে মেয়েদের শিক্ষিত করতে পারলে, প্রতিটি ঘরে শিক্ষিত মা থাকলে, ছেলেমেয়েরাও রেখাপড়ায় আগ্রহী হবে। মেয়েরা কাজ করলে বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। সমাজে মেয়েদের মর্যাদা বাড়বে। এভাবেই সম্ভব হবে নারীর ক্ষমতায়ন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে এবং সেই সঙ্গে কারিগরি ও প্রযুক্তি, আইসিটি, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল—সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর যেভাবে এ সময়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেই গুরুত্ব যদি ধরে রাখা যেত, তাহলে অল্প সময়েই আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী জনসম্পদে পরিণত হতো।

দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সরকার উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কিছু স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।[৪০] যার মধ্যে ছিল দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টেকসই বিকাশ ও স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। সরকারের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় এই উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে বাস্তবমুখী ও লাগসই সুপারিশ প্রণয়ন করতে নির্দেশ দেন বেগম খালেদা জিয়া। তাছাড়া পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইউনিফর্ম গ্রেডিং সিস্টেম চালু করার নির্দেশ দেন তিনি। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন তিনি। নারীশিক্ষার প্রসারে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করেন, যা ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত সমান করে এনেছে প্রায়। এই অনুপাত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রেই নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে সাহায্য করেছে। একইভাবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও বিশ্বাস করতেন যে, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক যে নারীসমাজ তাদেরও কল্যাণ প্রয়োজন। প্রয়োজন শিক্ষার। জাতিকে শিক্ষিত করতে হলে নারীদের শিক্ষিত করতেই হবে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া এই উদ্দেশ্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

দেশের নারী-সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য বেগম খালেদা জিয়ার সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পাশাপাশি, শিল্পখাতের মতো সরাসরি উৎপাদনশীল কার্যক্রমেও মেয়েরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তাদের প্রয়াস ও পরিশ্রমের ফলেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প আজ বিশ্ব-বাজারে মর্যাদাপূর্ণ আসন অধিকার করে রয়েছে। দেশের কুটির শিল্প ক্ষেত্রেও মেয়েদের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। দেশের শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্যে, অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রেখে; যুগোপযোগী নীতি ও কৌশল হিসেবে ২০০৫ সালের শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে আরো যা করা হয়েছিল তা হলো এসএমই মহিলা শিল্প-উদ্যোক্তা ফোরাম এবং এসএমই ফাউন্ডেশন গঠন করা। দেশের নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য এই প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পাশাপাশি, শিল্পখাতের মতো উৎপাদনশীল কার্যক্রমেও নারীরা এগিয়ে গেলে তা হবে দেশের জন্য মঙ্গলময়। এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাগণ সম্পৃক্ত হলে এক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের সমাজে প্রথাগত জেন্ডার বৈষম্যের কারণে শিল্প বিনিয়োগে নারীদের কিছু অতিরিক্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যার মধ্যে অর্থায়ন বা ব্যাংকিং অন্যাতম। এর সমাধান করতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তহবিলের দুইশত শতাংশ নারীদের অনুকূলে ঋণ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল।[৪১] এই তহবিল থেকে নারী উদ্যোক্তাগণ সহজেই ঋণ নিতে পারতেন এবং সুদের হার ছিল কম। বেগম খালেদা জিয়া প্রতিটি ব্যাংকের শাখায় এসএমই উইন্ডো চালু করার আহ্বানও জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন নারীদের বাদ দিয়ে বা পেছনে রেখে কোনো সমাজের সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শ্রমদান বা উদ্যোক্তা হিসেবে নারী কারো চেয়ে কম নয়। বাংলাদেশের নারী সমাজ একদিকে কঠোর পরিশ্রমী, অন্যদিকে সৃজনশীলও। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যদি সমাজ সুযোগ ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে এদেশের নারীসমাজ নিশ্চিতভাবে

তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারবে। তাই নারী শিল্প-উদ্যোক্ত ফোরামকে এমন একটি প্লাটফর্ম হিসেবে তৈরি করা হবে যেখানে এই খাতে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং নারী উদ্যোক্তা-সবাই মিলে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যাবেন। নারী শিল্প উদ্যোক্তাগণ এখানে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা, নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করবেন। এদেশে বেশ কয়েকজন নারী শিল্প-উদ্যোক্তা তাদের মেধা-মনন, দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা কৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তির কারণে বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদের সাফল্য নতুন শিল্প-উদ্যোক্তাদের প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করবে। তাই এসএমই নারী ফোরাম বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক নবযুগ ও নবদিগন্তের সূচনা করবে বলে মনে করতেন বেগম খালেদা জিয়া। এই জন্যে ২০০৬ সালে তিনি এসএমই মহিলা উদ্যোক্তাদের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনের ঘোষণাও দিয়েছিলেন। এসএমই প্রোগ্রামের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনের জন্য বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এডিপির ৪৩ ভাগ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য রাখা হয়েছিল।[৪২] দরিদ্র, অতিদরিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী, এতিম, দুস্থ নারী, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণও দেয়া হতো। এর ফলে নারীদের কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ বেড়েছে। হাঁস-মুরগী ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের অভাব দূর করার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে অনেকাংশে। এর ফলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাফল্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

শহর ও গ্রামের মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন রোধ, নারী উদ্যোক্তা তৈরি, অসহায় ও দুস্থ নারীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন খালেদা জিয়ার সরকার। নারীদের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ বিদ্যমান আইনের পাশাপাশি এসিড নিক্ষেপ অপরাধকে কঠোর হাতে দমন করার জন্য এই সময়ে এসিড অপরাধ দমন আইন ও এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়েছে। এসিড ভিকটিমদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কর্মসূচিও নেয়া হয়েছে এ সময়ে। নির্যাতিত নারীদের সুচিকিৎসা ও আইনি সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ও রাজশাহীতে

বিভিন্ন সেন্টারে চালু হয়েছিল এবং কথা ছিল যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এ ধরনের সহায়তা সেন্টার খোলা হবে। সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা নিষ্পত্তির জন্য আটত্রিশটি ট্রাইব্যুনাল কাজ করছিল।[৪৩] বিচারাধীন মহিলা, শিশু-কিশোরদের অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে না রেখে তাদের আলাদা রাখার জন্য দেশে প্রথমবারের মতো মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ সময়ে। তাদের প্রত্যেকের জন্য সরকারি তহবিল থেকে মাসোহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়ার আশা ছিল যে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি কার্যকর হলে এই কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট প্রায় এক কোটিও অধিক ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দেশের নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। আত্মকর্মসংস্থানে নারীসমাজ এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণা ও সাহস লাভ করবে। এছাড়াও নারী সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা সমুন্নত হবে। সামগ্রিক মানব সম্পদের উন্নয়নের ফলে দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

ইতোমধ্যে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শতকরা দশভাগ কোটা রাখা হয়েছিল। এই কোটা আরো বৃদ্ধি করারও চিন্তা ভাবনা চলছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ষাট ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ, বেসরকারি খাতে কর্মচারী নিয়োগ এবং আত্মকর্মসংস্থানে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কথা সবসময় বলা হয়েছে। যার ফলে প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা প্রশংসনীয় মেধা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নারী সমাজের জাগরণের ওপর পুরো দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। কারণ এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই হলেন নারী।[৪৪] তাদের অবহেলিত রেখে কোনো অর্থবহ উন্নয়নই সম্ভব নয়।[৪৫] দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতিসঞ্চার করতে হলে নারী সমাজকে অধিক হারে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে। নারীদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্ম প্রত্যয়ের চেতনা জাগ্রত করতে হবে। উন্নয়ন ধারায় নারীদের সম-অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে তা অপসারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাতগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে বেগম খালেদা জিয়া

মনে করতেন। উৎপাদনশীলতার দিক থেকে নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে নেই; শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নারীকেন্দ্রিক কর্মসূচি হাতে নেয়ার প্রচুর সুযোগ আছে। কেননা কুটির শিল্প ও এসএমই প্রকল্পে ইতোমধ্যেই নারীরা উদ্যোক্তা হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতাগ দেখিয়েছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন। এই সাফল্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্যে বৃহত্তর পরিবেশেও সম্ভব। এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে বেসরকারি খাত। বেগম খালেদা জিয়া সকল সম্ভাবনাময় নারী শ্রমভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়নে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণকে অন্যতম উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতেন।[৪৬] এর ফলে একদিকে যেমন উন্নয়নের মূলধারায় নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, তেমনি নারীর ক্ষমতায়নও সম্ভব হবে।

নারী উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বেগম খালেদা জিয়া আরো অনেক কাজ করেছেন। এর মধ্যে আছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি এবং বিধাব ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারীদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি।[৪৭]

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন), আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া শাসনামলে।[৪৮]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর জামিন ও দণ্ড সংক্রান্ত বিধানের কঠোরতা, অস্পষ্টতা ও অপপ্রয়োগ রোধের লক্ষে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মতামত এবং পরামর্শ গ্রহণ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন), আইন, ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে।[৪৯]

নারীর ক্ষমতায়ন হলো ক্ষমতা কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারীর নেতৃত্ব দানের ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়াও এর অন্তর্গত। বর্তমান সময়ে কোনো দেশই বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারছে না নারীদের অধস্তন হিসেবে গণ্য করার কারণে। নারী আজ স্বীয় ক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে পুরুষের পাশাপাশি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। সে চায় পরিবার গঠনে এবং দেশ গঠনে নিজেকে ব্যাপৃত

রাখতে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজকের নারী নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত হতে চায়।[৫০] বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু অনুকূল পরিবেশেরও অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর মেধা, প্রতিভা ও সৃজনী শক্তি বিকশিত হয় না। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীরা চরম অবহেলিত জীবন-যাপনে বাধ্য হলেও পারিবারিক জীবনে নারীর ভূমিকা বহুক্ষেত্রে পুরুষের অবদানকে অতিক্রম করে গিয়েছে, যদিও সমাজ তার স্বীকৃতি দিতে চায় না।[৫১]

শুধু মহিলা নয়, সমাজে শিশুদের অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যেও এ সময় বাংলাদেশ শিশু অধিদফতরের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, উদ্যোক্তা উন্নয়নের পাশাপাশি নারী ও শিশু পাচার, নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্প ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ছিল অনেকগুলো, তার মধ্যে এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রটেকশন অব ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন (Empowerment and Protection of Women and Children) দরিদ্র মহিলাদের জন্য ভিজিডি কর্মসূচি, উন্নয়ন কর্মসূচি, নারী নির্যাতন রোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রকল্প (Multi-Sectoral), শিশু পাচার প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মসূচি প্রকল্প, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ প্রকল্প, শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র প্রকল্প, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

বেগম খালেদা জিয়া তার শাসনামলে গ্রামী দরিদ্র ও বেকার মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, প্রতিটি সমাজ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে মহিলা ও কিশোরীদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার প্রয়াসে টেইলারিং, এমব্রয়ডারি, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল এ সময়ে। বাগেরহাটে মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তুলে তার মাধ্যমে গরিব, শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে তারা আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করতে পারে এবং নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে

পারে। দিনাজপুরে গড়ে তোলা হয়েছিল ছিন্নমূল ও ভবঘুরে টোকাই মেয়েশিশুদের নিরাপদ আবাসন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যার লক্ষ্য ছিল ছিন্নমূল শিশুকে নিরাপদ আবাসন প্রদান করা এবং তাদের মানসিক ও সামাজিক অবস্থার বিকাশ ঘটানো। এছাড়াও মৌলিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা যেন অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে এবং বিশেষত ছিন্নমূল শিশুরা যেন এর মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে যেতে পারে, তার সুযোগ সৃষ্টি করা ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে দুস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল গঠিত হয়েছিল, যার ফলে নির্যাতিত, অসহায়, মহিলা সন্তানসহ স্বামী পরিত্যক্তা আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত মহিলা, বৃদ্ধা, বিধবা ও শারীরিকভাবে পঙ্গু মহিলারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতো। এ সময়ে দ্রুততার সঙ্গে এসিড সন্ত্রাস দূর করতে নতুন দুটি আইন প্রণীত হয়েছিল। প্রথমত এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ ও দ্বিতীয়ত এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২। এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মিথ্যা মামলা পরিহার ও দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য আইনের সংশোধন প্রভৃতি এই সময়ের যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণের জন্য জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, জাতীয় শিশুর নীতি এবং সংশ্লিষ্ট সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নীতি, কনভেনশন ইত্যাদি অনুসারে পরিচালিত ও গৃহীত উদ্যোগ ও কর্মসূচি এ সময়ে মন্ত্রণালয় সমন্বয় করেছে। শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের জন্য ১৯৭৬ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে বাংলামে শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি তার ৬৪টি জেলা শাখার মাধ্যমে সারাদেশে বিপুল সংখ্যক শিশুর সাংস্কৃতিক ও মাধ্যমিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এছাড়াও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবছর শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। শিশুদের মাঝে পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ২০০২ সালকে জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া এবং এ উপলক্ষে শিশু একাডেমি শত গ্রন্থমালা অর্থাৎ ১০০টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। সংস্কৃতি ও

ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা প্রশাসনিক নিম্নস্তর থেকে শুরু হয়ে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে। শিশু একাডেমি নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে শিশুদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

এভাবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং তার সুযোগ্য সহধর্মিনী বিশেষ করে শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে লক্ষ দিয়েছিলেন। এর জন্য শুধু ঢাকা শহরই নয়, দেশে ৬৪টি জেলাতেই শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা ও তার শাখার বিস্তার ঘটেছিল এবং এর মাধ্যমে শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্লাটফর্ম তৈরি হয়েছিল। যার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের সকল দিকে বিকশিত করতে পারবে। আবার অন্যদিকে তারা উভয়েই ছিন্নমূল শিশুদের দিকেও নজর দিয়েছিলেন, যাতে করে এসব অবহেলিত শিশুও মূলধারা থেকে পিছিয়ে না পড়ে।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেখমে যদি উন্নত হতে হয় কিংবা এমনকি উন্নয়নশীল দেশের খেতাবও অর্জন করতে হয় তবে সেদেশে একজন মাহাথির মোহাম্মদ বা লি ওয়াং, নিদেনপক্ষে একজন নেহরুর অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। এদেশের জন্য সেই জায়গাটি দখল করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তার হাতে এই দেশ যদি আর মাত্র পাঁচটি বছর পেতো, হয়তো এ দেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ দেশবাসীর, তিনি শহীদ হলেন আর তার স্বপ্নও বাস্তবায়ন হলো না। পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে দেশ আরো পিছিয়ে পড়ে। এর পরে গণতান্ত্রিক সরকারের পথযাত্রা শুরু হয়। যার প্রথম কাণ্ডারি ছিলেন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশবাসী আবারো স্বপ্ন দেখা শুরু করে। কিন্তু তৎকালীন বিরোধীদলের অসহযোগিতায় তিনি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তার পূর্বসূরি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মতোই উন্নয়নের ধারাকে প্রবাহিত করেছিলেন, শিক্ষার বিস্তার, শিশুশিক্ষা ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, কর্মজীবী নারীদের বিভিন্ন সুবিধা দান, কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার সময়ে উন্নয়নের অব্যাহত গতি লক্ষ করা যায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবচেয়ে স্পর্শকাতর দিকটি হলো বিরোধীদলের সহযোগিতা এবং বিরোধীদলের প্রতি শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্য দুটি জায়গাতেই সরকারি ও বিরোধীদল হিসেবে বিএনপি কোনো ভালো কিছু

পায়নি। যখন সরকার গঠন করেছেন, তখন বিরোধীদলের ক্রমাগত বাধার মুখে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোনো উন্নয়নমূলক কাজই শান্তিতে বা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারেননি। অন্যদিকে যখন তিনি বিরোধীদলে, তখন তার সাহায্য সরকারি দল তো কামনা করেইনি, বরং নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের মুখে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জোর প্রচেষ্টা নিয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও বিএনপি এবং তার যোগ্য নেতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কখনো থেমে পড়েননি বরং তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। দেশের জনগণও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আছে, যার প্রমাণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং উপজেলা নির্বাচনে শত বাধা সত্ত্বেও প্রতীয়মান হয়েছে।

ফুটনোট :

১ রহমান, শেখ ফজলুর (২০০৪) : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জীবনসূচি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২ ভূঁইয়া, মো. হাফিজ উদ্দীন (২০১২) : 'হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মরত নারী-শ্রমিক: ঢাকা মহানগরভিত্তিক একটি সমীক্ষা:, ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, উইমেন ফর উইমেন : গবেষণা ও পাঠচক্র।

৩ Begum, Najmin Nar, 1997, 'Women in Readymade Garment Industries: Issues and Concerns', The Journal of Social Development, ***Institute of Social Welfare and Research***, Dhaka University Vol. 12, no. 1, December, Dhaka.

৪ খান মোহাম্মদ শাহীন ও আক্তার রুম (২০১২), 'নারী ক্ষমতায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি প্রাথমিক সমীক্ষা', ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, উইমেন ফর উইমেন : গবেষণা ও পাঠচক্র।

৫ খুদা, বি : (১৯৮২)

৬ খান, এস : (১৯৮৪)

৭ কাওসার আফসানা ও অন্যান্য, (১৯৯৮: ২)

৮ প্রাগুক্ত, (১৯৯৮: ২)

৯ আহমেদ, আই, (১৯৯৫ : ১-১৮)

১০ BRAC, (১৯৯২)

১১ আসাদুল করিম শাহীন (বফ.) ১৯৯৪, 'খালেদা জিয়া : অনমনীয়, আপোষহীনতা পান মজুমদার' বেগম খালেদা জিয়া—আপোষহীন দেশনেত্রীর প্রতিকৃতি অনন্যা, ঢাকা।

১২ Muhammad Asad, The Road to Makkah (New Delhi: Adam Publishers, 2010) p. 291.

১৩ Karen Armstrong, ***Muhammad: a Biography of the Prophet*** (A Phoenix Press Paperback, 1991), p. 222

১৪ See, Qurratulain Hyder in her Foreword to Hali's Musaddas: A Story in Verse of the Ebb and Tide of Islam, translated from Urdu by Syede Saiyidan Hameed (New Delhi: Harper Collins Publishers, 2005), p. 2

১৫ মো. আবদুল হালিম ও ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৩।

১৬ Asad, op.cit. p. 285

১৭ Ibid. p. 285

১৮ এম এ হালিম ও দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা জানুয়ারি ২০১৩।

১৯ এম এ হালিম ও দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা জানুয়ারি ২০১৩।

২০ Ibid.

২১ Ibid.

২২ Ibid.

২৩ John T. Rourke, ***International Politics on the World Stage*** (Dushkin/McGraw-Hill 1997), p. 551.

২৪ মো. আবদুল হালিম ও ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৩।

২৫ Irne Tinker, 'The Making of a Field Advocates, Practitioners and Scholars', in Visvanathan, et al. (eds.) ***Women, Gender and Development Reader*** (Zed Books, 1997), p. 36.

২৬ Virgina Vargas, 'Women's Interests and Emancipatory Prosess', in Sing C. Chew and Robert A. Denemark (eds.), The Underdevelopment of Development (Essays in Honor of Andre Gunder Frank) (New Delhi: Sage Publications, reprinted in India in 1999), p. 351.

২৭ এম এ হালিম ও দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা জানুয়ারি ২০১৩।

২৮ Rourke, op. cit., p. 552.

২৯ Ibid.

৩০ See, The Daily Star, 14 March, 2002.

৩১ মো. আবদুল হালিম ও ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা জানুয়ারি ২০১৩।

৩২ Ibid.

৩৩ Ibid.

৩৪ মো. আবদুল হালিম ও ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা জানুয়ারি ২০১৩।

৩৫ মজুমদার, (১৯৯৪ : ২৮০)

৩৬ মজুমদার, (১৯৯৪ : ২৮১)

৩৭ রহমান, (১৯৯৪ : ১৪)

৩৮ Berry etal, (1992:260; Kamal:)

৩৯ অ্যালমন্ড ও পাওয়েল, (১৯৬৬)

৪০ আলী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক (২০০৬), সমৃদ্ধ বাংলাদেশ (বেগম খালেদা জিয়ার বক্তৃতা সংকলন), বৈশাখী প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, পৃ. ২৮৩।

৪১ আলী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক (২০০৬), সমৃদ্ধ বাংলাদেশ (বেগম খালেদা জিয়ার বক্তৃতা সংকলন), বৈশাখী প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, পৃ. ৩১৬।

৪২ আলী, (২০০৬: ৪০৮), প্রাগুক্ত।

৪৩ আলী, (২০০৬: ৪০৯), প্রাগুক্ত।

৪৪ মোহন, মহিউদ্দীন খান (সংকলিত) (২০০৬), প্রিয় দেশবাসী (নির্বাচিত ভাষণ, ১৯৯১-১৯৯৬) খালেদা জিয়া, মৌলি প্রকাশনী, পৃ. ৫৮৭।

৪৫ মোহন (২০০৬ : ৫৮৭), প্রাগুক্ত।

৪৬ মোহন (২০০৬ : ৫০৪), প্রাগুক্ত।

৪৭ বীনু, মো. লুৎফর রহমান (২০০৫), এ চলার শেষ নেই (সম্পাদিত) মেট্রো মিডিয়া (প্রাঃ) লি., ঢাকা, পৃ. ২২৪।

৪৮ প্রাগুক্ত।

৪৯ প্রাগুক্ত।

৫০ খান ও আক্তার, মোহাম্মদ শাহীন ও রুমা (২০১২), নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি প্রাথমিক সমীক্ষা ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন : গবেষণা ও পাঠচক্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ৮৭।

৫১ বেগম ও হক, (২০০৪ : ৭৭)।

পাদটীকা

* আহমেদ, আই, (১৯৯৫: ১-১৮)
* অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (১৯৬৬)

* আলী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক (২০০৬), সমৃদ্ধ বাংলাদেশ (বেগম খালেদা জিয়ার বক্তৃতা সংকলন), বৈখাশী প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড।
* আসাদুল করিম শাহীন (ed.) ১৯৯৪, বেগম খালেদা জিয়া—আপোষহীন দেশনেত্রীর প্রতিকৃতি, অনন্যা, ঢাকা।
* আসাদুল করিম শাহীন (ed.) ১৯৯৪, (ড. এস এম লুৎফর রহমান, আপোষহীন দেশনেত্রী), বেগম খালেদা জিয়া—আপোষহীন দেশনেত্রীর প্রতিকৃতি, অনন্যা, ঢাকা।
* কাওসার আফসানা ও অনন্যা (১৯৯৮ : ২)।
* খান ও আক্তার, মোহাম্মদ শাহীন ও রুমা (২০১২), নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি প্রাথমিক সমীক্ষা ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন : গবেষণা ও পাঠচক্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।
* বেগম ও হক, মালেকা ও আজিজুল (২০০৪), তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
* খান ও আক্তার, মোহাম্মদ শাহীন ও রুমা (২০১২), নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি প্রাথমিক সমীক্ষা ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন : গবেষণা ও পাঠচক্র।
* খুদা, বি : (১৯৮২)
* খান. এস : (১৯৯৪)।
* বীনু, মো. লুৎফর রহমান (২০০৫), এ চলার শেষ নেই (সম্পাদিত) মেট্রো মিডিয়া (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা।
* মজুমদার, (১৯৯৪ : ২৮০)
* মজুমদার, (১৯৯৪ : ২৮১)
* মোহন, মহিউদ্দীন খান (সংকলিত) (২০০৬), প্রিয় দেশবাসী (নির্বাচিত ভাষণ, ১৯৯১-১৯৯৬) খালেদা জিয়া, মৌলি প্রকাশনী।
* রহমান, (১৯৯৪ : ১৪)।
* ভূঁইয়া, মো. হাফিজ উদ্দীন (২০১২) : 'হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মরত নারী-শ্রমিক : ঢাকা মহানগরভিত্তিক একটি সমীক্ষা :, ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, উইমেন ফর উইমেনঃ গবেষণা ও পাঠচক্র।
* রহমান, শেখ ফজলুর (২০০৪) : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জীবনসূচি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
* হালিম, মো. আবদুল ও নাজনীন. ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা, নাইন ইলেভেন উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা জানুয়ারি ২০১৩।
* Asad, op.cit. p. 285
* Berry etal, (1992:260; Kamal:)
* BRAC, (১৯৯২)
* Begum, Najmin Nar, 1997, 'Women in Readymade Garment Industries: Issues and Concerns', The Journal of Social Development, ***Institute of Social Welfare and Research***, Dhaka University Vol. 12, no. 1, December, Dhaka.
* Irne Tinker, 'The Making of a Field Advocates, Practitioners and Scholars', in Visvanathan, et al. (eds.) ***Women, Gender and Development Reader*** (Zed Books, 1997), p. 36.
* John T. Rourke, ***International Politics on the World Stage*** (Dushkin/McGraw-Hill 1997), p. 551.
* Karen Armstrong, ***Muhammad: a Biography of the Prophet*** (A Phoenix Press Paperback, 1991), p. 222
* Muhammad Asad, ***The Road to Makkah*** (New Delhi: Adam Publishers, 2010) p. 291.
* Rourke, op. cit., p. 552.
* See, Qurratulain Hyder in her Foreword to ***Hali's Musaddas: A Story in Verse of the Ebb and Tide of Islam***, translated from Urdu by Syede Saiyidan Hameed (New Delhi: Harper Collins Publishers, 2005), p. 2
* See, The Daily Star, 14 March, 2002.
* Virgina Vargas, 'Women's Interests and Emancipatory Prosess', in Sing C. Chew and Robert A. Denemark (eds.), ***The Underdevelopment of Development*** (Essays in Honor of Andre Gunder Frank) (New Delhi: Sage Publications, reprinted in India in 1999), p. 351.

[এমাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত 'খালেদা জিয়া– তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতি

এক

পররাষ্ট্রনীতি বলতে আমরা বুঝি জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রের গতিশীল এবং সুচিন্তিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি, কৌশল এবং সমষ্টি (James Rosenau. 1971: 67) পররাষ্ট্রনীতি তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুরো কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট থাকে ক্রমভিত্তিক একগুচ্ছ জাতীয় স্বার্থকে (The hierarchy of interests) ঘিরে, যা সরকার সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিক্ষ অথবা যার বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি ঘটাতে কৃতসংকল্প (Northedge, 1968: 16)। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি রয়েছে, কেননা, প্রত্যেক সরকারকে জাতীয় স্বার্থের নিরিখে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। জাতীয় স্বার্থের (National Interest) এক কালজয়ী সংজ্ঞার্থে আমরা পেয়েছি এককালের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের (Lord Palmerston-Henry Hohn Temple, 3rd Visount 1784-1865) বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন : 'আমাদের চিরন্তন কোনো বান্ধব নেই। আমাদের চিরস্থায়ী কোনো শত্রুও নেই। আমাদের নিজস্ব স্বার্থ হলো চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী। আমাদের কর্তব্য হলো এই স্বার্থগুলোকে সংরক্ষণ করা।' (We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.) জার্মানির স্থপতি বিসমার্ক (Bismarck, Otto Eduard Leopold Von (1815-98) জাতীয় স্বার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, 'রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতির বর্ধিতাংশই হলো পররাষ্ট্রনীতি।' (Ten extension of domestic policy is foreign policy.)।

বেগম খালেদা জিয়ার সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতির সঠিক অনুধাবনের জন্যে সবার আগে পরিচিত হতে হবে তারই স্বামী, এই মাটির শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের অন্যতম, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাদানকারী, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে। বেগম খালেদা জিয়া এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং তিনি শুরু করেন সেখান থেকেই যেখানে প্রেসিডেন্ট জিয়া শেষ করেছিলেন।

দুই. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ধারণা

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একজন নিরাপত্তা বিশারদ হিসেবে অনুধাবন করেন যে—এক. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিন্তু এই সুসম্পর্ক হতে হবে সম-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে, আধিপত্য ও অধীনতার (Dominance and Dependence) কাঠামোয় নয়। দুই. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ককে স্থিতিশীল করার জন্যে প্রয়োজন হবে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোকে সহযোগিতার স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ করা এবং এই সহযোগিতার ক্ষেত্র শুধু রাজনৈতিক নয়, পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিকসহ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা। তিন. তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অনুভব করেন যে, সংকটকালে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে এমন অকৃত্রিম, আদর্শিক দিক থেকে সমমনা এবং সমস্বার্থের কিছু বান্ধব সৃষ্টি করাও অপরিহার্য। অন্য কথায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুমুখীকরণও ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়া অনুধাবন করেন যে, বাংলাদেশের জনগণই বাংলাদেশের নিরাপত্তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ঘাঁটি। জাতীয় ঐক্য হলো জাতীয় নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দুর্গ। এই দুর্গ সুরক্ষিত থাকলে বৈরী শক্তি যতোই প্রবল হোক না কেন, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে। তাই তিনি জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের যে মৌল স্তম্ভ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, সেদিকে প্রথমে মনোনিবেশ করেন। একজন শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা

এবং জেড ফোর্সের সংগঠক হিসেবে তিনি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করেছেন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকালে কিছু বিপদগামী পাকিস্তানপন্থী কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের মুখে সব প্রতিবন্ধকতা কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল। জাতীয় ঐক্য যে জাতীয় নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দুর্গ এই বিশ্বাস তাকে এই পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

এই লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এক. তিনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে সর্বপ্রথম জনগণের আস্থা অর্জন করেন। দুই. দল-মত এবং বিশ্বাস নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত করে তাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিন. আদর্শিক সংঘাতে বিভক্ত ১৯৭২-৭৫ সময়কালের সামাজিক শক্তিগুলোকে সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখ্যযোগ্য যে, তিনি তার শাসনকে সবার কাছে ঈপ্সিত এবং গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াস চালান। চার. যখন তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh Nationalist Party-BNP) গঠন করেন তখনো উদার হস্ত (Open Arm) নীতির মাধ্যমে ডান থেকে, কেন্দ্র থেকে, এমনকি বামপন্থীদেরও নেতা-কর্মী হিসেবে বাছাই করে একটি জাতীয় দলের আদলে নিজের দলকে গোটা জাতির কাছে উপস্থাপন করেন। পাঁচ. দেশে বসবাসকারী অর্ধশতাধিক উপজাতীয় জনসমষ্টি যেন বাংলাদেশের রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরে এসে একাত্মতা অনুভব করতে পারেন সেই লক্ষ্যে শুধু ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ব্যঞ্জনা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং ভূখণ্ডভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নতুন তত্ত্ব সবার সামনে তুলে ধরেন। ফলে ১৯৭৬-৮১ সময়কালে বাংলাদেশ সমাজে যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয় তা অভূতপূর্ব। এই জাতীয় সংহতি হয়ে ওঠে তার সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার পরে তিনি দুই পর্যায়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে অগ্রসর হন। আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার সবক'টি দেশ—ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা সফর করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উষ্ণ কূটনীতির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন যে, বাংলাদেশ

শান্তির পক্ষে, বাংলাদেশ সহযোগিতার পক্ষে, বাংলাদেশ অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পক্ষে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়ার বক্তব্য তখন নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজেদের ভাবনা-চিন্তা, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পেল। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের শাসকগণও দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়ার বক্তব্যে দেখতে পান তাদেরই অভিপ্রায়, তাদেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদেরই দূরদৃষ্টি।

১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারত সফরে গেলে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেডিড তার সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় বলেছিলেন : 'একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাদানকারী হিসেবে আপনার মর্যাদা এরই মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে জাতীয় অগ্রগতি এবং জনকল্যাণে নিবেদিত একজন জননেতা হিসেবে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে আপনি গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।'

[Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare the Independence of Bangladesh. Since you took over the reins of government in your country, you have earned wide respect both in Bangladesh and abroad as a leader dedicated to the progress of your country and the well-being of your people, Huq, 1993:96]

এভাবে হাজার বছরের জমাটবাঁধা অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং আস্থাহীনতা ঘন অন্ধকারে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম বিশ্বাস ও আস্থার প্রদীপটি জ্বালিয়েছিলেন। সেই পথ ধরেই ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকায় রচিত হয় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার (South Asian Assosiation for Regional Co-operation-SAARC) সৌধটি। এক্ষেত্রে এ-ও উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে (প্রথম বছরটি ছাড়া) ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ঢাকায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোররজি দেশাইয়ের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এবং তা ছিল বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে।

আঞ্চলিক পর্যায়ে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

তা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শে। তিনি যখন ক্ষমতাসীন হন তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছিল নিঃসঙ্গ, একাকী, বন্ধুহীন। ইন্দো-সোভিয়েত কক্ষপথে আবর্তিত বাংলাদেশ ছিল শ্রীহীন, অনেকটা ভারতের বর্ধিতাংশের মতোই। অপচয়প্রবণ, তথাকথিত সমাজতন্ত্রের নিগড়ে বাংলাদেশ বন্দি হয়ে পড়েছিল। হেনরি কিসিঞ্জারের কথায়, 'এক তলাবিহীন ঝুড়ি'। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) অপসৃষ্টির ফলে দেশ থেকে গণতন্ত্র হয় নির্বাসিত। সংবাদপত্রের কণ্ঠ হয় রুদ্ধ। প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ থেকে সেই পীড়নমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থান অবসান ঘটিয়ে, দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্র রচনা করেন তথাকথিত সমাজতন্ত্রের নামে এবং অপচয়প্রবণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে, বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে, বেসরকারি ব্যাংক-বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং ইন্দো-সোভিয়েত কক্ষপথ থেকে বাংলাদেশের গতি পথ পরিবর্তন করে বিশ্বময় বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন। তখনকার অন্যতম পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে হাজারো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হয়ে আবদ্ধ হয় বন্ধুত্বের দৃঢ়সূত্রে। আজকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক, তার ভিত্তি রচিত হয় তখন। ইউরোপ তখন থেকে আগ্রহী হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং গতিশীল অর্থনীতির দূরপ্রাচ্য বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে বাংলাদেশের কাছাকাছি আসে তখন থেকেই। ছুটে আসে বিনিয়োগের ডালা সাজিয়ে। যে চীন এতোদিন বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, সেই চীনের সঙ্গে গড়ে ওঠে বাংলাদেশের হৃদ্যতা। ওই সময় থেকেই ৫৭টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (Organization of Islamic Conference—OIC) তথা মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের অকৃত্রিম মিত্রে পরিণত হয় জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত পদক্ষেপের জন্যে। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন আল-কুদস কমিটির সদস্য হয় বাংলাদেশ। সৌদি আরব হয়ে ওঠে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। আরাফাত ময়দানে রোপিত সারি সারি নিমগাছ এখনো সৌদি আরব-বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সেতুবন্ধনের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধাবদ্ধা নিরসনের দায়িত্ব আসে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ওপর। অন্যদিকে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৭৮

সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হয়ে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে। এখন শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের নির্ভীক সেনানীরা যে ভূমিকা পালন করে চলেছেন তার সূচনা তখন থেকেই। এমনি পরিবেশে যে ভারত সবসময় বাংলাদেশকে 'তাদের সৃষ্টি' বলে দাবি করে উদাসীন থেকেছে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও জনস্বার্থ সম্পর্কে, জিয়ার সৃষ্টিশীল নেতৃত্বে সেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আধিপত্য-অধীনতা (Dominance-Dependence) কাঠামোর ছাড়িয়ে সহযোগিতার শত সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে। দুইয়ের সম্পর্ক হয়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধার, সাম্যের এবং সম-সার্বভৌমত্বের। ভারত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মিত্র।

সংক্ষেপে একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতীয় পর্যায়ে যে সুষম নীতি নির্ধারণ করেন, তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। এসবের মূলে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেছে জিয়ার এই বিশ্বাস যে, মুক্তিযুদ্ধের অনলকুণ্ড থেকে প্রাণ পাওয়া বাংলাদেশের রয়েছে এক ঐতিহাসিক গন্তব্য। রয়েছে তার স্বতন্ত্র ঠিকানা। বাংলাদেশ অন্যের এক ইঞ্চি ভূমির ওপর দখল কায়েম করতে চায় না। চায় না কারো আধিপত্য যেমন মেনে নেবে না, তেমনি কারো ওপর আধিপত্য বিস্তার করে অন্যকে অধীন করতেও নারাজ। জনগণের এই ধ্যানধারণা করেই প্রেসিডেন্ট জিয়া চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক স্বাধীন অ্যাক্টর হিসেবে বাংলাদেশ যোগ্যতর ভূমিকা পালন করুক।

তিন. বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ত্রিবিধ উপলব্ধি (Three Perceptions based on geo-political and socioeconomic considerations have been crucial in the assessment of primary interest of Bangladesh) বাংলাদেশে মৌল জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণ এবং সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত

রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা, জাতীয় নিরাপত্তার দাবি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি শুধু যে স্বাভাবিক তা-ই নয়, কাঙ্ক্ষিতও বটে।

কাঙ্ক্ষিত বলছি এ জন্য যে, এই শতকের দ্বিতীয় শতকের পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের যে ক-টি দেশ অর্থনীতি ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করবে তাদের অধিকাংশই অবস্থিত বাংলাদেশের পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে। যে চারটি অর্থনীতি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠবে অর্থাৎ চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারত, তাদের একটি বাংলাদেশের পশ্চিমে; কিন্তু দুটির অবস্থান বাংলাদেশের পূর্বে এবং দক্ষিণ-পূর্বে। বিশ্বব্যাংকের ওই হিসাব অনুযায়ী—চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও তাইওয়ান—এই দেশগুলোর সাতটিই এশিয়া মহাদেশে এবং ছয়টির অবস্থান বাংলাদেশের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে। শুধু একটির অবস্থান পশ্চিমে আর তিনটি বহু দূরের, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের।

অন্যদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই মহাসমারোহে শামিল হওয়ার তাগিদেই বাংলাদেশের মুখ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ফেরাতে হবে। আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বাংলাদেশের পূর্বমুখী হওয়ার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি। গত শতকে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের প্রতিযোগিতার সাক্ষী যেমন ছিল ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর, একুশ শতকে কিন্তু তেমনি প্রতিযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে ভারত মহাসাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং বাংলাদেশের অবস্থান হলো ভারত মহাসাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। বাংলাদেশ একদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগ বিন্দুতুল্য। অনেকটা দুইয়ের মধ্যে হাইফেনের মতো। বাংলাদেশের এই কৌশলগত অবস্থান দিনে দিনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং কালক্রমে তা রূপান্তরিত হচ্ছে এক ধরনের দিকনির্দেশক হিসেবে। বাংলাদেশের গন্তব্য নির্ধারণে যদি বাংলাদেশের নিরাপত্তাবিশারদ ও অর্থনীতির পণ্ডিতরা ভুল করেন তাহলে বাংলাদেশ যে ব্যাকওয়াটারে (Back water) অবস্থান করছিল, সেখানেই পড়ে থাকবে, অর্থাৎ অজ্ঞাত দক্ষিণ এশিয়ার প্রান্তসীমায় অবস্থিত এক প্রান্তিক (marginalized) রাষ্ট্র হিসেবে।

বাংলাদেশের কৃতি রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম বাংলাদেশের এই কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে সচকিত হন। তিনি 'আমাদের পথ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে নিজেই লিখেছিলেন : 'বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। উপমহাদেশ এবং এ অঞ্চলের মানচিত্রের দিকে তাকালে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের বিশেষ একটা গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ এই উপমহাদেশের এ অঞ্চলে সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এর উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত আর দক্ষিণে সুগভীর বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছে বাংলাদেশ তার আপন ভূখণ্ডের বৈচিত্র্য দিয়ে।'

এই যোগসূত্রের সঠিক প্রয়োগ ঘটাতে আজ বাংলাদেশ যে পর্যায়ে রয়েছে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বাংলাদেশ পূর্বমুখী হলে অবিলম্বে প্রক্ষিপ্ত হবে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাণবন্ত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গতিশীল এক এলাকায়। আধিপত্য-আনুগত্যের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে, সম-সার্বভৌমত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে, বাংলাদেশ অগ্রসর হতে পারবে অগ্রগতির বিস্তীর্ণ মোহনায়। উইনান, মিয়ানমার, ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতটি প্রদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে সম্ভাবনার শত বাতায়ন উন্মুক্ত হবে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে লাওস, কম্পোডিয়া এবং থাইল্যান্ডের শেষপ্রান্ত ছাড়িয়ে গোটা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ পা ফেলতে সক্ষম হবে। এই এলাকায় বিনিয়োগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হতে পারে। সমগ্র এলাকায় সম্পদের বৃদ্ধি ঘটতে পারে প্রচুর পরিমাণে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির তীর ঘেঁষে রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে।

বাংলাদেশ পূর্বমুখী হলে এবং সার্থকভাবে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে আমাদের প্রতিবেশি ভারতের ওপর যে স্বভাবজাত আনুগত্যের প্রবণতা বিদ্যমান তা থেকে অব্যাবহিত লাভও সম্ভব হবে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা না করেও শুধু এটুকু বলতে চাই, ভারত বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চীনকে খাড়া করে ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের রাষ্ট্রগুলোকে, বিশেষ করে নেপাল, ভুটনা ও বাংলাদেশকে

যেভাবে তার নিরাপত্তার লক্ষ্যে ভারত সীমানার বর্ধিতাংশ (Extended frontier) হিসেবে ব্যবহারে মনোযোগী হয়েছে এবং এ জন্যে তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে রাখতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে ভারতের সঙ্গে সুষম সম্পর্কের জন্যেও প্রয়োজন পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক স্থাপন করা। এর কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের পূর্বমুখী হওয়ার পথটি তেমন মসৃণ নয়। তাই অতি সাবধানে এই পথে চলতে হবে। এর কারণ বহুবিধ : এক. বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশি ভারত চায় না বাংলাদেশ পূর্বমুখী হোক, কেননা তাতে ভারত আশঙ্কা করবে বাংলাদেশ তার প্রভাব বলয় থেকে ছিটকে যাচ্ছে। দুই. ভারতও তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করার জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশে গভীরভাবে আগ্রহী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি ভারতীয় স্বার্থের পরিপূরক নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ট্রান্স এশিয়ান রেলপথকে সোজাসুজি চট্টগ্রাম থেকে মিয়ানমারে না নিয়ে সিলেট হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে মিয়ানমারে নেয়ার ভারতীয় অভিসন্ধিতে তার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। তিন. ভারতের পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোকে ভারত যে কোনো সংকটকালে যেভাবে ‘সীমাহীন’ (borderless) এলাকা হিসেবে পরিগণিত করার পরিকল্পনা করেছেন তা ব্যাহত হবে। চার. চীন সম্পর্কে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহমত যেভাবে দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তাও এক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো।

এ অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলতে হবে এবং এক্ষেত্রে যিনি পথিকৃৎ সেই কৃতী রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রদর্শিত পথে চলাই জরুরি বলে মনে হয়। যেসব ঘটনাক্রমের মধ্যদিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে অগ্রসর হতে হয় এবং যে প্রেক্ষাপটে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তা স্মরণে রেখেই নিচে উল্লিখিত সূত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে। এক. ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক অথবা নির্ভরশীলতার সম্পর্কের পরিবর্তে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য হলো গঠনমূলক সহযোগিতার সম্পর্ক। দুই. এ জন্যে জরুরি হলো জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে জাতিকে সচেতন করে তোলা। তিন. এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজন হলো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুমুখীকরণ (Diversification of Internatiobnal

relations)। চার. দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাকে যতটুকু সম্ভব বেশি কার্যকর করা প্রয়োজন যেন সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিয়মিত মিলিত হতে পারেন।

চার. বেগম জিয়ার সৃজনশীল নীতি

বেগম খালেদা জিয়াও একই পথ ও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জনস্বার্থে যা প্রয়োজনীয় তা সংরক্ষণে সংকল্পবদ্ধ হয়ে এগিয়েছেন। এগিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, তাদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের পূর্বমুখী হওয়া যে কোনো প্রতিবেশির স্বার্থের প্রতিকূল নয় তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। বেগম জিয়ার প্রাজ্ঞ নীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি রাজনৈতিক বা নিরাপত্তার বিষয়কে সামনে না এনে, অর্থনৈতিক বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করে এগিয়েছেন। কেননা তিনি অনুধাবন করেছেন, রাজনৈতিক বা নিরাপত্তার ইস্যুতে যে পরিমাণ বিতর্কের তাপ সৃষ্টি হয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়ে যে পরিমাণ হবে তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে যে বিশ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, বেগম খালেদা জিয়ার সময়ে তার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় দক্ষিণ এশিয়ায়, পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ায়, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাও করতে হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এক সময় দক্ষিণ এশিয়া ছিল শুধু পাকিস্তান। উঠতি সোভিয়েত সাম্রাজ্যের গতিরোধক হিসেবে খায়বারপাসের পরেই ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা চুক্তির সম্পাদন করেছিল সেই ১৯৫৪ সালে। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে পাকিস্তান আজও চলছে যুক্তরাষ্ট্রের পিছু পিছু। ভারতের বহু নীতিনির্ধারক সেদিন পর্যন্ত এসব কারণে পাকিস্তাকে ‘সাম্রাজ্যবাদের ভৃত্য’ বলে গালাগাল করেছেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ঘৃনা করে এসেছেন। ভারত কিন্তু জেনে-শুনেই সেই অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করেছে গত শতকেই ষষ্ঠ দশকের প্রথম থেকেই। পাকিস্তান

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি থাকতেই ভালোবেসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকান্ডের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল পাকিস্তান। যুক্তরাষ্ট্রের যোদ্ধাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল নিজেদের দরজা। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোরিজা রাইসরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের। পাকিস্তানকে চিহ্নিত করেছেন ন্যাটোর (NATO) বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতম মিত্ররূপে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক চুক্তির পরে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভুলে যাবে কি? ভারত অবশ্য তা-ই চায়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ভাষণদানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করে বসলেন, বিশ্বব্যাপী পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের পরিবর্তে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান অরক্ষিত পরমাণু অস্ত্র ও প্রযুক্তি বিস্তার করে চলেছে। পরমাণু ও সন্ত্রাস বিস্তার প্রশ্নে পাকিস্তানকে 'দায়িত্বহীন' বলে আখ্যায়িত করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ব্যাপক হাততালির মধ্যদিয়ে গৃহীত হয়। কিন্তু চীনকে সংযত (Contain) রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্র ভালোভাবেই জানে দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমের পাকিস্তানকে উপেক্ষা করা অথবা পাকিস্তান সম্পর্কে উদাসীন থাকা প্রায় অসম্ভব এবং তাও দুটি কারণে: এক. ক্ষমতা, প্রভাব এবং চীনবিরোধী মনোভাবের নিরিখে পাকিস্তান ভারতের সমকক্ষ না হলেও যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ভুলে যেতে পারে না, বিশেষ করে তার কৌশলগত অবস্থানের জন্যে। দুই. দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমানবিক শক্তির একটি হলো পাকিস্তান। তাই সাধারণ সামরিক শক্তিতে (Conventional Armament) অনেক দুর্বল হয়েও পাকিস্তান চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও ভীতির ভারসাম্য (Balance of Terror) প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। চীন সীমান্তে দণ্ডায়মান পাকিস্তান ঋণ স্বীকার করে চীনের। এ কারণেও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে উপেক্ষা করে কী করে?

পাঁচ. বেগম জিয়ার সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের জন্মক্ষণে বিশ্ব ছিল দ্বিকেন্দ্রিক (Bipolar). দুই পরাশক্তির প্রভাব বলয়ে বিভক্ত। একদিকে পরম পরাক্রমশালী যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে অসামান্য শক্তির অধিকারী সোভিয়েট ইউনিয়ন। স্নায়ুযুদ্ধের (Cold War)

উত্তাল তরঙ্গে তখন বিশ্ব-রাজনীতি প্রবলভাবে আন্দোলিত। তারই প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়া তখন ছিল দ্বিধাবিভক্ত। সত্তরের প্রথম পর্যায়ে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্র-চীন অক্ষশক্তির অংশীদার ছিল পাকিস্তান আর সোভিয়েট মোর্চার অংশ ছিল ভারত। সোভিয়েট ইউনিয়ন-ভারত মোর্চার অন্তরঙ্গ সহযোগিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ সহজ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ সম্পর্কে হেনরি কিসিঞ্জারের কটুক্তি এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে চীনের ভেটো প্রদানের কথা স্মরণ করলে বিষয়টি সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এর আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ছিল অনেকটা মধ্যপন্থার, আদর্শিক, জোটনিরপেক্ষতার। পঞ্চম দশকের প্রথম দিকে গান্ধী-নেহরুর ভারত পঞ্চশীলা-মন্ত্রঃপুত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে ওঠে। পন্ডিত নেহরুর নাম উচ্চারিত হতে থাকে টিটো, জামাল নাসের, সুকর্নো ও এনক্রুমার সঙ্গে। এ অবস্থান থেকে সোভিয়েট কক্ষপথে প্রবেশ নেহাত কম কথা নয়। ষাটের মাঝামাঝি থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ে ওঠে ভারতের প্রতিরক্ষা সামগ্রীর প্রধানতম উৎস। সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়েকটি অস্ত্র নির্মাণকারী কোম্পানির লাইসেন্স নিয়ে ভারত নিজস্ব ভূখণ্ডেই নির্মাণ করেছে মিগসহ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স থেকেও পেয়েছে যুদ্ধাস্ত্রের বিপুল সরবরাহ।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলে, বিশেষ করে এক পরাশক্তির বিশ্বে, যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র পরাক্রম সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের দিন শেষ। রাশিয়া এখন এক বৃহৎ শক্তি বটে কিন্তু প্রভাব এবং ক্ষমতায় অতীতের সোভিয়েট ইউনিয়নের ছাত্রামাত্র, যদিও তার মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার প্রায় পরাশক্তিতুল্য। এদিকে চীন দৈত্যের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে যেভাবে এগিয়ে আসছে অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তির নিরিখে, বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার সুষম সুসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে, তাতে পেন্টাগনের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। একক পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বশাসনের যুক্তরাষ্ট্রের বাসনা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সম্প্রতি গভীর মনোযোগী হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। সে কারণেই চীনের পশ্চিমে অবস্থিত ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত মিত্ররূপে এরই মধ্যে বাছাই করেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক ইউএস ইনস্টিটিউট অব পিস (US Institute of Peace)-এর কৌশলবিদ

এবং সমরবিদরা বিশ্বের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ভারতকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করেছে।

বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে চীন এরই মধ্যে তার অর্থনৈতিক পেশি ভয়ঙ্করভাবে সুদৃঢ় করেছে। আগামী দশকে চীন বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপায়িত হতে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তার অর্থনৈতিক পেশি সুদৃঢ় হলে সামরিক শক্তির ভান্ডার অফুরন্ত হয়ে উঠবে। রাশিয়াও চীনের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। চীন যেন সমরাস্ত্র তৈরিতে পিছিয়ে না পড়ে, সেই লক্ষ্যে যেমন লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র (Fourth Generation) নির্মাণের প্রযুক্তিও হস্তান্তর করেছে চীনের কাছে। রাশিয়ার সহযোগিতায় চীন তার গণমুক্তিফৌজের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করে তাকে আরো গতিশীল করেছে। প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে প্রসিসন গাইডেড (Precision-Guided) অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের কলাকৌশল উদ্ভাবনেও। এককথায়, চীন হতে চলেছে আরেক পরাশক্তি, যা অতীতের সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অনেক বেশি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা প্রতিরক্ষাবিশারদ রিচার্ড ফিশারের সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রতি শব্দে, এসব কারণে, যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে তা যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

বছর কয়েক আগে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে দশ বছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা ও কৌশলগতদ চুক্তি স্বাক্ষর করে এসেছেন তাতেও ভীষণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি হয়েছে মিসাইল প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পারমাণবিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ ও উৎপাদনের কৌশল উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের গতি দ্রুতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করার বিষয়েও চুক্তি হয়েছে।

এর কয়েকদিন পরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের যৌথ সভায় ভাষণে এবং বুশ-মনোমহন যৌথ ঘোষণায় যা প্রকাশিত হয়েছে, তারও মূলকথা হলো দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ভারতে পরমাণু প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপর আরোপিত

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে বেসামরিক পরমাণু প্রযুক্তি সংগ্রহে ভারতের আর কোনো বাধা রইলো না। ভারত স্বীকৃতি লাভ করলো অন্যতম পারমাণবিক শক্তি হিসেবে এবং শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, গোটা এশিয়ায় অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসেবেও স্বীকৃতি লাভের পথ প্রশস্ত হলো ভারতের।

ওবামা প্রশাসনের কাছেও স্থিতিশীল দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ভারতের নেতৃত্ব এবং আদিপত্য, অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট হিলারি ক্লিনটন সম্প্রতি Foreign Policy-র এক সংখ্যায় বললেন : 'যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কৌশলগত এক বাজি ধরেছেন' (The Us is Making a strategic bet on Indi's future)। একটু ব্যাখ্যা করে তিনি আরো বলেন : 'উভয় পক্ষেই কিন্তু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা অতিক্রম করতে হবে এবং দু-দিকেই কিছু প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেতে হবে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌশলগত আস্থা স্থাপন করছে যে, বৈশ্চিক পর্যায়ে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শান্তি এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।'

[There are still obstacles to overcome and questions to answer on both sides, but the United States is making a strategic bet on India's future that India\s greater role on the world stage will enhance peace and security' Nilanthi Samaranayake, South Asia, January 2012: Issue 3]

২০১০ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা ভারত সফরে এসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি স্থায়ী আসনে ভারতের প্রার্থিতা সমর্থনের অঙ্গীকারই শুধু করেননি, যুক্তরাষ্ট্র-ভারত প্রতিরক্ষা পলিসি গ্রুপ (Us-India Defense Policy Group) এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত কৌশলগত আলোচনায় (Us-India Strategic Dialogue) নিয়মিত মতবিনিময় করার প্রস্তাব করেন। যুক্তরাষ্ট্র, তাছাড়া, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সংক্রান্ত কৌশলগত আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। কিছুদিনের জন্যে Indian Air Force's Medium Multi Role Combat Aircraft (MMRCA) প্রকল্পকে কেন্দ্র করে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে মান-অভিমানের পালা বিদ্যমান থাকলেও ভারত যখন Boeing's C-17 Globemaster -এর বিরাট বহর লাভ করে তখন তারও অবসান ঘটে।

চীনের অস্বাভাবিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় ভারতকেই বেছে নিয়েছে তার কৌশলগত অংশীদার (Strategic partner) হিসেবে। তাছাড়া ভারতের রয়েছে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। রয়েছে তার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সক্ষমতা এবং তার রয়েছে মিয়ানমার, ভিয়েতনামসহ অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব যে গড়ে উঠবে তা স্বাভাবিক।

দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যেমন পাকিস্তানের অবস্থান, দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তেমনি অবস্থান বাংলাদেশের। চীনের মোকাবিলার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে নেপাল ও ভুটান।

শ্রীলঙ্কার দিকে তাকান, দেখবেন তার অবস্থানও কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই শতাব্দীতে বৃহৎশক্তি বা পরাশীক্তগুলোর শক্তি পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র শুধু স্থলভাগ বা ভূখণ্ড হবে না, হবে সমুদ্র—ভারত মহাসাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর। এ জন্যে ভারত মহাসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অবস্থান কৌশলগত দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত মহাসাগরের তীরেই বাংলাদেশ এবং অদূরেই দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। যুক্তরাষ্ট্র চায় গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় তার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করতে। চায় দিয়েগো গারসিয়া থেকে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ অবাধ রাখতে। ভারতকে ভালোভাবে জেনেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত কতটুকু জেনেছে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসা চীনের গতি রোধ করতে উভয়ের মনের মিল (Meeting of minds) ঘটেছে। লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হলেও পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভাবনা আজ না হোক কাল হয়তো দেখা দেবে (আহমদ ২০০৫: ৩২-৩৫)।

যুক্তরাষ্ট্র চায় বিশ্বময় তার একক পরাশক্তিসুলভ প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে; কিন্তু ভারতের লক্ষ্য গোটা এশিয়ায় তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ভারতের জন্যে যথেষ্ট নয়। দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত তা বিস্তৃত হোক এটি ভারতের লক্ষ্য। তাই চীনকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে সার্থকভাবে চীনের মোকাবিলার জন্যে, ভারত চায় দক্ষিণ এশিয়ার গোটা পূর্বাঞ্চলকে ভারতের বর্ধিত সীমানা (Extended Frontier) হিসেবে ব্যবহার করতে। এই লক্ষ্যে যদি প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোকে অস্থিতিশীল হতে হয় তা হোক। অন্যদিকে,

যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা-ভাবনায় চীনকে মোকাবিলার সঠিক পন্থা হলো দক্ষিণ এশিয়ার ছোট-বড় সব রাষ্ট্রকে সম্মিলিত করে চীনের মুখোমুখি করা। এ জন্যে প্রতিটি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে চীনের আদর্শিক অঙ্গীকারের সব আবেদন মুছে ফেলা। এই ভিন্নতাই এক সময়ের দু-পক্ষের মধ্য সৃষ্টি করতে পারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।

এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের চারদিকে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ এগুলোকে চিহ্নিত করেছেন 'মুক্তার মালা' (String of Pearls) হিসেবে। এই মুক্তার মালা তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়েছে এই সম্ভাবনার জন্যে যে, চীন এসব রাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতকে বৃদ্ধাবদ্ধ (encircle) করে ফেলতে পারে। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার অথবা সিসিলিসের (Seychelles) মতো ভারত মহাসাগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোতে যদি চীনের নৌবন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চীনের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তির প্রভাব যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। ২০১১ সালে দক্ষিণ এশীয় প্রতিযোগিতা সংস্থার শীর্ষ নেতৃবৃন্দের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল মালদ্বীপে, তখন চীনের পক্ষ থেকে ASEAN+1 কাঠামোর মতো SAARC+1 কাঠামোয় সার্কের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। এমনকি ভূমি পরিবেষ্টিত নেপালের সঙ্গেও চীন অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যোগসূত্র স্থাপনের আলোচনার করে ২০১১ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাওয়েল (Wen Jiabao) কাঠমান্ডু সফরের সময়।

২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের প্রতিরক্ষা কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের অ্যাডমিরাল রোবার্ট এফ উইলার্ড (Admiral Robert F Willard of USAOM) বলেন 'ভারত ছাড়াও গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় রয়েছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ' (The US has extensive interests throughout the rest of South Asia) ২০১১ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতামূলক যৌথ অনুশীলন সম্পন্ন হয়। এটা Co-Operation Afloat Readines and Training (CARAT) নামে পরিচিত ছিল। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ১৬টি আত্মরক্ষামূলক যান অনুদান দেয়। নেপালেও যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী

নেপালের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ার ব্যবস্থা করে। মালদ্বীপেও যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা বাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে আন্তর্জাতিক সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (International Military Education and Training-IMET) কর্মসূচির অধীনে। ২০০৭ সালে শ্রীলংকা প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা সহযোগিতা না দেয়া যে শর্ত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ২০১১ সালের Galle Dialogue-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র শ্রীলংকার সামরিক বাহিনীর সহায়তায় আগ্রহী হয়েছে সম্প্রতি। শ্রীলংকার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তেমন সুসম্পর্ক না থাকলেও রাষ্ট্রদূত ব্লেক (Blake) বলেছেন, 'শ্রীলংকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ (Sri Lanka remains of Strategic interest to the US)। রাষ্ট্রদূত ব্লেক বাংলাদেশ সম্পর্কেও বলেছেন, 'সন্ত্রাস প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সহযোগিতা চায়।' অন্য কথায়, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট। ২০১০ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা ভারতীয় পার্লামেন্টে বলেছিলেন : 'সাধারণ মূল্যবোধ এবং স্বার্থভিত্তিক ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক একুশ শতকের অন্যতম নির্ধারণীয় অংশীদারিত্বের উদাহরণের মতো' (The relationship between India and America Will be one of the defining partnerships of the 21st century, rooted in common Values and interest's)।

দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের এই বৈপরীত্যভরা নীতি ভারতের নীতিনির্ধারকদের জন্যে মাঝে মাঝে সমস্যা সৃষ্টি করলেও, দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহকে ভালো চোখেই দেখছে। শ্রীলংকা বেশ ক-বছর পরে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আগ্রহকে অভিনন্দন জানায়। মালদ্বীপ সামুদ্রিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি হলে খুশিই হবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায় আগাম তথ্যলাভের মাধ্যমে সাবধানতার সুযোগ পেলে যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিকে স্বাগত জানাবে। নেপালও যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষেই রয়েছে।

তারপরেও কথা থাকে। আজকের বিশ্বপরিস্থিতির নিরিখে, বিশেষ করে বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে ইন্দো-মার্কিন শক্তির ইরাক দখলের পরে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো মস্তবড় হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। সম্ভাব্য শত্রুর ওপর আগেভাগে আক্রমণ পরিচালনা করে তাকে বিধ্বস্ত করার যে বুশ তত্ত্ব (Doctrine of Pre-Emptive Attack) আক্রমণকালে আন্তর্জাতিক বিবিধানকে উপেক্ষা

করে এবং জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে শক্তি প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত বিশ্বব্যবস্থায় সৃষ্টি করেছে গভীর অনিশ্চতা। এই অনিশ্চয়তা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর জন্যে ভীতির কারণ নয়, যুক্তরাষ্ট্র যে অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তারে কৃতসংকল্প সেসব অঞ্চলে তার সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোও ওইসব অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তা থেকে মনে হয়, যে অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মৌল অর্থনৈতিক অথবা নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট রয়েছে সে অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি না। ওইসব অঞ্চলের কৌশলগত অবস্থানেচ স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না তারা। এমনকি যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও সই। আন্তর্জাতিকহ রাজনীতি ও বিধিবিধান বা জাতিসংঘের অনুমোদনেরও কোনো তোয়াক্কা করবে না। ফলে গোটা এশিয়াব্যাপী—পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক মেরুকরণ শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে এশিয়াব্যাপী ঠাণ্ডাযুদ্ধের মহড়া।

দক্ষিণ এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিন। দেখবেন দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর ভারত ও পাকিস্তান ব্যস্ত রয়েছে নতুন নতুন কৌশলে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে নিজেদের প্রতিরক্ষা মজবুত করতে। ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত সহযোগীতে রূপান্তরিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ এবং মধ্যপ্রাচ্যে অকৃত্রিম মিত্র ইসরাইলও ভারতের কাছাকাছি এসে গেছে। ভারত কাজে লাগাচ্ছে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এক্সপার্টিজ (Expertise)। লক্ষ্য একটাই এবং তা হলো, পূর্ব সীমান্তে দ্রুত এগিয়ে আসা চীনের সার্থক মোকাবিলা। পূর্বে মালাক্কা প্রণালী থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ায় ইসরাইল এবং মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানের মধ্যদিয়ে কাজাকিস্তান ও তাজিকিস্তান পর্যন্ত প্রভাব বলয় বিস্তৃত করে এশিয়ায় এক নম্বর শক্তি হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করা।

চীনও বসে নেই। পাকিস্তানকে আরো কাছে টেনে, মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধনসূত্র আরো দৃঢ় করে, ভারতের পূর্বপ্রান্তের রাষ্ট্র নেপাল ও বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। এক কথায়, এই নব্য স্নায়ুযুদ্ধের মহড়ায়

ভারত যেমন চীনের তিন পাশে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে একধরনের বন্ধনী সৃষ্টি করছে, চীনও তেমনি তার সামরিক বলয় তিব্বত থেকে পাকিস্তান এবং মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশ, এমনকি শ্রীলংকা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে উদ্যত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের গোপন দলিলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যা ঘটতে পারে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তিব্বতে চীনের বিমান ঘাঁটি বিস্তৃতকরণ, ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি কোকো দ্বীপপুঞ্জে চীনের নৌবাহিনীর ঘাঁটি, মিয়ানমারের মানদালয়ে প্রায় ১২ হাজার বর্গফুট দীর্ঘ রানওয়ে নির্মাণ, পাকিস্তানকে চীনের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তাদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি। চীনের কাছাকাছি মালাক্কা প্রণালীতে মার্কিন ও ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ টহল ব্যবস্থা। ২০১৪ সালে মার্কিন বাহিনীর আফগানিস্তান ত্যাগের পরে আফগানিস্তানে জাতীয় বাহিনী সংগঠনে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা, তাজিকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সামরিক সহযোগিতা, এমনকি ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনীর যোগাযোগও এশিয়ায় ভারতকে প্রধান শক্তি হিসেবে সুসজ্জিত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রধানত দুটি কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। এক. ২০২০ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে চীনের যে অবস্থান সৃষ্টি হবে তা কোনোক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। সুতরাং চীনকে নিবৃত্ত (Containment) করার জন্যে প্রয়োজন হবে ভারতকে। দুই. উত্তর কোরিয়া যদি তার পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করতে থাকে তাহলে দূরপ্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তখন ভারত হয়ে উঠতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চিত অবস্থান ক্ষেত্র। তাছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে এখন যেমন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব অথবা কুয়েত ও কাতারে নিরাপদবোধ করে, তখন মধ্যপ্রাচ্য ছেড়ে ভারতে ছুটে আসতে হবে।

আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপর্ণ বাংলাদেশ শুধু যে একদিকে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত তা-ই নয়, এই

শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে বৃহৎ ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোর যে শক্তি প্রদর্শনের মহড়া অনুষ্ঠিত হবে, সেই ভারত মহাসাগরের উপকণ্ঠে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এমন গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত অবস্থানের অধিকারী বাংলাদেশ সুনিশ্চিত এবং সুপরিকল্পিত পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতি অনুসরণে ব্যর্থ হলে হয় পড়বে বিরাট কুমিরের পেটে, না হয় ক্ষুধার্ত অজগরের সহজ শিকার। ডাঙ্গায় অজগর এবং পানিতে কুমি কোনোটিই নিরাপত্তার জন্যে গ্রহণযোগ্য নয়। বেগম খালেদা জিয়া আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই উভয় সংকট সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। অবহিত এ বিষয়টি সম্পর্কেও যে, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস ভারত বা পাকিস্তানের ইতিহাসের মতো নয়। ভারতের স্বাধীনতা এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে কনফারেন্সের টেবিলে, তীক্ষ্ণধার যুক্তি-বুদ্ধির ফলে। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে, তীক্ষ্ণধার মারণাস্ত্রের মাধ্যমে। তাই বাংলাদেশের গন্তব্য যে ভারত এবং পাকিস্তান থেকে ভিন্ন তা অন্য কেউ না জানলেও বেগম জিয়া অনুধাবন করেছেন সবার আগে। তাই ভারতের মতো আধিপত্যবাদী না হয়ে এবং পাকিস্তানের মতো যুদ্ধ উন্মাদনায় ভেসে না গিয়ে বাংলাদেশকে যেতে হবে হাজার যোজন শান্তির পথে। ছুটতে হবে তীরগতিতে উন্নত জীবনের অভিযাত্রায়, যেতে হবে অনিশ্চয়তার মধ্যেও। তাই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বাংলাদেশের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কোনো জোটে আবদ্ধ না হয়ে, সব সময় বিবেকের বাণী মাথায় রেখে, মুক্তচিন্তাকে মূলধন করে বাংলাদেশকে বিস্তৃত হতে হবে বিশ্বময়।

এই সত্য অনুধাবন করে প্রেসিডেন্ট জিয়া কোনো রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় জোটের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বাংলাদেশের জন্যে সূচনা করেন তার নতুন পররাষ্ট্রনীতি। এই নীতির আলোকেই তিনি ইন্দো-সোভিয়েট কক্ষপথ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন করে তোলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্দরমহলে বাংলাদেশকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। একদিকে মুসলিম বিশ্বাস, অন্যদিকে কনফুসিয়ান ও বৌদ্ধ জাপানের কাছাকাছি নিয়ে গেলেন বাংলাদেশকে। যে ভারত জিয়াউর রহমানের বিরোধিতা করেছিল সেই ভারত এক পর্যায়ে রূপান্তরিত হয় বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুত্বে। মোটকথা, মাত্র ক-বছরের মধ্যে যে যে বাংলাদেশ ছিল বিশ্ব পরিমণ্ডলে বন্ধুহীন, নিঃসঙ্গ, একাকী, প্রেসিডেন্ট জিয়ার সৃজনশীল পররাষ্ট্রনীতির বদৌলতে সেই বাংলাদেশ অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এক সম্মানজনক

অবস্থানে। জাতিসংঘে সুদৃঢ় হয় তার মর্যাদা। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ইরাক-ইরান যুদ্ধের অন্যতম মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় মনোনীত হন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

ছয়. পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বেগম জিয়ার আদর্শবাদিতা

বেগম খালেদা জিয়া প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রণীত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছেন। তার মতো তিনিও বিশ্বাস করেন যে, কোনো বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছাকাছি থেকে বাংলাদেশকে এমন পররাষ্ট্রনীতি উদ্ভাবন করতে হবে যা সংঘাতমূলক প্রবণতা পরিহার করে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হবে। পাশাপাশি তা এমন হবে যা সম্পর্কের বহুমুখীকরণে সৃষ্টিশীল নীতি। একজন অর্থনীতিবিদের ধারণায় যেমন বিনিয়োগাযোগ্য সকল ডিমকে একটি ঝুড়িতে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তেমনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অথবা নিরাপত্তাবিশারদের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একমুখী করাও ঠিক নয়। অধ্যাপক নরথেজের (F.S. Northesge) কথায়, 'জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, রাষ্ট্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল ও গতিশীল প্রক্রিয়ার সমষ্টি হলো পররাষ্ট্রনীতি।' এর কেন্দ্রবিন্দু হলো 'জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন মাত্রা' যা রাষ্ট্র সংরক্ষণ করতে কৃতসংকল্প। এই মৌল স্বার্থগুলোই (Core Values) রাষ্ট্রকে নির্ধারিত পথে চলতে বাধ্য করে। পররাষ্ট্রনীতি সব সময় হয় গতিশীল। এবং কোনো কোনো পর্যায়ে পরিবর্তনশীল, কেননা প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হলে অথবা জাতীয় স্বার্থের মাত্রায় পরিবর্তন এনে নীতিতে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাছাড়া যারা নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত স্টাইল অনুযায়ীও নীতির কোনো কোনো অংশে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া যখন রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করেছিলেন, তখন বিশ্ব ছিল দুই পরাশক্তির প্রভাব বলয়ে বিভক্ত। যখন বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হন, তখন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে এক পরাশক্তির বিশ্বের সূচনা হয়। সূচনা হয় বিশ্বায়নের নব নব প্রক্রিয়ারও। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মৌলিক কিছু প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কিছু ছাড় দিতে হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ৯ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনাও রাষ্ট্রমণ্ডলে কিছু পরিবর্তনের সূচনা

ঘটায়। ইরাক, আফগানিস্তানের মতো রাষ্ট্রকে জবরদখল করে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে Non-State অ্যাক্টরের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ছিলেন পুরোপুরি প্রয়োগবাদী (Pragmatist), কিন্তু বেগম জিয়া কিছুটা আদর্শবাদী (Idealist)। তবে দুজনই লক্ষ্য অর্জনে আপসহীন। দু-জনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক বিধিবিধান মেনে চলার প্রবণতা সহজাত। দু-জনই শক্তিশালী জাতিসংঘের পক্ষে। সবচেয়ে বড় কথা, দুজনেই চান বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে, স্বাধীনভাবে বিশ্বময় বিস্তৃত হোক জনস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি ঘটাতে।

এই প্রেক্ষাপটে বেগম খালেদা জিয়া অনুধাবন করেছেন, বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সামরিক সাজসজ্জার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে নিরাপত্তার জন্যে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ অর্থনৈতিক অর্জন যে অধিক জরুরি তা স্বীকার করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই অধিক গ্রহণযোগ্য। ২০০২ সাল থেকে বেগম খালেদা জিয়া পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অনেকটা দিকপরিবর্তন করেন। পরিবর্তিত হয় স্টাইলও। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য : এক. তখন থেকে নীতি নির্ধারিত হচ্ছে ঢাকায়, বাংলাদেশের স্বার্থে, সব নিয়ন্ত্রণমুক্ত পরিবেশে। দুই. পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হলো ত্রিবিধ : (ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে সৎ প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ, (খ) বৈশ্বিক পর্যায়ে কূটনীতিকে আরো গতিশীল সুনিশ্চিতকরণ। তিন. বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতিঃ বাংলাদেশের 'পূর্বদিকে দৃষ্টি দিন' (Look East) নীতির অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ অন্য দিকগুলো উপেক্ষা করছে।

এক্ষেত্রে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বমুখী নীতির কার্যকরতায় বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

২০০২ সালের আগস্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং ঢাকায় এলে এবং পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি সফরে গেলে ভারতের নীতিনির্ধারকদের সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া হয়, বাংলাদেশ ভারতকে এক মহান প্রতিবেশি হিসেবে চায়। ২০০২ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২০০২ সালে

জুলাই মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ঢাকা সফরে এসে তিনিই দীর্ঘ একত্রিশ বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের বর্বর আচরণ, গণহত্যা ও তাদের অমানবিক নিপীড়নের জন্যে প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ফলে দীর্ঘদিন পরে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত উপশমের পথ প্রশস্ত হয়।

বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতির উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হলো বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কে নতুন অধ্যায়। ২০০২ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পাঁচ দিনের চীন সফরে যান। সেখানে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলোচনা-পর্যালোচনার পরে কিছু কিছু দ্বিপাক্ষিক, দীর্ঘকালীন এবং ব্যাপকভিত্তিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসব চুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল ও থাকবে। এ সময় থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে এসে চট্টগ্রাম-চিয়াংমাই উদ্বোধনী ফ্লাইটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে থাইল্যান্ড সফরে নিয়ে যান স্বয়ং। এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এ সময় বাংলাদেশের অন্যতম নিকটতম প্রতিবেশি মিয়ানমারের সঙ্গেও বাংলাদেশের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল থান সা (Than Shwe) ঢাকা সফরে এলে অন্তরঙ্গ পরিবেশে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় কক্সবাজার থেকে ইয়াঙ্গুন পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

শুধু থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার কেন, ২০০৩ সালের জুন মাসে (১৮-২০) ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমন এ সময়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সুকর্নপুত্রী মেঘবতীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আসিয়ানের (ASEAN) এই তিনটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ। তাছাড়া ২০০৪ সালের ২২-২৪ মার্চ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ট্রান ডাক লুয়ঙ্গের (Tran DUC LUONG) ঢাকা সফরও এই প্রেক্ষিতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলাদেশের এই পূর্বমুখী নীতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, বাংলাদেশের চারপাশে বহু বন্ধুরাষ্ট্রের সমাহার এবং ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। বাংলাদেশের সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সফরও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উঠতি অর্থনৈতিক শক্তি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সংহতি সম্মেলনের (Organization of Islamic Conferrence—OIC) অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যোগদান এবং মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গেও বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রচনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এসবের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শত বাতায়ন উন্মুক্ত হয় (আহমদ ২০০৫: ৪৫-৪৯)।

বেগম খালেদা জিয়ার ভিয়েতনাম সফর

২০০৫ সালের মে মাসে (১৭-১৮) বেগম খালেদা জিয়া ভিয়েতনাম সফর করেন। বাংলাদেশের কোনো সরকারপ্রধানের এটিই ছিল সর্বপ্রথম ভিয়েতনাম সফর। ভিয়েতনামের সরকার এবং জনগণ বেগম জিয়াকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানান। বেগম জিয়াও মুগ্ধ হয়ে বলেন : 'আমার এই ঐতিহাসিক সফর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হয়েছিল, আমরা অনুভব করি কত বিরাট বিরাট প্রতিবন্ধকতা উল্লঙ্ঘন করতে হচ্ছে আপনাদের। আমার বিশ্বাস এই সফরের মধ্যদিয়ে উন্মোচিত হবে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার শত বাতায়ন।' (I am confident that through this visit we will be able to seek out many more areas of co-operation and provide directions to build up a more meaningful relationship.)|

২০০৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষা সমাপনী সনদপত্র বিতরণ উপলক্ষে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলেন : বাংলাদেশ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো :

সমমর্যাদার ভিত্তিতে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আমাদের রয়েছে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতির অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ অন্যান্য দিক সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের বসতি। দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ কখনো উদাসীন থাকতে পারে না। ২০০২ সালের ৪-৬ জানুয়ারি নেপালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যোগদান করেন এবং মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন : 'আমরা চাই এই শতাব্দীর জন্যে এক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভাবন করতে।' [We seek to forgo together a common vision for the new century.] ২০০৩ সালের এপ্রিলে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিমা কুমারাতুঙ্গার ঢাকা সফর আঞ্চলিক সহযোগিতা ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক। ২০০৩ সালের ১৭-১৯ ডিসেম্বর নেপালের প্রধানমন্ত্রী সূর্য বাহাদুর থাপার বাংলাদেশ সফর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০০৫ সালের ৮-৯ এপ্রিল ওয়েন জিয়াবাও (Wen Jiabao) বাংলাদেশ সফরে এসে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাঁচটি চুক্তি, দুটি স্মারক এবং দুটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে প্রমাণ করেন, উঠতি, পরাশক্তি চীন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য অ্যাক্টর (Actor) মনে করে। তার কথায়, 'বাংলাদেশ যেমন নিরাপদ, তেমনি দ্রুত অগ্রসরমান।'

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদে ১২তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়া এক ধরনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সার্ক-কাঠামোয় দক্ষিণ এশিয়ার সব রাষ্ট্রের সহযোগিতাকে আরো প্রাণবন্ত ও অর্থপূর্ণ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'সার্কে (SAARC) প্রতিফলিত হচ্ছে বিশ্বমানবের এক-চতুর্থাংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বৈঠক সম্পর্কে জনগণের রয়েছে আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা। আমরা জনগণের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ হতে দিতে পারি না।' [SAARC represents the hopes and aspirations of about

one-fourth of the humanity. Expectations for our meetings are high and we must not fail our people.] ২০০৫ সালে সার্কের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়, বেগম খালেদা জিয়ার তত্ত্বাবধানে। এই বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সদর্প পদচারণা ছাড়াও বিশ্বময় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অব্যাহত রাখে প্রাণবন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শতগ্রন্থি। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে জড়িত রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের সৌহার্দ্যপূর্ণ গতি। ২০০৩ সালের জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল (Colin Powell) বাংলাদেশে এসেছিলেন পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ হচ্ছে একটি মধ্যপন্থী, উদারচেতা এবং গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে সংকল্পবদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী একটি জনপদ।' [A moderate, libeal, practicing democracy, a role model for communal harmony.]

২০০২ সালের ৩ জানুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার (Tony Blair) বাংলাদেশ সফরে এসে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, A society believing in communal harmony and liberal democracy. বেগম খালেদা জিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, 'আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও বর্ধিত সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।' [Our bilateral trade has developed satisfactorily. There is a wide scope to further expand economic trade. Investment and development co-operation between our two countrices.]

বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। এক. বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি যে কোনো প্রতিবেশীর, বিশেষ করে ভারতের, স্বার্থের বিরোধী নয় তা সহজ ও সরলভাবে সবার কাছে সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। দুই. বাংলাদেশের পূর্বমুখী নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত

সচেতনভাবে অর্থনৈতিক বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সামনে না এনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, কেননা রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সামনে না এনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, কেননা রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্কের তাপ সৃষ্টি হতে পারে। এই তাপ ছড়িয়ে পড়তে পারে পূর্বদিক ছাড়া পশ্চিমেও।

তাছাড়া, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হতে হলে, বিশেষ করে এই নীতি থেকে যথার্থ ফল পেতে হলে, দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এক. পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল নানা প্রশ্নের অবতারণা করলেও ওইসব দেশে আইন-শৃঙ্খলার মান যে অত্যন্ত উন্নত তা সর্বমহলে স্বীকৃত। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলেই সেসব অঞ্চলে বিনিয়োগ হয় নিশ্চিত। কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয় এক নিশ্চিন্ত পরিবেশে। বাংলাদেশেও এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। দুই. পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নেই বললেই চলে। কোনো বিনিয়োগ অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করে বিনিয়োগকারীকে ঘাটে ঘাটে নাকানি-চুবানি খেতে হয় না। প্রতি পদক্ষেপে উৎকোচের তেল দিয়ে পথকে পিচ্ছিল করতে হয় না। বাংলাদেশে কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার, বিশেষ করে উৎকোচের হাত বড় লম্বা। এই লম্বা হাতকে ছেঁটে না ফেলতে পারলে পূর্বমুখী দুর্নীতির মাত্রাকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে না আনতে পারলে কোনো লাভ হবে না। চার. পূর্ব এশিয়ায় চীনের সঙ্গে সুসম্পর্কের ভিত্তি হলো তাইওয়ানের সঙ্গে সব সম্পর্কের শূন্যতা। দুই নৌকায় পা দিলে তার পরিণতি শুভ হয় না। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের এই সত্য অনুধাবন করতে হবে। বেগম খালেদা জিয়ার নতুন শাসন-প্রশাসন নীতি এক্ষেত্রে হতে পারে মণিকাঞ্চনতুল্য।

সাত. জাতিসংঘ ও বেগম জিয়া

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আন্তর্জাতিক বিধিবিধান, বিশেষ করে জাতিসংঘের প্রতি ছিল অবিচল আস্থা। তেমনি বেগম খালেদা জিয়াও জাতিসংঘের প্রতি ছিলেন গভীরভাবে আস্থাবান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬০তম অধিবেশনে যোগদান করে

'শান্তি, ন্যায়বিচার, ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ্যই এখনো প্রধান অবলম্বন' শীর্ষক এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'জাতিসংঘ সনদের প্রতি আমরা সাংবিধানিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।' তিনি বলেন, 'জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় নৈতিক শক্তি এর বৈধতা, যা আন্তর্জাতিক আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, আর কোনো দেশের পক্ষে এককভাবে উন্নতি করাও সম্ভব নয়। শান্তি, ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ এখনো প্রধান অবলম্বন।'

তিনি বলেন, 'পরিবর্তনের প্রবল চাপে বর্তমান বিশ্বে গতিশীলতা এসেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার এবং ব্যক্তি অধিকারের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বায়ন ও মানবতাবাদী আইনের অগ্রগতি আজ এমন এক পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে যেখানে সার্বভৌমত্বের ধারণা হয়ে পড়েছে প্রশ্নের সম্মুখীন। আজ বিপর্যস্ত বিশ্ব নিরাপত্তার সংঘাতের পরিবর্তিত ধারায় প্রকৃতি ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে এক অনিশ্চিত পরিবেশ। এই জটিল অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। আর এসবের জন্য দরকার উন্নয়ন ও আইনের শাসন।'

বিশ্ব আজ নানাবিধ নতুন ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে বিভিন্ন চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী চক্র যেমন সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমনি বঞ্চনা, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধী, পরিবেশের অবনতি ইত্যাদি নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতার জন্ম দিচ্ছে। লন্ডন এবং মিসরের সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা সবাই মর্মাহত। তবে সম্মিলিতভাবে এ ধরনের হুমকি মোকাবিলায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবিরোধী জাতিসংঘ ও আঞ্চলিক সব কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। সন্ত্রাস বিষয়ে অবিলম্বে একটি সর্বজনীন কনভেনশনের প্রতি আমরা সমর্থন জানাচ্ছি। আমি নিঃসংকোচে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, সন্ত্রাসীদের কোনো ধর্ম বা দেশ নেই।

বেগম খালেদা জিয়া আরো বলেন, 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশকে

একটি ব্যর্থ গণতন্ত্রের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করেন। তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯৯০ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম সত্যিকার অর্থে সফল গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা হয়। তারপর থেকে আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৯১ সাল থেকে নিরপক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরপর তিনটি সুষ্ঠু ও অবাধ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। তাই আজ আমি জোরালো কণ্ঠে বলতে পারি, বাংলাদেশে গণতন্ত্র শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এর বেশিরভাগই ছিল মহিলা। তারা প্রতীকের অনুকূলে নয়, ইস্যুর অনুকূলে ভোট দিয়েছে।'

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'উন্নয়নের ছয়টি মূল ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নীরব বিপ্লব ঘটে চলেছে। দেশে গত দু-দশক ধরে ৫ শতাংশেরও বেশি হারে জিডিপি বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকে অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। সামাজিক ও স্বাস্থ্যখাতেও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য নিজস্ব এবং নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর তুলনায় শ্রেয়।'

তিনি বলেন, কিছু বাস্তবসম্মত ও সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণের ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমরা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র চূড়ান্ত করেছি। জাতীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা প্রণীত হয়েছে। দেশভিত্তিক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো এবং অন্যান্য জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রূপরেখা এতে বিধৃত রয়েছে। কর্মসংস্থানভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করাই আমাদের এই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ এবং নিরাপদ পানিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার মতো দুটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। আর আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং পাঁচ বছরের কম শিশু মৃত্যুহার কমানোর মতো লক্ষ্য দুটিরও অর্জনের পথে।

ব্যক্তিমর্যাদা এবং মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক সব কনভেনশনের পক্ষে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ থেকে অসহিষ্ণুতা দূর করার মাধ্যমে আমরা ক্রমান্বয়ে সুশাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, জাতিসংঘের আওতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা কিংবা উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের মতো বিষয়গুলোতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশকে অবদান রাখতে হবে। সক্রিয় অংশগ্রহণ, নব নব চিন্তাধারার বিকাশ, উন্নয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে। আমি গর্বিত যে, বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তিরক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। আমরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনা সরবরাহকারী দেশগুলোর একটি। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ২৪টি শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের মোট ৩৯ হাজারেও বেশি শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করেছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত অবস্থায় এ যাবত বাংলাদেশের ৬৭ জন সাহসী সেনা মৃত্যুবরণ করেছেন। শান্তিরক্ষার ব্যাপারে তবু আমরা অটল রয়েছি। জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিশন স্থাপনের প্রস্তাবকেও আমরা সমর্থন জানাই।

জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব অনুযায়ী একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে আমাদের সমর্থন আমি এখানে পুনর্ব্যক্ত করছি। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত রোডম্যাপটি অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করা উচিত বলে আমরা মনে করি। ইরাকি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করে, বিশেষ করে ইরাকের অখণ্ডতা, দীর্ঘমেয়াদি শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার মাধ্যমে পরিস্থিতির সুরাহা করতে হবে।

সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণু অস্ত্র এবং প্রচলিত সব আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এনপিটি (NPT) সিটিবিটি (CTBT) চুক্তি দুটিও আমরা স্বাক্ষর করেছি। আমরা মারণাস্ত্রের নিরাপত্তার চেয়ে মানব নিরাপত্তাও উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

২০০৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা

প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আওতায় শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে আসছে। তাই বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই আজ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবময় উপস্থিতি। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মিশনে সর্বাধিক সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। আমরা ভবিষ্যতেও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সামরিক সদস্য প্রেরণের এই ধারা অব্যাহত রাখবো। (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬০তম অধিবেশন, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬)।

শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে (২০০২ সালের ১০ মে) যোগদান করে বেগম জিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি সেই বিশেষ অধিবেশনে বলেন, 'কয়েকটি বিষয়ে আমাদের অত্যাবশ্যকীয় এবং নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশ প্রয়োজন যদি আমরা বিগমত দশকে যা অর্জিত হয়েছে তা সুসংহত করতে চাই। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ এর মধ্যে সবচেয়ে জরুরি। এর সূচনা হতে হবে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশের শিশু এবং তাদের পিতা-মাতা থেকে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বের সব জাতির এ লক্ষ্যে অর্থাৎ শিশু-কিশোরদের জন্যে নিরাপদ পরিবেশ রচনার জন্যে উদ্যোগ হতে হবে। আমাদের শিশুদের, বিশেষ করে মেয়েশিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে কোনোক্রমেই উদাসীন থাকতে পারি না। শিশুদের অগ্রগতির জন্যে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাছাড়া গোটা বিশ্বকে সচেতন থাকতে হবে যেন কোনো শিশু-কিশোর কোনোভাবে অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত না হয়।

[A few things need our urgent and sustained attention if we are to build on our gaing in the last decade. Efforts to eradicate poverty are vital. This must begin with children and parents in the vulnerable groups. Increased investment on health and nutrition of mothers and children are equally important. The nations of the world must also work together to create a non-violent and secure environment for our children. We. Cannot ignore the need for education of our

children especially that of the girl child. Access to continued quality education is vital for our children's welfare. The world, in addition, should remain vigilant against new forms of abuse and exploiting of children and violence against them.]। যে লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা অর্জনের জন্যে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। শিশুরা হবে আমাদের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পদেরও সমাহার ঘটাতে হবে। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, বিশেষ করে A World Fit for Children কর্মসূচি প্রণয়নের জন্যে। আমি নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে আমাদের শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ হয়ে উঠবে উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন, ১০ মে ২০০২)।

আট. দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং বেগম জিয়া

সুনির্দিষ্ট অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা জন্মলাভ করে অনেক দেরিতে। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে। ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর রচিত হয় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Associatiom for Regional Co-operation-SAARC)। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের সরকার ও ও রাষ্ট্রপ্রধান শীর্ষ সম্মেলন, ঢাকায়। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বপ্রান্তের বাংলাদেশ থেকেই দক্ষিণ এশিয়ার জমাটবাঁধা অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভীতি এবং অনাস্থার অন্ধকারে এসেছিল আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতার আলোকোজ্জ্বল প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের মূল রচয়িতা, দার্শনিক এবং সংগঠক ছিলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে জিয়াউর রহমান ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান এবং শ্রীলঙ্কা সফর করে, বিভিন্ন সময়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজধানীতে দূত পাঠিয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন।

এই প্রেক্ষাপটে এ সময় বিভিন্ন দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, জাতীয় পর্যায়ে রণকৌশল সম্পর্কিত অনুশীলন কেন্দ্রে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয় অসংখ্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা-পর্যালোচনা। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় প্রকাশিত হয় বিশ্লেষণধর্মী প্রচুর লেখাজোখা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং রিভিউ পেপার। এ প্রসঙ্গে কলম্বোর মার্গা ইনস্টিটিউটের (The Marga Institute) নাম সবার আগে উল্লেখযোগ্য। এসব আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ধারায় খোলামেলা, উদার এবং উষ্ণ আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা শুধু কাঙ্ক্ষিত নয়, অপরিহার্যও।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে এক দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। তিনি কোনো পূর্ব পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হননি। পঁচাত্তরের শেষপ্রান্তে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান-প্রতি অভ্যুত্থানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গের প্রবল টানেই তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রে আবির্ভূত হন। দায়িত্ব লাভের পরেই তিনি অনুভব করেন, প্রতিবেশি ভারতের বিরাটত্ব এবং তার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি, বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বৈরী ভাব, বিশেষ করে বাংলাদেশের একাকিত্ব, শুধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যেই নয়, তার সার্বভৌম অবস্থানের প্রতিও এক বিরাট হুমকিস্বরূপ। আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার ওপর ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ এবং একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার, দেশের বিভিন্ন সীমান্তে ভারতের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষা ইঙ্গিতে কিছু বিপথগামী বাংলাদেশীর সরকারবিরোধী অপতৎপরতা দেশের স্থিতিশীল অবস্থার ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়। এসব সমস্যার সমাধানের জন্যে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রমণ্ডলীর সভায়, এমনকি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩১তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বিশ্বজনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। শেষপর্যায়ে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত

কমনওয়েথ কনফারেন্সে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জিয়ার ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বাংলাদেশের বিপথগামীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। এসব ঘটনার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ধারণ দৃঢ় হয়ে ওঠে দুটি বিষয়ে : এক. প্রতিবেশি ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক অথবা নির্ভরশীলতার সম্পর্কের পরিবর্তে বাংলাদেশের সার্বিক স্বার্থে অপরিহার্য হলো গঠনমূলক সহযোগিতার সম্পর্ক। দুই. আন্তঃরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যা যতোই প্রকট হোক না কেন, রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানদের সম্মিলিত হওয়ার জন্যে যদি কোনো ফোরাম বিদ্যমান থাকে তাহলে সমস্যা সমাধানের পথ একটা বেরিয়ে আসবেই।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপকে মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার নির্দেশে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ শামসুল হক ১৯৮০ সালের ২৪ নভেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কিত একটি ওয়ার্কিং পেপার (Working Paper) পাঠান। আজকের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার জয়যাত্রার সূচনা তখন থেকে। ওই পেপারে লেখা হয়েছিল : 'দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো রয়েছে অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে। কোনোটির অগ্রগতি একটু বেশি, কোনোটির একটু কম। কিন্তু সব দেশই সাধারণ মূল্যবোধের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। আর এর মূল নিহিত রয়েছে সাধারণ, সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের গভীরে। নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা অনুধাবনে অথবা বিশ্ব রাজনীতির অনুভব তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু এ পার্থক্য এমন যার সেতুবন্ধন সম্ভব।' এই সূচনা বক্তব্যটি সার্কের পূর্বকথা।

[In South Asia we have countries at different levels of development: some are relatively less developed than others…the countries of South Asia Also Share common values that are rooted in the common social, ethnic, cultural and historical traditions, perceptions about certain specific events or political situation of the world may differ, but such

differences do not seem to create a gulf between then that cannot be bridged.']

১৯৮৩ সালের ১-২ আগস্টে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এ অঞ্চলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অধিবেশনে সমন্বিত কর্মসূচি (an Integrated Program of Action) গৃহীত হয় এবং এভাবে দু-দশক আগে পিটার লিওন (Peter Lyon) যেভাবে বলেছিলেন যে দক্ষিণ এশিয়া একটি অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক সহযোগিতার শুভ আশীর্বাদ লাভ করেনি, সেখানে ১৯৮৩ সাল থেকে তার সূচনা হয়। ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অধিবেশন উদ্বোধন করে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, 'আমরা যে সাতটি রাষ্ট্র এখানে একত্রিত হয়েছি তা খুব কাছের প্রতিবেশি। একই মৌসুমি বায়ু আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। একই অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা ও চ্যালেঞ্জে আমরা অংশীদার। আমাদের এই অঞ্চল অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার পাঠীস্থান। সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোয় আমরা সবাই উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছিলাম। বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের প্রক্রিয়া, পারস্পরিক চাহিদা ও সম্ভাবনা আমাদের সবাইকে সচেতন করেছে। আজ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে জয় করা। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হিসেবে সবাই আমরা চাই শান্তিপূর্ণ পথে সবার অগ্রগতি ও বিশ্বময় প্রবৃদ্ধি।'

[We Seven, who are gathered here, are close geographical neighbors. The same monsoon governs our lives. We share experiences, aspirations, challenges. Our region is the cradle of one of the earliest human civilizations, In More recent centuries we have suffered from the political and economic consequences of colonialism. The vary process of liberating our people from external rule has renewed awareness of one another's needs and potentialities. To-day our major goal is to overcome economic backwardness. As member of the Non-Aligned Movement we seek peace with development among ourselves and the world as a whole (Ahmed, 1985: 18).]

পরবর্তী পর্যায়ের পদক্ষেপ হলো, ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রমণ্ডলীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অধিবেশন উপলক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অনানুষ্ঠানিক এক বৈঠক। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশের প্রস্তাবকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া দক্ষিণ এশিয়ার স্বার্থে অনুকূল। ওই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮১ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবদের অধিবেশন, কলম্বোয়। উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা। এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি জিয়ার চিন্তা-ভাবনাই ছিল অগ্রযাত্রার মূল পাথের তার উৎসাহ এবং সৃজনশীল প্রত্যয়ই ছিল মৌল মূলধন।

কলম্বো অধিবেশনে পররাষ্ট্র সচিবগণ কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া ও পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—এই পাঁচটি ক্ষেত্র আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্যে চিহ্নি হয়। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে কাঠমান্ডু অধিবেশনে যোগাযোগ ও পরিবহন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পোস্টাল সেবা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন—এই চারটি ক্ষেত্রও চিহ্নিত হয়। ১৯৮২ সালের আগস্ট এবং ১৯৮৩ সালের মার্চে ইসলামাবাদ ও ঢাকায় পররাষ্ট্র সচিবদের অধিবেশন বসে। এসব অধিবেশনে সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কেও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা অধিবেশনে ঘোষণা দেয়া হয় যে, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা (The South Asian Regional Co-operation-SARC) সূচিত হবে ১৯৮৩ সালের শেষদিকে, দিল্লি থেকে।

ভারত প্রথম থেকেই দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে। ১৯৮০ সালে মোরারজি দেশাইয়ের পরাজয় এবং ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে ইন্দিরা গান্ধীর পুনরাবির্ভাব ঘটলে এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। দেশাই সরকারের আমলে প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডকে ইন্দিরা গান্ধী 'ভারতের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি' হিসেবে চিহ্নিত করেন। পররাষ্ট্রনীতি' হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৯৭৭ সালে সম্পাদিত বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিকে 'ভারতের স্বার্থবিরোধী' বলে চিহ্নিত করেন। গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেপালকে সংশ্লিষ্ট করা এবং

বাংলাদেশ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রস্তাবকে ইন্দিরা গান্ধী বর্ণনা করেন 'ছোট ছোট প্রতিবেশীদের ভারতের বিরুদ্ধে জোটভুক্ত করার ষড়যন্ত্র' হিসেবে (As a sinister move of ganging up of the small neighbors against India.)।

তারপরেও আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। কোনোক্রমে ভারত যেন বিরূপ না হয়ে ওঠে, সেজন্যে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ১৯৮১ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত সাতটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের অধিবেশনের পর প্রকাশিত বিবৃতিতে ভারতের দৃষ্টিকোণ স্মরণে রেখেই এবং ছয়টি রাষ্ট্র যেন ভারতের ওপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করতে না পারে, সে লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়: 'সার্কের সব পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় এবং বিতর্কিত বিষয়গুলোর আলোচনা পরিহার করা হবে।' (Bilateral and contentious issues are to be excluded.) ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়নি প্রধানত ভারতের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনাগ্রহের জন্যে। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে, ঢাকায় এবং সব অনিশ্চয়তার কুয়াশা কাটিয়ে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (The South Asian Association for Regional Co-operation-SAARC) গঠিত হয়। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বাংলাদেশের স্বপ্নশিশু। বাংলাদেশের খ্যাতিমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মস্তিষ্ক-সৃষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যেই—এর সর্বপ্রথম সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়, ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বরে। এবং প্রায় প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে স্মরণ করা হয় শ্রদ্ধাভরে। বেগম খালেদা জিয়ার সর্বাত্মক উদ্যোগ হলো এই মহতী সংস্থাকে কার্যকর করা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসকারী বিশ্ব মানবের প্রায় এক পঞ্চমাংসের জীবনে কিছুটা হলেও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলেপ লাগিয়ে সামগ্রিকভাবে অগ্রগতির আশীর্বাদ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বলিষ্ঠ জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করা। তার নিজের কথায় : 'সার্কে বিশেষ অবস্থান রয়েছে আমার অন্তঃকরণে। এর নির্দেশনার প্রেষণা নিহিত রয়েছে এই সংস্থার প্রধান স্থপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রজ্ঞায়। এই

প্রেষণার মূলে ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করা। যখন তিনি এই সংস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তখন তার দূরদৃষ্টি যেমন ছিল, আজও এই সংস্থাকে ঘিরে রয়েছে তেমনি রূপকল্প।'

[SAARC has a special place in my heart. Its guiding motivation is rooted in the wisdom of Its founder and chief architect, late President Ziaur Rahman. This was to improve the quality of life of the common people of South Asia in an environment of peace…This vision remains as relevant today as it was when president Zia envisaged this forum/]

সার্কের বর্তমান কার্যক্রম হতাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত সার্ক রয়ে গেছে পার্শ্বস্থজন রূপে, পরিবর্তন সাধনকারী অনুঘটকে পরিণত হয়নি। [SAARC has become a by-stander, and not a catalytic agent of change.]

তিনি আরো বলেন :

১. সার্ক এখন পর্যন্ত একটিও প্রজেক্ট প্রণয়ন করেনি, বাস্তবায়ন তো পরের কথা।
২. এখন পর্যন্ত অধিকারের স্বীকৃতিই উচ্চারণ হচ্ছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা তেমন জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে হই?
৩. সার্ক এখন পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
৪. সার্কের অগ্রগতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রভাব বিন্দুমাত্র অনুভূত হচ্ছে না।
৫. সার্ক অন্যান্য সহযোগিতা সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে না।
৬. সার্কের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি অত্যন্ত মন্থর।

সার্কের কর্মকাণ্ডে গতি আনার জন্যে বেগম খালেদা জিয়া কাঠমান্ডু বৈঠকে আট দফার এক এজেন্ডা (eight-point agenda) উত্থাপন করেন। এই আট দফা এজেন্ডা হচ্ছে—

এক. তথ্যপ্রযুক্তি প্রসূত নতুন নতুন ধারণা এবং কলাকৌশলকে কাজে লাগানো
দুই. দক্ষিণ এশিয়ার চিন্তাশালা (Think Tank) কর্তৃক গবেষণালব্ধ তত্ত্বেও ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কোনো প্রকল্পের বাস্তবায়ন।
তিন. দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে কম উন্নত অঞ্চলগুলোতে উন্নয়নমূলক কর্ম

সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্ততপক্ষে ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন কাজ (SADA) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।

চার. মালদ্বীপের পরিবেশমন্ত্রীদের সভায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (Plan of Action) এবং পরিবেশ সংক্রান্ত দুটি সার্কের গবেষণা বাস্তবায়ন।

পাঁচ. আর দেরি না করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে সার্কের কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ছয়. নারী ও শিশুদের স্বার্থ সংক্রান্ত সামাজিক বিষয়কগুলোকে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরি যেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পাশ কাটিয়ে না যেতে পারে।

সাত. উন্নয়নমূলক কর্মউদ্যোগে অ-রাষ্ট্রীয় (Non-State) অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিতকরণ।

আট. আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ সম্পর্কে ঐক্যমত সুদৃঢ়করণ।

৪ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে ৭ জানুয়ারি বেগম জিয়া সাংবাদিকদের বলেন : সদ্যসমাপ্ত সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে আমাকে এক বাক্যে মূল্যায়ন করতে বলা হলে আমি বলবো : 'আপনাদের পরিভাষায় মাঝখানে কিছুদিন সাইড লাইনে থাকলেও সার্ক এখন হেড লাইনে এসেছে। সার্কের প্রতি এখন আগ্রহ সার্কভুক্ত। দেশগুলোর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সারা বিশ্ব কাঠমান্ডু বৈঠকের দিকে তাকিয়ে ছিল। সার্ক পরিণত হয়েছে বিশ্ব আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে।' তিনি আরো বলেন, 'আমি কাঠমান্ডুতে অনুভব করেছি যে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণ নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন চায়। আমাদের অভিন্ন শত্রু দারিদ্র্যের অবসান চায়। অশিক্ষা, অপুষ্টি, অভাব-অনটন থেকে মুক্তি চায়।

উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন অব্যাহতি শান্তি। এই অঞ্চলের জনগণ দেশে দেশে উত্তেজনা, সংঘর্ষ, সংঘাত চায় না। অভিজ্ঞতা থেকে তারা অনুধাবন করেছে যে, ধ্বংস ও ধস ছাড়া যুদ্ধ আর কিছুই দিতে পারে না। তারা তাদের নেতাদের কাছ থেকে চায় দূরদৃষ্টি এবং প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে। কাঠমান্ডুতে আমি লক্ষ করেছি, সার্ক নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দেশের বিরাজমান সমস্যার সমাধান যেমন চান, তেমনি যার যার অবস্থান থেকে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সমস্যারও সমাধান তারা খুঁজছেন।

বেগম খালেদা জিয়ার মতে, সদ্যসমাপ্ত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সর্বাধিক

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের উদ্যোগ কাঠমান্ডু সম্মেলনে সবার মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। কাঠমান্ডু ঘোষণায় আমাদের ৮ দফা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে। এই সম্মেলনে Soouth Asia Poverty Commission পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নেপালকে চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশকে কো-চেয়ারম্যান করে পুনর্গঠিত এই কমিশনে প্রত্যেক সদস্য দেশ থেকে ২ জন করে Country Commissioner থাকবেন। এপ্রিল মাসে ইসলামাবাদে সার্ক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীদের বৈঠকে কমিশনকে প্রাথমিক রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়া আরো বলেন, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকগুলোতে আমরা বিশেষ করে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির পর্যালোচনা, বাণিজ্য বৈষম্য দূরীকরণ, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাওয়ার পর চুক্তি পর্যালোচনার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আমি ওই বৈঠকে অভিন্ন নদীগুলোর পানি ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের বিষয়টিও তুলে ধরেছি। দু-দেশের বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতার বিষয়টিও আলোচনায় আনি। ভারত জানায়, চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকার সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হবে।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন : এই সম্মেলনে আমাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লক্ষ্য করেছি। এগুলো হলো :

এক. কাঠমান্ডু ঘোষণায় আমাদের ৮ দফা কর্মসূচি ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

দুই. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আমাদের দ্বি-পাক্ষিক বিষয়গুলো আমরা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুকূল সাড়া পেয়েছি।

তিন. দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশি দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিরাজমান উত্তেজনা প্রশমনে সংলাপ ও আলোচনার ব্যাপারে আমাদের অনুরোধ বাস্তবে রূপলাভ করেছে।

তাছাড়া, সম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিশু ও নারী পাচার রোধ এবং শিশু কল্যাণ। এ দুটি কনভেনশন সুদূরপ্রসারী

অবদান রাখবে। (SAARC Summit, Nepal, 4-6 January 2002)

সার্ককে আমরা আরো প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তুলি
(Let Us Make SAARC a Vibrant Institution)

সার্কের দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইসলামাবাদে ২০০৪ সালের ৪ জানুয়ারি। বেগম খালেদা জিয়া একাদশ শীর্ষ সম্মেলনে যে সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেন, দ্বাদশ সম্মেলনেও তেমনি ভূমিকা পালন করেন। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এক ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে সম্মেলন অনুষ্ঠান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বেগম জিয়ার সৃষ্টিশীল নেতৃত্বে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইসলামাবাদে। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সার্কের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অবগত রয়েছি। তবে এই সংস্থার শক্তিমত্তা সম্পর্কেও আমরা অবগত রয়েছি। আমরা সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করেছি। সার্কের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তথ্য এবং আদান-প্রদানে শূন্যস্থানের পরিমাণ হ্রাস করেছি। দক্ষিণ এশীয় একাত্মতার মাত্রাকে তীক্ষ্ম করেছি। নব নব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ও সৃজনশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গাঁথুনিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছি। দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কে অগ্রবর্তী গবেষণা সম্পন্ন করেছি এবং বাণিজ্য, সেবা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ সম্পর্কেও দক্ষতা অর্জন করেছি। তার নিজের কথায়, Let me underline here, that key imperative for SAARC is to have a long-range vision. We must concetiate on projects that heve a regional focus and orientation. বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সার্ককে একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এ মুহূর্তের প্রয়োজন হলো অতীতে যা অর্জন করেছি তা স্থিতিশীল করতে হবে এবং যেসব প্রজেক্ট সাধারণের চিন্তা-ভাবনা ধারণ করে তার বাস্তবায়ন করতে হবে। এসবের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ছয়-দফা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য :

এক. তথ্যপ্রযুক্তি যেসব চিন্তাভাবনা এবং কৌশল উন্নয়নের জন্যে সহায়ক তা প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে হবে এবং তথ্য আদান-প্রদান প্রযুক্তির (ICT) আঞ্চলিক কেন্দ্র রচনা করতে হবে যেন গবেষণা ও বিভিন্ন সেক্টরে

প্রশিক্ষণ দেয়া সহজতর হয়।

দুই. আমাদের চিন্তাশালাগুলো (Think Tanks) সমন্বয় সাধন করতে হবে যেন দীর্ঘমেয়াদি এনার্জি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা সম্ভব হয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এনার্জি গ্রিড প্রতিষ্ঠা করে এনার্জির বিকল্প উৎসের সন্ধানে সার্বক্ষণিক উদ্যোগ গ্রহণ সহজ হয়।

তিন. আন্তঃআঞ্চলিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, যার লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বাণিজ্য বৈষম্য হ্রাস এবং সর্বোপরি দক্ষিণ এশিয়াকে বিনিয়োগের কেন্দ্রে রূপান্তরিতকরণ।

চার. স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কিত জোহানেসবার্গের শীর্ষ সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা (Plan of Action of the Johannesburg World Summit of Sustainable Development) অনুযায়ী এবং সার্কের নিজস্ব উদ্যোগে পরিকল্পিত স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পন্নকরণ।

পাঁচ. পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সহিষ্ণুতার এক আবহ রচনা ও তার সার্বিক বিস্তার এবং জনগণের ব্যাপক যোগাযোগের মাধ্যমে একাত্মতা প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক এবং খেলাধুলার মাধ্যমে এক সুখকর পরিবেশ তৈরিকরণ।

ছয়. জঙ্গিবাদ, বিশেষ করে সংগঠিত সন্ত্রাস এবং মাদকাসক্তি প্রতিরোধের জন্যে সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধিকরণ।

মূলত সার্ক গোটা মানবজাতির এক-চতুর্থাংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করছে। তাই আমাদের এই সম্মেলন থেকে তাদের প্রত্যাশাও অনেক উঁচু। তার নিজের কথায় :

Expectations from our meetings are hate and we must not fail our peoples. We must make our meeting result-oriented, so that we move forward. … It is Imperative that we face these challenge together. Let us make SAARC more vibrant institute so that it becomes a strong voice in international economic forums, and meaningfully contributes to achieving peace, progress and prosperity in our region. (SAARC Summit, Islamabad, of January 2004)।

মোড় পরিবর্তনকারী ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলন

A Turning Point in the Life of SAACR

২০০৫ সালের ১২-১৩ নভেম্বর, সার্কের জন্মস্থান ঢাকায় সার্কের যে শীর্ষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় তা কয়েকটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে দীর্ঘদিন। আমার মনে হয়, এসব কারণে এই শীর্ষ সম্মেলনটি সার্কের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বেগম খালেদা জিয়ার অবদানও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে এই সম্মেলনে। দীর্ঘ বিশবছরব্যাপী যে আঞ্চলিক সংস্থাটি এক ধরনের স্থবিরতা ক্লিষ্ট হয়ে কোনো রকমে টিকে থেকেছে তা গতিশীল হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

বিশ্বের যেসব আঞ্চলিক সংস্থা সফল হয়েছে তাদের সাফল্যের শর্তাবলী, এমনকি জন্ম-পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আঞ্চলিক পরিসরে সহযোগিতার সূত্রগুলো দৃঢ় হয়েছে প্রীতির আবহে নয়, বরং ভীতির পরিবেশে। সহযোগিতার মানসিকতা সুদৃঢ় হয়েছে ভয় বা আতঙ্কের এক অনুভবে (Threat Perception)। আর এর উৎস একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক কোনো ভয়ঙ্কর শক্তির সবকিছুকে তছনছ করার প্রচণ্ড ভীতি। এই ভীতির অনুভূতির সঙ্গে যখন যুক্ত হয় এই বিশ্বাস যে, এককভাবে যা সম্ভব নয়, সবাই সম্মিলিত হলে, প্রয়োজন হলে পরস্পরিক কিছু ছাড় দিয়ে, সবার সীমিত সামর্থ্যকে সংযুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ হলে তা সহজেই অর্জন করা সম্ভব। তখনই গঠিত হয় কোনো আঞ্চলিক সংস্থা।

সার্কের জন্মকালে অর্থাৎ ১৯৭৮-৮৫ সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের কাছে ভীতিকর তেমন কিছুই না। ছিল শুধু এই বিশ্বাস যে, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধিকল্পে সহযোগিতার সূত্র দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। এখন কিন্তু সময় পাল্টেছে। ভীষণভাবে পাল্টে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতি। জঙ্গিগোষ্ঠীর অতর্কিত হামলার বিষয়টি, তার সে জঙ্গি গ্রুপ মৌলবাদী মুসলিম হোক আর মাওবাদী হিন্দু হোক বা নকশালপন্থী জনযুদ্ধ গোষ্ঠী হোক, দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ নেতাদের ভাবিয়ে তুলেছে। এসব সন্ত্রাসীদের রয়েছে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। তারা বিস্তৃত একাধিক রাষ্ট্র। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হচ্ছে চতুরতার সঙ্গে।

ফলে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যে কোনো একক রাষ্ট্রের ভূমিকা আর যথেষ্ট নয়। সবাইকে একসঙ্গে মিলে সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এই পরিস্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে তা আরো জোরদার হবে। ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে শীর্ষ নেতারা যেসব বক্তব্য বিবৃতি দিয়েছেন, বিশেষ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

সার্ককে গতিশীল করতে হলে, সার্ক অঞ্চলের প্রায় দেড়শ' কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে হলে তাই যেসব শর্ত পালন করা অপরিহার্য তা উল্লেখ করে বেগম খালেদা জিয়া। তিনি বলেন, সার্ক অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করা, বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে আন্তঃরাষ্ট্র ট্রানজিটকে রাজনীতির আওতাভবিহর্ভূত করে বাণিজ্যমুখী করা এবং দারিদ্র্য মোচন প্রক্রিয়াকে সুজনশীল করার প্রস্তাব দেন। সাফটা (South Asian Free Treade Agreement), যার আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে, পর্যালোচনা হয়েছিল ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত কাঠমান্ডু শীর্ষ সম্মেলনে এবং বাস্তবায়নে সময় নির্ধারিত হয়েছিল ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত ইসলামাবাদ শীর্ষ সম্মেলনে, তা বাস্তবায়নের জন্যে যেসব আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ এসেছে এই শীর্ষ সম্মেলনে। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (South Asian Preferential Treade Agreement-SAPTA) বা সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালে। দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলনে এ বিষয়ে আরো অগ্রগতি সাধিত হয়।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ সম্মেলনে সার্কের অষ্টম সদস্য হিসেবে আফগানিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং চীন ও জাপানের মতো পরম পরাক্রমশালী দুই অর্থনীতিকে সার্কের পর্যবেক্ষক মর্যাদাা দানও উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, সার্ক আর ইনসুলেটেড (Insulated) না থেকে বাইরের আলো-বাতাসের স্পর্শে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশের লাভ হয়েছে অনেক। বাংলাদেশ তিন দিক পরিবেষ্টনকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার

আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের ফলে দুটি দেশের সম্পর্কে যে শীতলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়। ভারতের ওপর দিয়ে নেপাল ও ভুটানে বাণিজ্যের জন্যে ট্রানজিটের যে দাবি বাংলাদেশ করে আসছিল তা সহজলভ্য হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশের জন্যে যে বহুমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা কথা ভারত এতদিন বলে এসেছে, তারও সুরাহা হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। সুরাহা হতে পারে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে মিয়ানমার থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারতে গ্যাস আমদানিরও। সুযোগ-সুবিধা মতো চট্টগ্রাম বন্দরও হয়ে উঠতে পারে উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্যবহারযোগ্য বন্দর। দুই দেশের সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যারও সমাধান হতে পারে, ভারতের সদিচ্ছা থাকরে। দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বৃহৎ অংশই ঘটে থাকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীরে যার অন্যতম উৎস আফগানিস্তান এবং উত্তর-পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশে। এর অন্যতম উৎস নেপাল এবং চীন। তাই দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে আফগানিস্তানকে যেমন অংশীদার হতে হবে, তেমনি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে চীন এবং সার্কের সদস্য হিসেবে এই সম্মেলনে প্রস্তাব করা হয়েছে আফগানিস্তানের নাম। পর্যবেক্ষক হিসেবে চীন ও জাপান সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছে সার্কের।

ভারত-পাকিস্তান ও ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে এক্ষেত্রেও শুভ ফল ফলবে বলে আশা করা যায়। ভারতের যেসব পর্যালোচক ভারতের তিন পাশে 'ব্যর্থ রাষ্ট্রের' অভ্যুত্থান ঘটছে বলে উপহাসে উচ্চ কণ্ঠ গচ্ছিলেন, তাদেরই কেউ কেউ এখন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বলতে শুরু করেছেন, তাহলে উত্তর-পূর্ব ভারতের কী হবে? কী হবে পূর্ব ভারতের? উত্তর-পশ্চিম ভারতেরই বা কী হবে? ২০০৪ সালের সুনামি ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে আঘাত হেনেছিল। নেপাল-ভুটান-বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান কোনোক্রমে অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে অথবা রাষ্ট্র হিসেবে কোনোটি অকার্যকর হয়ে পড়লে, তা কিন্তু গোটা ভারতের জন্যে ২০০৪ সালের সুনামির চেয়েও বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ভারত বিশাল দেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় পরাশক্তিসম। আগামী দশকে ভারত তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে মাথা উঁচু করবে। সার্ক বাংলাদেশের স্বপ্নশিশু বটে। কিন্তু এর নেতৃত্ব চলে গেছে ভারতের হাতে। ভারতই সার্কের কেন্দ্রবিন্দু। জনগণের মনে এ ধারণাও জন্মেছে যে, ছোট

ছোট প্রতিবেশির সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সম্পর্কই ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত তার প্রতিবেশিকে সঙ্গে পেলে ভারতই লাভবান হবে। এরই মধ্যে প্রতিবেশি দেশগুলো ভারতীয় বাজারে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতের মূলধনে প্রতিবেশি দেশগুলোতে শিল্পসমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। অন্যকথায়, শক্তিশালী ভারতের জন্যে প্রয়োজন শক্তিশালী ও স্থিতিশীল প্রতিবেশি। এসব কারণে সার্কের মাধ্যমে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতা বৃদ্ধির পরিকল্পনাকেই ভারতের অনেকে শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে চিহ্নিত করেছেন। ড. মনমোহন সিংহের ভাবনাও তেমনি। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা এই লক্ষ্যেই সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী। উদ্যোগী নেপাল এবং ভুটানও। উদ্যোগী দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপ। পাকিস্তানও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রচনায় আগ্রহী। কিন্তু যেহেতু নেতৃত্ব এখন ভারতের হাতে, তাই সার্কের গতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল ভারতের সৃজনশীল নেতৃত্বের ওপর। নির্ভরশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সার্ক কার্যকর হলে দক্ষিণ এশিয়া যেসব সমস্যায় পীড়িত তার অধিকাংশই দূর হবে। ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ নেতাদের এই চিন্তা-ভাবনার সুসম্পর্ক প্রকাশ ঘটেছে। বেগম খালেদা জিয়া এক্ষেত্রে পালন করেন অবিস্মরণীয় এক ভূমিকা। এই শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং দক্ষিণ এশিয়ায় দক্ষিণ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় (South Asian University) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক উৎকর্ষ কেন্দ্র (A Center of Exellence) সৃষ্টির প্রস্তাব করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর হলে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে দক্ষিণ এশীয় অভিন্নতা তথা সাধারণ পরিচয় সৃষ্টি করতে মস্ত বড় ভূমিকা রাখবে। আমরা বাঙালি, ভারতীয়, মালদিবিয়ান, শ্রীলংকান, নেপালি, ভুটানি, পাকিস্তানি তো বটেই, পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ানরাও। এই পরিচয় লোকপ্রিয় করার জন্যে দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। বেগম খালেদা জিয়াও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। (SAARC Summit, Dhaka, 12-13 November, 2005)

সংক্ষেপে বেগম খালেদা জিয়া পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং জাতি হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সর্বত্র সমুন্নত রাখা। খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বিশেষজ্ঞ ডহার্টি (Jemen E Dougherty) এবং ফলজগ্র্যাফ (Robert L. Pfaltzgraff. Jr.) বলেছেন পররাষ্ট্রনীতি হলো একটি দেশের অভ্যন্তরে বাইরের দেশ সম্পর্কে সুচিন্তিত নীতিমালার সূত্রবদ্ধকরণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ (National Interest) কীভাবে সুরক্ষিত হবে, কোন প্রক্রিয়ায়। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের শত বাতায়ন কীভাবে উন্মুক্ত হবে, কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্ব সংস্থারগুলোর সঙ্গে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে বেগম খালেদা জিয়া এসব বিষয়েই তার সৃজনশীল প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার পররাষ্ট্রনীতিতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুসৃত নীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চিন্তা-ভাবনা এবং অনুধাবনের মৌলিকত্ব পরিস্ফুট হয়েছে।

নয়. বেগম জিয়ার স্বপ্নের বাংলাদেশ এবং স্বপ্নের পৃথিবী

বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি তার স্বপ্নের বাংলাদেশের কথা। তিনি এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন যা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, যুক্তিবাদী, মুক্তমনের অধিকারী, হৃদয়বান নাগরিকের বাংলাদেশ। আকাশছোঁয়া আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ, সৃজনশীলতায় উদ্দীপ্ত, নিজেদের ভাগ্য গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আস্থাশীল নাগরিকের বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে থাকবে না অপুষ্টি, থাকবে না ব্যাধি। সমাজ থাকবে দুর্নীতির কলুষমুক্ত। স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে আকাশের মতো উদার। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পশূন্য সব মত-পথ-বিশ্বাসের অবাধ চারণক্ষেত্র। মিলনের তীর্থক্ষেত্র, শহীদ মিনারের মতো। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কেন্দ্র হয়েও আন্তর্জাতিকতা এবং মানবমুখিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকদের রূপান্তরিত হতে হবে একদিকে যেমন দক্ষ, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদে, অন্যদিকে পরিণত হতে হবে উত্তম ব্যক্তিত্বে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্বে।

বিরাট জনসমষ্টির এই ছোট্ট দেশকো তার গন্তব্যে উপনীত হতে হলে, বিশেষ করে তার উন্নত সাংস্কৃতিক আবহ সংরক্ষণে সক্ষম হতে হলে বৃহত্তর বৈশ্বিক সুদৃশ্য এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক দৃষ্টিনন্দন ছোট্ট বাগানের মতো

হয়েই বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করতে হবে। মানব উপাদান হিসেবে উন্নত বিরাট জনসমষ্টির এই বাংলাদেশকে আমি দেখি শত সম্ভাবনাময়, প্রগতিবাদী, অগ্রগামী, শান্তিপূর্ণ, মানবদরদী, সৃজনশীল এক জনপদ হিসেবে।

বাংলাদেশ এক অর্থে হাজারো রঙ-বর্ণ-দীপ্তি এবং প্রভায় ভাস্বর এক জাতি। এখানে মুসলমানেরা আছেন, আছেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান। আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৫৭টি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মানুষ। ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য রয়েছে। কোনো বিষয়ে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ভাবনা-চিন্তা রয়েছে। তারপরেও বলবো, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অসংখ্য সমস্যার তীর ঘেঁষে, বেগবতী স্রোতস্বিনীতুল্য সমাজ জীবনের হাজারো বাঁক অতিক্রম করে, যেভাবে জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের এক বিরাট সমুদ্রে স্থিতিশীল হয়েছে এবং আমরা যেভাবে উন্নত জাতীয় সংস্কৃতির উঁচাপাড়ে জাহাজ নোঙর করেছি তা আমাদের গর্বের বিষয়। তা আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক। তাতে শুনতে পাই আমাদের জাতীয় মানসের অনুরণন। সংকটকালে আমাদের জন্যে তা এক উজ্জ্বল লাইট হাউসের মতো। এটি আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বরাভয়তুল্য।

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এক্ষেত্রে আমরা সমৃদ্ধ বটে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের অপরিণত অবস্থা প্রায় সর্বক্ষেত্রে দৃশ্যমান। অর্থনীতি ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতার অন্ধকার এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অসুস্থ রাজনীতির এই রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ফলে সামাজিক ক্ষেত্র এখনো বিভক্ত এবং খণ্ডচ্ছিন্ন। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সংহত। পরিণত। আলোকোজ্জ্বল। আত্মবিশ্বাসী। তাই তো অন্যের সঙ্গে হাত মিলাতে পারি আস্থার সঙ্গে। আদান-প্রদান করতে পারি আত্মবিশ্বাস নিয়ে। ভিখারীর হাত গ্রহণ করতে পারে। দান করার ক্ষমতা তার নেই। রাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের হাত অনেকটা শূন্য। হীনম্মন্যতায় ন্যুব্জ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের হাত অনেক লম্বা। অনেক শক্তিশালী। অনেক আত্মবিশ্বাসী। আমরা গ্রহণ করি। আমরা দানও করি।

এসব কারণে আমরা দেশে এবং বিশ্বময় শান্তির প্রয়াসকে অতি মূল্যবান মনে করি। বাংলাদেশ এরই মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের শান্তিপূর্ণ আবাসভূমি বাংলাদেশ। মুসলমানদের কুঁড়েঘর এবং

হিন্দুর ছাপড়া হাজার বছর ধরে সখ্য বজায় রেখে দিনাতিপাত করছে। পদ্ম-যমুনা-মেঘনা বিধৌত এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার আবর্জনা কোনোদিন সঞ্চিত হয়নি। আমার অনুভবে ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক চেতনা। আমাদের সৌভাগ্য, এই মাটির কোনো সুযোগ্য সন্তানকে সাম্প্রদায়িকতার নোংরা আবর্জনা স্পর্শ করেনি। এ জন্যে বেগম জিয়া বলেন, 'আমি বারবার উচ্চারণ করি, বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু নেই। নেই কোনো সংখ্যাগুরু। সবাই নিজ নিজ অধিকারে সমৃদ্ধ বাংলাদেশী। প্রত্যেকের অধিকার আইনের শাসনে সংরক্ষিত। প্রত্যেক নাগরিক মাথা উঁচু করে নিজ নিজ বিশ্বাস এবং মতের চর্চা করতে অভ্যস্ত। আমরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মবিশ্বাস এবং চিন্তা-চেতনা অক্ষয় থাকুক। বাংলাদেশের গণতন্ত্র যেমন লোকপ্রিয় সামাজিক নর্ম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তেমনি লোকপ্রিয় চেতনা।' ২০০০ সালে বাংলাদেশ সফরে এসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ঢাকায় বলেছিলেন : 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে পছন্দ করে এমন এক জাতি হিসেবে যারা তার ইসলামিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত, অনন্য সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, সহিষ্ণুতা ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণেও গর্বিত।'

[The United States admires Bangladesh as a notion proud of its Islamic heritage, proud of its unique culture, proud of its commitment to tolerance and democracy and proud of its participation in the world community. Avng, 2001, 175]

বেগম জিয়া শুধু বাংলাদেশের জনসমষ্টির মধ্যে শান্তিপূর্ণ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কেই সন্তুষ্ট নন। তিনি চান, বিশ্বময় শান্তির আবহ প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই অশান্তি, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের মূল কারণ চিহ্নিত করে তা সমূলে ধ্বংস করাই তার প্রধানতম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে দারিদ্র্যই হলো প্রথম কারণ। দারিদ্র্যের মূলে আঘাত হানতেই তিনি অধিক আগ্রহী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগ্রহী সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মূল উচ্ছেদ করতে। সাম্প্রদায়িকতার জন্ম মূলত জাত-পাত-কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং সংকীর্ণতা। আলোকিত সমাজে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয় না। তাই তিনি সমাজে সর্বস্তরে, বিশেষ করে নারীশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাজে চান আলোকোজ্জ্বল করতে। তাছাড়া দারিদ্র্যের দূর করার জন্যে সমাজব্যাপী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে

প্রত্যেকের জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করতে কৃতসংকল্প। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার যেন অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে সেই শিক্ষা সমাজব্যাপী ছড়িয়ে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা, নিরপেক্ষতাও এক্ষেত্রে মণিকাঞ্চনস্বরূপ। রাষ্ট্রের এসব প্রতিষ্ঠানকে পেশাদারিত্বের আশীর্বাদে পরিণত করে তুলতে পারলে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারলে সমাজে ব্যক্তিগত প্রাধান্য অথবা গোষ্ঠীগত আধিপত্যের অবসান ঘটবে। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর হবে। প্রত্যেক নাগরিক একদিকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে, অন্যদিকে অপরের অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে সম্পর্কেও অবহিত হবেন। সমাজ হয়ে উঠবে সবার জন্যে নিরাপদ এবং সুখকর। বেগম খালেদা জিয়ার এই স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে প্রাণ পাওয়া বাংলাদেশের প্রায় সব নাগরিকেরও স্বপ্ন প্রায় অভিন্ন। বিশ্বের বিভিন্ন অশান্ত স্থানে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ যেমন শান্তিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে প্রাণপণ করে শান্তির দূত হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন, বাংলাদেশও তেমনি একদিন বিশ্বময় শান্তির মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

এশিয়ান শতক এবং বাংলাদেশ

একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া বিশ্বাস করেন, একুশ শতক প্রকৃতপক্ষেই এশিয়ান শতক। বিশ্বব্যাংক বহু আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এশিয়া মহাদেশেরই সাতটি রাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে মাথা উঁচু করবে। শক্তিধর জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, এমনকি মালয়েশিয়া যে গতিতে অগ্রসরমান তাতে মনে হয় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, কৌশলগত দিক দিয়েও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এই শতকে বিভিন্ন সময়ে থাকবে নাম ভূমিকায়। তার সূচনাও লক্ষণীয়। ২০১২ সালের নভেম্বরে আসিয়ানে (ASEAN) ১০ সদস্য এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সমন্বয়ে এশিয়ান ট্রেড ব্লক (Asian Treade Black) গঠন করা হয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সফর করেন। এমনকি কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত পূর্ব এশীয় সম্মেলনে চীনসহ আসিয়ানের কিছু সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কার্যত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র তার নৌশক্তির ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। ২০১৬ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এই চুক্তির সময়কাল শেষ হলে ডিয়েগো গার্সিয়াকে ভিত্তি করে পেন্টাগন ভারত মহাসাগরে তার অবস্থান শক্তিশালী করবে। শুধু তা-ই নয়, এই লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার কোনো দ্বীপও রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে।

বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত সৃজনশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশকে দেখা হয় দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের সেতু হিসেবে। এদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে। তাছাড়া বাংলাদেশ রয়েছে চীন, নেপাল ও ভুটান রয়েছে ৫০-৫৫ মাইলের মধ্যে, বিশেষ করে চীন ও ভারতের মতো উঠতি পরাশক্তির মধ্যখানে। অন্যদিকে প্রস্তাবিত সিল্ক রুট বাস্তবায়িত হলে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, ভারত, মিয়ানমার ও চীনের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এমনিতেই বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সক্রিয় সদস্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement—NAM) অর্গানাইজেশন ফর ইসলামি কনফারেন্স (Organization For Islamic Conference—OIC) Commonwealth of Nations, জাতিসংঘ (United Nations—UN)। তাছাড়া বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (South Asian Association for Regional Cooperetaion—SAARC) সদস্য, বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (BIMSTEC) সদস্য, ডি-৮ভুক্ত দেশ, এশিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARC) এবং ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (IORARC) সদস্য। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো বিশ্বমানের হয়নি বটে; কিন্তু

বাংলাদেশের পণ্য রফতানি হয় প্রায় ১২০টি দেশে এবং বাংলাদেশের শ্রমিক কর্মরত রয়েছে প্রায় বিশ্বের ১৭০টি দেশে।

আগামীদিনের রাজনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করলে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা হলো সমুদ্রগামী সব আমদানি-রফতানির মাধ্যমে হয়ে উঠবে ভারত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী এবং ইন্দোনেশিয়ার মালাকা সংকীর্ণ জলপ্রবাহ পর্যন্ত এলাকা পায় সব সময় গতিশীল থাকবে। এই পথের নিরাপত্তার জন্য ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্র সব সময় সচেতন থাকবে। বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের প্রবেশপথ হওয়ায় বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সর্বজনস্বীকৃত। তবে বাংলাদেশের রাজনীতিরা সঠিক পথ অনুসরণে ভুল করলে কিংবা ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে ব্যর্থ হলে বিশ্বের এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানের গুরুত্ব আশীর্বাদ না হয়ে বরং হয়ে উঠতে পারে মস্তবড় এক বোঝা। ভারত ও চীনের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্যে ভুল সিদ্ধান্ত। দুটি দেশকেই বেছে নেয়ার পদ্ধতি বের করতে হবে বাংলাদেশকে, কেননা দুটিই হলো উঠতি পরাশক্তি। ভারত, মিয়ানমার ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ অনেক সুবিধা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ তার বাণিজ্য-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, নেপাল, ভুটানের ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে এটি সত্য যে, রাজনীতি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। চৌকষ জাতীয় নেতৃত্ব ভালো বোঝেন কখন, কোন পরিস্থিতিতে জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে কোন দিকে মোড় নেয়া প্রয়োজন। একুশ শতকের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পররাষ্ট্রনীতির গতি নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি।

বেগম খালেদা জিয়া অবশ্য বিশ্বাস করেন, জাতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করে, দেশময় আইনের শাসন প্রবর্তন করে এবং সর্বক্ষেত্রে ধম-বর্ণ-সম্প্রদায় এবং নৃতাত্ত্বিক সত্তা নির্বিশেষে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে যেমন শান্তিপূর্ণ জীবনের আবহ নিশ্চিত করা সম্ভব, যেমন সুশাসনের মাধ্যমে স্বশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সব সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে

এবং সমসার্বভৌমত্ব এবং অন্য রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ না করে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ আবহ তৈরি করা সম্ভব। বেগম জিয়া বিশ্বাস করেন, কোনো প্রতিবেশির এক ইঞ্চি ভূমি রক্ষা করাও আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। আমাদের যা রয়েছে তাকেই পূর্ণরূপে বিকশিত করে আমরা সবার জন্যে সম্মানজনক অবস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি। জাতীয় পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ আবহ তৈরি হয়ে গেলে আঞ্চলিক পর্যায়ে তা বিস্তৃত করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব রচনায় মনোযোগী হওয়া সম্ভব।

Ahmed, Emajuddin, Ed. Foreign Policy of Bangladesh; A Small States' Imperative. Dhaka: The University Press Ltd. 1984

Ahmed, Emajuddin, SARC: Seeds of Harmony, Dhaka: The University Press Ltd. 1985.

Huq, Mahammad Shamsul, Bangladesh in International Politics, Dhaka, UPL, 1993

Jemes N Rosenau, ed. International Politics and Foreign Policy: A Reader, New York : The Free press, 1969

F S Norghedege, The nature of Foreign Policy in F.S. Northedge, ed. The Foreign Policy of the power, London: Faber and Faber, 1968

Nilonthi Samartanayake, there is more to South Asia than India and Pakistan is South Asia January 2012

আহমেদ, এমাজউদ্দীন, আঞ্চলিক সহযোগিতা : জাতীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯

James E. Dougherty and Robert & Pfalzgraff Jr. Contending Theories of International Relations, New York, 1971, Lippincott.

আহমেদ, এমাজউদ্দীন, ২০০১, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ঢাকা, জ্ঞান বিতরণী, ১৭৫

[এমাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত 'খালেদা জিয়া– তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

ভিশন-২০৩০
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের জনগণ স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্ন ছিল ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা ও সাম্যের। জনগণের এই স্বপ্ন আজও সফল হয়নি। স্বৈরশাসন ও দুঃশাসনের যাঁতাকলে স্বপ্নগুলো চুরমার হয়ে গেছে। আজ আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য নতুন করে শপথ নিতে হবে। বাংলাদেশের সকল ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ, ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীসহ সকল জাতি-গোষ্ঠী ও মানুষের চিন্তা চেতনা ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারসম্পন্ন, জনকল্যাণমূলক, সহিষ্ণু, মানবিক, শান্তিকামী ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP)'র লক্ষ্য।

বিএনপি বিশ্বাস করে জনগণই হবে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। যেসব বাধা জনগণের মেধা, শ্রম, উদ্যোগ এবং উৎসাহকে দমিয়ে দেয় সেগুলোকে দূর করে বিএনপি বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, আধুনিক ও আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন করেছে।

গণতন্ত্র

১. বিএনপি মনে করে বাংলাদেশের জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল আজ সেই রাষ্ট্রের মালিকানা তাদের হাতে নেই। তাই দেশের জনগণের হাতেই দেশের মালিকানা ফিরিয়ে দিতে চায় বিএনপি।

২. বিএনপি এমন এক উদার গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে বিশ্বাস করে যেখানে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত হবে। যত সংখ্যালঘিষ্ঠই হউক না কেন, কোন মত

ও বিশ্বাসকে অমর্যাদা না করার নীতিতে বিএনপি দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

৩. আমরা 'ওয়ান ডে ডেমোক্রেসিতে' বিশ্বাসী নই। জনগণের ক্ষমতাকে কেবল নির্বাচনের দিন বা ভোট দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না বিএনপি। নিত্যাদিনের জন-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবো আমরা।

৪. সুধি সমাজ, গণমাধ্যম, জনমত জরিপ, জনগণের দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়া, বিশেষজ্ঞ মতামত ও সব ধরনের অভিজ্ঞানের নির্যাস গ্রহণ করে দেশ পরিচালনা করা বিএনপির লক্ষ্য। কর্তৃত্ববাদী শাসন এবং 'গণতন্ত্রের চাইতে উন্নয়ন শ্রেয়'এ অজুহাতে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠানোর অপচেষ্টা জনগণকে সাথে নিয়ে বিএনপি রুখে দেবে।

৫. বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোয় প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা এককভাবে প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত। এ রূপ ব্যবস্থা সংসদীয় সরকার পদ্ধতির স্বীকৃতি রীতির পরিপন্থী। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেশবাসী গভীরভাবে উপলব্ধি করছে যে, প্রধানমন্ত্রী একক নির্বাহী ক্ষমতা সংসদীয় সরকারের আবরণে একটি স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসনের জন্ম দিয়েছে। এ রূপ অবস্থার অবসানকল্পে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা হবে।

৬. সংবিধানের এক-কেন্দ্রিক চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থা সংস্কারের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে।

৭. আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর সংবিধানের পঞ্চদশ ও যষ্ঠদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোট ব্যবস্থা বাতিল, নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল, সংসদ বহাল রেখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান প্রবর্তন, সংবিধানের কিছু নির্ধারিত বিষয় সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ, কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য করার বিধান প্রবর্তন, উচ্চ আদালতের বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্তকরণের বিধানসহ কয়েকটি অগণতান্ত্রিক বিধান প্রণয়ন করেছে। বিএনপি এসব বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক বিধানাবলী পর্যালোচনা ও পুনঃপরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কার করবে।

৮. বিএনপি সংবিধানে 'গণ-ভোট' ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃস্থাপন করবে।

৯. জাতীয় সংসদকে সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে। জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে বিরোধী দলসমূহের সাথে আলোচনা করা হবে। পাবলিক একাউন্টস কমিটি এবং পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটির সভাপতিত্ব বিরোধীদলের সদস্যদের উপর অর্পণ করা হবে। সরকারি এবং বিরোধীদলের সদস্যদের সমন্বয়ে সংসদের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ব্যাক বেঞ্চারদের মধ্যে বিভিন্ন caucus গঠনের জন্য উৎসাহ দান করা হবে।

১০. শরতের আকাশে সাতটি রঙের বিচিত্র প্রভা নিয়ে রঙধনু যেভাবে মনোরম সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটায়, আমরা চাই সকল মত ও পথকে নিয়ে এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি লালন ও পরিপুষ্ট করতে যে সংস্কৃতি বাংলাদেশকে একটি Rain-Bow Nation এর (রঙধনু-জাতিতে) পরিণত করবে।

১১. বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার' কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে জাতিতে পৌঁছাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এ জন্য সুনীতি, সুশাসন এবং সু-সরকারের (৩G) সমন্বয় ঘটাবে বিএনপি।

জাতি গঠন

১২. বিএনপি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের অবসান ঘটাতে চায়।

১৩. জাতির সকল অংশ তথা ধর্মীয়, আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীগত পরিচয় এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে একটি সুসংহত জাতি গঠন করাই বিএনপির লক্ষ্য।

১৪. সকল জনগণের বৃহত্তর সম্মিলনের মাধ্যমে 'ইনক্লুসিভ সোসাইটি' গড়ে তোলার মহৎ লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়াই বিএনপির নীতি। এ জন্য প্রয়োজন হবে সকল প্রকার বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধির (discrimination) বেড়াজালকে অতিক্রম করে দেশ গঠনে সবার কর্মপ্রয়াসকে কাজে লাগানো।

১৫. বিএনপি চায় বিভক্ত হয়ে পড়া এ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। তাই সকল মতাদর্শের ঐকতান রচনার জন্য অব্যাহত আলোচনা, মতবিনিময় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার সেতুবন্ধ রচনাই হবে বিএনপির প্রয়াস।

১৬. প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে ভবিষ্যৎমুখী এক নতুন ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিএনপি। এজন্য নতুন এক সামাজিক চুক্তিতে (Social Contract) পৌঁছাতে বিএনপি সচেষ্ট হবে।

সুশাসন

১৭. গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সুশাসনের জন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (যেমন নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, এটর্নি জেনারেল ইত্যাদি) এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, আইন কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ইত্যাদি) স্বার্থপরতা ও দলীয়তার কালিমামুক্ত করে এগুলোর দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আইনি ও প্রক্রিয়াগত পদক্ষেপ নেবে বিএনপি।

১৮. বিগত দিনগুলোতে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। এ কারণেই ব্যক্তির বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং দলীয় আনুগত্যকে বিবেচনায় না নিয়ে কেবলমাত্র সততা, দক্ষতা, মেধা, যোগ্যতা, দেশ-প্রেম ও বিচার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রশাসন-যন্ত্র, পুলিশ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে।

১৯. প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, সততা, মেধার উৎকর্ষ এবং সৃজনশীলতা বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। দলীয় ও সকল প্রকার আইনবহির্ভূত হস্তপেক্ষের অবসান ঘটিয়ে বিচার বিভাগ, প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর আইনানুগভাবে কর্তব্য পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

২০. বিএনপি দুর্নীতির সাথে কোনো আপস করবে না। সমাজের সর্বস্তরে দুষ্টক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতির রাশ টেনে ধরার জন্য পদ্ধতিগত

ও আইনের সংস্কারের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

২১. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধান অনুযায়ী 'ন্যায়পাল'—(Ombudsman) এর পদ সৃষ্টি করা হবে।

২২. বাংলাদেশ আজ নিরাপত্তাহীন ঝুঁকিপূর্ণ এক জনপদে পরিণত হয়েছে। মাতৃগর্ভের শিশুও নিষ্ঠুর অপরাধের থাবা থেকে মুক্ত নয়। বিচারালয় আজ বিরোধী মতের নেতাকর্মীদের দমনে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বিচার প্রার্থীরা আদালতের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশে আশঙ্কাজনকভাবে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে জনপ্রশাসন, বিচার, পুলিশ ও কারাগার এ চার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানকে স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

২৩. বিএনপি মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী; আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। অবশ্যই আইনের শাসনের নামে কোনো প্রকার কালা-কানুনের শাসন গ্রহণযোগ্য হবে না। বিএনপি সকল প্রকার কালা-কানুন বাতিল করবে। সকল প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন এবং অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান ঘটাকে বিএনপি।

২৪. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা হবে।

২৫. মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হবে।

২৬. এটা সর্বসম্মতিভাবে স্বীকৃত যে বর্তমানে বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা হৈন। সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নআদালতের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং কর্ম নির্ধারণের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে মেধা। দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নীতিবোধ, দেশপ্রেম, বিচার-বোধ ও সুনামের কঠোর মানদণ্ডে যাচাই করে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা, মেধা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্য সংবিধানের আলোকে বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত আইন প্রণয়ন

করে বাছাই কমিটি ও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত/সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্য ও সম্পদ বিবরণী জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

২৭. বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে জনগণের জন্য ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। অধস্তন আদালতকে নির্বাহী বিভাগের আওতামুক্ত করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে পৃথক সচিবালয় স্থাপন করা হবে।

২৮. দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও বিচারপ্রার্থীদের কাছে দায়বদ্ধ করার জন্য সমস্ত বিচার প্রশাসন ও বিচার প্রক্রিয়াকে পরিপূর্ণভাবে ইলেকট্রনিক/অন-লাইন ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করা হবে। আদালতের উন্মুক্ত তথ্য বিচার প্রার্থীরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতি/অন-লাইন ও মোবাইল ফোন টেকনোলজির মাধ্যমে জানতে পারবে।

২৯. প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে মামলার জট কমিয়ে আনা হবে।

৩০. নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, দ্রুত ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্য সমাজে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকা সম্মানীয়, নীতিবান ও আদর্শ মানুষদের দিয়ে পাইলট ভিত্তিতে 'জুরি' ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হবে।

৩১. আদালতে মামলার বোঝা কমানো এবং স্থানীয় বিচার ও বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রাম-আদালতকে উন্মুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে কার্যকর আদালত হিসেবে রূপান্তর করা হবে। বর্তমানে বিদ্যমান ইউনিয়ন কাউন্সিল ব্যবস্থায় গ্রাম-আদালতের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী অনানুষ্ঠানিক সালিশি আদালত পুনঃপ্রবর্তন করা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

৩২. বর্তমান বিচারব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করা হবে।

৩৩. বর্তমানে থানায় গেলে পুলিশ মামলা নেয় না। এটা ডিনায়েল অব জাস্টিস। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দেশব্যাপী থানাগুলোতে অন-লাইন পদ্ধতি ও মোবাইল টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের সুযোগ সৃষ্টি করে ফৌজদারী বিচারপ্রার্থীদের আইনের নিরাপত্তা পাওয়ার সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩৪. পুলিশ বাহিনীকে সেবক হিসেবে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। জনগণের সেবক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশের মোটিভেশন, ট্রেইনিং ও নৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সিআরপিসি, পিআরবি, পুলিশ আইন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী পুলিশের উপর বিচার বিভাগীয় তদারকি (Judisical Oversight) নিশ্চিত করে জবাবদিহি ও কল্যাণমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তোলা হবে।

৩৫. দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে সঙ্গতি রেখে পুলিশ বাহিনীকে দক্ষতাসম্পন্ন যুগোপযোগী সুসজ্জিত বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। জনগণের জান-মাল ও সম্ভ্রব রক্ষা এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষভাবে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত একটি চৌকষ, দক্ষ, নিরপেক্ষ, জনকল্যাণমুখী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে।

৩৬. পুলিশের কনস্টবল/ট্রাফিক পুলিশ এবং এএসআই পর্যন্ত নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে একটানা ৮ ঘণ্টার বেশি দায়িত্ব দেয়া হবে না/দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হবে না। ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য ঝুঁকিভাতা এবং ৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কর্মঘণ্টা হারে যুক্তিসংগত ওভার-টাইম ভাতা প্রদান করা হবে। এএসআই থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত পুলিশের আবাসন সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩৭. দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৩৮. দেশবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ ও জনপ্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে নিয়োগ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও দলীয় আনুগত্যের সংকীর্ণতা মুক্ত থেকে মেধা, সততা, দক্ষতা, যোগ্যতা, দেশপ্রেম, নীতিবোধ ও বিচারক্ষমতার উপর নির্ভর করে জনপ্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

৩৯. একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, গতিশীল, মেধাবী, জবাবদিহিতামূলক যুগোপযোগী

ও গণমুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলা হবে। মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ সংস্কার করা হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, নারী ও প্রান্তিক নৃ-গোষ্ঠী কোটা ব্যতিরেকে কোটা পদ্ধতি বাতিল করা হবে। গতিশীল বিশ্বায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানের আলোকে একটি যথোপযুক্ত সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন করা হবে। সকল পর্যায়ে ই-গভার্ন্যান্স চালু করা হবে। জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিরক্ষা

৪০. একটি আইন সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও সমর-সম্ভারে সুসজ্জিত, সুসংগঠিত, যুগোপযোগী এবং সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে। গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ভিত্তি ও বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

পররাষ্ট্রনীতি

৭১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে বিএনপি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিএনপি অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং অন্য কোনো রাষ্ট্রের জন্য নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি করবে না। একইভাবে বিএনপি দৃঢ় অঙ্গীকার করছে যে অন্য কোনো রাষ্ট্রও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করলে শক্ত প্রতিরোধে (Resistance) গড়ে তোলা হবে। বিএনপি বিশ্বাস করে, আমাদের সীমান্তের বাইরে বাংলাদেশের বন্ধু রয়েছে, কোনো প্রভু নেই। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হবে। বিএনপি মুসলিম উম্মাহ ও প্রতিবেশি দেশসমূহের সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

নৈতিককতার শক্তি পুনরুদ্ধার

৪২. বাংলাদেশে নৈতিক মূল্যবোধের ভয়াবহ অবক্ষয় ঘটেছে। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিএনপি গণমাধ্যম, একাডেমিক-কারিকুলাম, সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা এবং ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

৪৩. ছাত্র ও মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের মানবিক, সহিষ্ণু, ন্যায়ানুগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির সঠিক ও যথাযথ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৪৪. পরিষেবা, দুর্নীতি দায়িত্বে অবহেলা, জনগণের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব, সামাজিক বৈষম্য, জবাবদিহিতার অভাব, জনসচেতনতার অভাব এবং সর্বোপরি পরিষেবা উৎপাদন ও বিতরণে জনগণের অংশগ্রহণ না থাকার ফলে পরিষেবাগুলোর সুফল জনগণ পায় না। বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জলের সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাষণ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পুলিশী সেবা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য সেবা, প্রশাসনিক সেবাসহ সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ও সংবিধানিক সংস্থাসমূহের সেবা রমান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে।

৪৫. বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পুলিশ সেবা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশাসনিক সেবাসহ সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সেবা প্রাপ্তিতে প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

৪৬. দারিদ্র্য নিরসন না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সুবিধাবঞ্চিত হত-দরিদ্র (Ultra poor) মানুষদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আরো সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে একটি দরিদ্র দুঃস্থ মানুষও নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে না থাকে। মূল্যস্ফীতির নিরিখে এর মাথাপিছু পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। অতিস্বল্প আয়ের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৪৭. সকল দুঃস্থ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা এবং অসহায় বয়স্কদের ভাতার পরিমাণ মূল্যস্ফীতির নিরিখে বৃদ্ধি করা হবে। বিশেষ ভাতা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত করা হবে।

৪৮. বেসরকারি খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য বার্ধক্যের দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি 'পেনশন ফান্ড' গঠন করা হবে। প্রবীণদের শেষ বয়সের দিনগুলোতে দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য প্রতিমাসে পেনশন দেয়া হবে। বেসরকারি খাতে নিয়োজিত প্রত্যেকের আয়ের নির্দিষ্ট অংশ এই ফান্ডে জমার ভিত্তিতে পেনশন ফান্ডটি গড়ে তোলা হবে এবং এর জন্য ন্যায্য হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। সক্রিয় কর্মজীবনের শুরু থেকে কর্মজীবনের অবসান পর্যন্ত এই ফান্ডে অর্থ জমা রাখা যাবে। প্রয়োজনীয় বিধি মোতাবেক এই ফান্ডধারীকে ফান্ড থেকে ঋণ দেয়া হবে। এ ফান্ডের অর্থ উন্নয়ন অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ করা যাবে।

৪৯. বাংলাদেশের দারিদ্র্য-পীড়িত, দুঃস্থ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং অবকাঠামোগত সুযোগ বঞ্চিত এলাকাগুলোতে তৃণমূলে জরিপের ভিত্তিতে চিহ্নিত (mapping) করা হবে। এসব এলাকার হত-দরিদ্র মানুষগুলোকে স্বল্পমেয়াদী বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়া হবে। মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে এসব এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে যাতে তাদেরকে ভবিষ্যতে খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে না হয়। বার্ধক্য, প্রতিবন্ধীত্ব এবং রোজগারকারী না থাকার ফলে যারা দুঃস্থ অবস্থায় আছেন তাদেরকে অব্যাহতভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এসব এলাকাগুলোকে স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে সভা ডেকে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপকারভোগীদের স্বচ্ছতার সাথে চিহ্নিত করা হবে।

৫০. বাস-ট্রেনে-লঞ্চে বিনা ভাড়ায় প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের বিধান করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

৫১. দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। বিএনপি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে।

৫২. বিএনপি সকল মুক্তিযোদ্ধাদের 'রাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিক' হিসেবে ঘোষণা করবে।

৫৩. মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়নের নামে দুর্নীতির অবসান ঘটানো হবে। বিএনপি একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করবে।

৫৪. মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধি করা হবে এবং এই ভাতা ব্যবস্থাপনাকে দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত করা হবে।

৫৫. আগ্রহী প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হবে এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় যোগ্য ও দক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫৬. দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা, ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বধ্যভূমি ও গণকবর চিহ্নিত করে সেসব স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।

৫৭. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যে মূল্যায়ন করা হয়, দুঃখের বিষয় মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। বিএনপি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিবিড় জরীপের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের একটি সঠিক তালিকা প্রণয়ন করবে এবং তাদের যথাযথ মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করবে। মূল্যস্ফীতির নিরিখে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাস-ট্রেনে-লঞ্চে যাতায়াতে নির্ধারিত ভাড়ার অর্ধেক মূল্যের যাতায়াতের বিধান করা হবে।

সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ

৫৮. বর্তমান সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ জাতির জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি,

আইনের শাসনের অভাব ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এদেশের সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ বিস্তারে অন্যতম কারণ। এই সমস্যার সমাধান না করতে পারলে জাতীয় উন্নয়নে সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। জাতি এক ভয়াবহ অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়বে। এই জন্য বিএনপি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫৯. সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ সকল রাষ্ট্রের জন্যই হুমকির কারণ। এ কারণে বিএনপি বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের মধ্যে কোনোরকম সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে বরদাশত করবে না এবং সন্ত্রাসবাদীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে না। জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যমত গঠন এবং জনগণের অংশগ্রহণে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করা হবে।

৬০. জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকৌশল হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকার সমস্যার সমাধান, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি ও সম্প্রীতির মূল্যবোধ শক্তিশালী করা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে উৎসাহিত করা হবে।

অর্থনীতি

৬১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতার জন্য এ পরিস্থিতি একেবারেই কাম্য নয়। বিএনপি দরিদ্রবান্ধব ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী। প্রবৃদ্ধির হারকে বৃদ্ধি করে এবং এর সুফলের সুষম বণ্টরে মাধ্যমে বিএনপি ধনী দরিদ্রের বৈষম্যের সমস্যাকে মোকাবেলা করবে।

৬২. আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। এ সময়ের মধ্যে মাথাপিছু আয় ৫০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হবে। এর জন্য বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ডাবল ডিজিটে উন্নীত করার সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬৩. বাংলাদেশে ভূমির দুষ্প্রাপ্যতার ফলে ম্যানুফেক্চারিং ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে ভূমির অর্থনৈতিক

ব্যবহার নিশ্চিত করে শিল্প স্থাপন করার এবং অন্যদিকে ভূমির সীমিত ব্যবহারভিত্তিক আধুনিক সেবা খাত যেমন—ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, আইডি ইন্ডাস্ট্রি, বিনোদন শিল্প, পর্যটন শিল্প, পরিবহন, টেলিকমিউনিকেশন, দূর-শিক্ষণ, এয়ার-হাব (Air-Hub), ওয়াটার হাব (Water-Hub), সিকিউরিটি সার্ভিস, বন্দর ও জাহাজ, টেলি-মেডিসিন ইত্যাদি সমৃদ্ধ করার উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হবে।

৬৪. দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন, ক্ষমতা ও তদারকি নিবিড় ও শক্তিশালী করা হবে। শেয়ার মার্কেট এবং ব্যাংক লুটের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে যাতে কেউ এমন দুর্নীতি-অনাচার করতে না পারে সেই লক্ষ্যে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে পরিচালনা বোর্ডে যোগ্য, সৎ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হবে। ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং কার্যক্রম বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ পরিচালনা ও তদারকির ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)

৬৫. যে কোনো আধুনিক ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development—R&D) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের ব্যক্তি-খাতে নতুন ধরনের পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত না হলে ব্যক্তিখাত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। যেসব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে R&D'র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়ের অন্তত ৩% R&D কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ রাখতে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা প্রদান করা হবে। R&D'র জন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রকৌশলী, শিল্পবিজ্ঞানী এবং গবেষক। R&D খাতে বিনিয়োগ অনিশ্চিত ফলবাহী ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। বিএনপি R&D খাতে ব্যক্তি-খাত সহায়ক বাজেট বরাদ্দ রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলোর সেতুবন্ধন রচনায়

উৎসাহ প্রদান করা হবে। R&D খাতের উন্নয়নের জন্য মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে। R&D'র মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন পণ্য-সামগ্রী ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে patent করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিএনপি বিশ্বাস করে একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির জগতে প্রবেশ করেছে। বৈশ্বিক এই উন্নয়নের ধারার সঙ্গে তালা মিলিয়ে চলার জন্য বিএনপি R&D খাতের বিকাশ ও পরিবর্ধন করবে।

জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Devidend)

৬৬. জনমিতিকিভাবে বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকালে (Transition) রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৩.২৫ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশে সিংহভাগ জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম বয়সের মধ্যে পড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর বিশাল তাৎপর্য রয়েছে। যে দেশে শিশু কিশোর ও বৃদ্ধ বয়সী মানুষের সংখ্যা কম সে দেশে বেশিরভাগ কর্মক্ষম মানুষকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। তবে এই ধরনের সুযোগ একটি জাতির জীবনে একবারই ঘটে। একদিকে শিশুরা কর্মক্ষম মানুষের আয় রোজগারের উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে বৃদ্ধরাও কর্মক্ষম মানুষের উপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে কর্মক্ষম মানুষের অনুপাত ভারি হলে দ্রুত এবং উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। কর্মক্ষম মানুষ বলতে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। জনমিতিক ক্রান্তি থেকে উদ্ভূত সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই দক্ষিণ কোরিয়া আজ একটি উন্নত রাষ্ট্র। নাইজেরিয়া এই সুযোগটি ব্যবহার করতে পারেনি বলেই সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত।

৬৭. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২৫ সালে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা হবে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। যা ২০২০ সালে ছিল ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ। ২০১০ সালে কর্মক্ষম মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল খুবই কম শিক্ষিত এবং মাত্র ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায় বাংলাদেশে প্রতি বছর ২২ লক্ষ মানুষ কর্ম-বাজারে প্রবেশ করে, এর

মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ মানুষ কাজ পায় না। বাকিরা থাকে বেকার।

৬৮. জনমিতিক ক্রান্তিকলের লভ্যাংশ স্বার্থকভাবে অর্জন করতে হলে সব কর্মক্ষম মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এটি একটি বিশাল যজ্ঞ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় সঞ্চয়ের হার ন্যূনতম ৪০ শতাংশে বৃদ্ধি করতে হবে। এই সঞ্চয়ের পুরোটাই বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগের একটি অংশ ব্যবহৃত হবে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য। অন্য অংশ ব্যয় করতে হবে কৃষি শিল্প ও সেবাখাতকে দ্রুত উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য।

৬৯. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবর্তন আনতে হবে জনগোষ্ঠীর চিন্তার জগতে। দেশের তরুণদেরকে নন-টেকনিক্যাল Doploma Disease থেকে মুক্ত করতে হবে। অভিরুচি, সামর্থ্য, মেধা ও বাজার-চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে হবে। পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা, শত শত ধরনের ট্রেড ও পেশার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মানবসম্পদকে বিকশিত করতে পারে। ট্রেড ও পেশা যেমন—প্লাম্বার, ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেকট্রনিক মেকানিক, হেলথ টেকনিশিয়ান, নার্স, মাস্টার-টেইলার্স, ফ্যাশন-ডিজাইনার, কৃষি-যন্ত্রপাতি মেরামতকারী, লেদ-অপারেটর, গার্মেন্টস যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারিজ, মেকানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং, হসপিটালিটি-সার্ভিস, হাউজ কিপিং, আসবাব-পত্র ডিজাইনার, চারু ও কারু শিল্প, ম্যাসনরি, রড-বাইন্ডার, ভূমি সার্ভেয়ার, রেল ওয়ার্কশপ টেকনিশিয়ান, যানবাহন-মেকানিক, মোটর ড্রাইভিং, প্রিন্টিং টেকনোলজিস্ট, মোবাইল টেলিফোন ও কম্পিউটার টেকনিশিয়ান ইত্যাদি। এর জন্য প্রয়োজন হবে গুণগতভাবে উন্নত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। এর সমান্তরালে সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের মানও উন্নত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও অধ্যাপকদের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে হবে। সকল ধরনের ট্রেড ও পেশার শিক্ষার মান উন্নতকরণ এবং সনদায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে দক্ষতার সঙ্গে

কাজে লাগাতে হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলোর ইন্সট্রাক্টর ও ট্রেইনারদের বিশেষ আর্থিক সুবিধা ও অন্যবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের Corporate Social Responsibility কর্মসূচির সিংহভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যয় করতে উৎসাহিত করতে হবে। জনমিতিক ক্রান্তিকালের মূল কৌশল হবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আকর্ষণীয় কর্ম-বাজার সৃষ্টি। প্রয়োজন শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিজনেস ফার্মের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা। অগ্রসর জ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন করা ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। মানবসম্পদ উন্নয়নে অনুক্ত জ্ঞান (Tacit Knowledge), প্রায়োগিক জ্ঞান, তাত্ত্বিক জ্ঞান, প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক গবেষণাসহ সব ধরনের জ্ঞান চর্চার মধ্যে ভারসাম্য অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত, মর্যাদাশীল জাতি হতে হলে জনমিতিক ক্রান্তিকালের লভ্যাংশ অর্জনের বিকল্প কিছু নেই। জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনই হবে বিএনপির অন্যতম অগ্রাধিকার।

৭০. ২০১৬ সনের জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index-HDI) অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। এতে বুঝা যায় বাংলাদেশ এখনো মানব উন্নয়নে বিশেষ করে এর জনমিতিকি লভ্যাংশের সুযোগ গ্রহণে অর্থবহ কার্যক্রম নিতে পারেনি। বিএনপি ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ মানব উন্নয়ন (High Human Development) স্কেলে উন্নীত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শিক্ষা ও মানব সম্পদ

৭১. বাংলাদেশের মত একটি ঘনবসতিপূর্ণ ও সম্পদ-দরিদ্র দেশের শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসার ও মানব-সম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। শিক্ষাকে কর্মমুখী ও ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করার হবে। বিএনপি

শিক্ষার প্রতিটি স্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করবে এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় অনগ্রসর কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শিক্ষা ধনিক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নয়। বিএনপি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করবে। বিএনপি শিক্ষার সুযোগকে অনগ্রসর এলাকার জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে।

৭২. এক দশকের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা হবে।

৭৩. শিক্ষাখাতে ডিজিপির ৫% অর্থ ব্যয় করা হবে।

৭৪. উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা হবে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে সমৃদ্ধ। গুরুত্ব দেওয়া হবে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উপর। গড়ে তোলা হবে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৫. শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় টিভিতে একটি পৃথক শিক্ষা চ্যানেল চালু করা হবে।

৭৬. বিশ্বের মেধা জগত ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের একটি নতুন মাত্রা যোগের জন্য বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিসহ অন্যান্য বিদেশি ভাষা (কোরিয়ান, চীন, জাপান, জার্মান, আরবি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ইত্যাদি) শেখার জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ভাষার চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য সরকারি উদ্যোগে আরো বিদেশি ভাষা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হবে এবং বেসরকারি খাতকে ভাষা ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে উৎসাহ ও প্রণোদনা দিয়ে নিবিড় রেগুলেটরি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে।

৭৭. বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের সুবিধার্থে সেধাবীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে।

৭৮. মেয়েদের এবং ছেলেদের জন্য স্নাতক ও সমপর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

৭৯. বিএনপির শিক্ষানীতি হবে জীবনমুখী, ডিগ্রিমুখী নয়। আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক, ব্যবসায়-প্রশাসক, কারিগরি ও অন্যান্য ধরনের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মানবসম্পদের ঘাটতির ফলে বিপুল সংখ্যক

বিদেশি আমাদের বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এরা বাংলাদেশ থেকে নিজ নিজ দেশে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রেরণ করায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য আমাদের দেশেই প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। এই লক্ষ্যে বিএনপি কার্যকর প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে দেশের শ্রমশক্তিকে দ্রুত প্রশিক্ষিত করে তুলে স্বদেশেই তাদের কর্মসংস্থান করবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা হরণ বন্ধ করে অর্থনীতিকে আরো সবল করবে। অদক্ষ শ্রমিকদের দেশি ও বিদেশি চাহিদার নিরিখে ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ভাষাশিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থানমুখী দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বিএনপি যাবতীয় প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮০. সর্বপর্যায়ে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জেন্ডার ও অর্থনৈতিক বাধাসমূহ দূর করা হবে।

৮১. দৈহিক, মানসিক এবং আবেগগতভাবে প্রতিবন্ধীদের যথোপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা উপকরণসহ পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৮২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-সংসদের নির্বাচন নিশ্চিত করে ছাত্রদের মধ্য হতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বিকাশের পথ সুগম করা হবে।

৮৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়মিত বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করা হবে।

৮৪. মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে। তাদের কারিকুলামে পেশাভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই সংস্কারের আওতায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আইটি এবং ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, যাতে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা উৎপাদনশীল কাজ, চাকরি, অন্যান্য পেশা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ে। উল্লেখ্য যে বিএনপি সর্বশেষ রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকাকালীন কওমী

মাদ্রাসার ‘দাওরায়ে হাদিস’ সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান ঘোষণা করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

৮৫. বর্তমান সরকার ICT সেক্টরে উন্নয়নের বাগাড়ম্বর করলেও বাস্তব চিত্র সুখকর নয়। International Telecommunication Union (ITU) এর এক তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে ICT সেক্টরে ১৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৫ তম যা মালদ্বীপ, নেপাল ও ভুটানেরও নিচে। বিএনপি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলায় সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তথ্য ও প্রযুক্ত বিষয়ে মানবসম্পদের উৎকর্ষ সাধন করা হবে।

৮৬. অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেবাখাত-নির্ভর উন্নয়ন কৌশরের সঙ্গে সংগতি রেখে ২০২০ সালের মধ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে রূপান্তর করা হবে। আউটসোর্সিং এবং সফটওয়্যার খাতকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে এবং তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বিদেশ হতে অর্জিত অর্থ দেশে আনয়নের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অযৌক্তিক বাধা দূর করা হবে। ফ্রিল্যান্সার ও আউটসোর্সিং এর সাথে জড়িত সকলকে সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বল্প চার্জে Global Payment Gateway সুবিধা দেয়া হবে।

৮৭. কনটেন্টস ক্রিয়েশন এবং পাবলিকেশন বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৮৮. Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN), Internet Service Provider (ISP) এবং International Internet Gateway (IIG) মার্কেট উন্মুক্ত করে দেয়া হবে; এর ফলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে, দক্ষতা বাড়বে এবং ইন্টারনেট ব্যয় হ্রাস পাবে।

৮৯. VOIP উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। এর ফলে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ সহজ, সাশ্রয়ী ও সুলভ হবে। এতে করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা

বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানীমুখী শিল্পখাত, দেশীয় বাজারমুখী শিল্পখাত, ই-কমার্স, কম্পিউটিং আউটসোর্সিং উন্নয়নসহ বিভিন্ন আইসিটি কর্মকাণ্ডে বৃহৎ উল্লম্ফন ঘটবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, দক্ষতা বাড়বে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। VOIP খাতে চলমান দুর্নীতি ও লুণ্ঠন হ্রাস পাবে।

৯০. প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, যোগাযোগ, কৃষি ও গবেষণাসহ যেসকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এজন্য একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

৯১. তথ্য প্রযুক্তিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রেষ্ঠ স্কুল, শ্রেষ্ঠ কলেজ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ ফ্রিল্যান্সারের জন্য জাতীয় ICT অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হবে।

৯২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিদেশি বিনিয়োগ সহজসাধ্য করা হবে। ICT খাতে বিদেশি বিনিয়োগ এবং দেশি বিদেশি যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও নানামুখী প্রণোদনা প্রদান করা হবে। IT Innovation Fund's সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিভাবান যুব সম্প্রদায় ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সফটওয়্যার শিল্প ও আইটি সার্ভিস সেক্টরে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হবে। নবাগত উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি পরামর্শক সংস্থা গড়ে তোলা হবে। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান 'Start-up Dund' বিস্তৃত করে নানাবিধ আর্থিক প্রণোদনা ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হবে। ICT শিল্পের জন্য পুঁজিবাজারের মাধ্যমে (Mutual Fund অথবা Venture Capital গড়ে তোলায় উৎসাহিত করা হবে।

৯৩. বিএনপি ইন্টারনেট অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মোবাইল ডাটার জন্য এবং ব্রডব্যান্ডের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যে সমযোপযোগী সর্বোচ্চ গতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করবে।

৯৪. সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে একাধিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে bandwidth এর Capacity বৃদ্ধি করে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৯৫. মোবাইল কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে সারা দেশে বিশেষ করে মফস্বলে উচ্চ গতির 4G কভারেজ নিশ্চিত করা হবে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যতে 4G বা তার চেয়ে উচ্চ গতির ইন্টারনেট কভারেজ নিশ্চিত করা হবে।

৯৬. সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্পে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেয়া হবে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মূল উপাদানগুলো (যেমন—স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি) সাশ্রয়ী মূল্যে দেশের উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার উপকরণ সামগ্রীর উপর শূন্য শুল্ক সুবিধা বজায় রাখা হবে।

৯৭. নিরবচ্ছিন্ন, স্থিতিশীল ও গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও IT পার্ক (সরকারি ও বেসরকারি) স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক ICT অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। কালিয়াকৈরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাইটেক পার্ক, এডুকেশন পার্ক, কম্পিউটার ভিলেজ, আইটি ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান বিকাশ ও দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক হারে উচ্চ-ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন data-centre গড়ে তোলা হবে।

৯৮. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার সমর্থিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এ পর্যায়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষা চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

৯৯. প্রত্যেক জেলায় একটি করে 'স্মার্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এসব স্কুল অন্যান্য স্কুলের জন্য মডেল প্রযুক্তি প্রদর্শকের (Technology Demonstrator) কাজ করবে।

১০০. কম্পিউটার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে।

১০১. স্থানীয় সরকারের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে আইটি ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃদ্ধি প্রদান করে আইটি খাতকে উৎসাহিত করা হবে। ২০২০ সারের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, হার্ডওয়্যার, ল্যাবরেটরিসহ সব দিক থেকে উন্নততর আইটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি স্কুল কলেজের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি

স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স চালু করা হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পাবলিক-প্লেসগুলোকে Free & Safe Internet Wi-Fi Zone এর আওতায় আনা হবে।

১০২. বিএনপি জনগণের বাক ও চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় এমন সকল বাধা অপসারণ করবে। তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি) বিষয়ক সকল আইনের (যেমন Cyber Security Act. ICT Act. ইত্যাদি) অগণতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ধারাসমূহ সংশোধন করা হবে।

১০৩. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সঠিক ও সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করে ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের উৎপাদক, আমদানিকারক, বিক্রেতা এবং ক্রেতার পৃথক পৃথক দায়িত্ব নিশ্চিত করা হবে। ই-বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হওয়ায় ই-বর্জ্য হুমকির হাত থেকে রক্ষা পেতে দেশ জুড়ে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা ই-বর্জ্যসহ যাবতীয় ই-বর্জ্যের সঠিক কালেকশন সিস্টেম ও ম্যানজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হবে।

১০৪. তথ্য ও প্রযুক্তি খাত হবে বিএনপির বিশেষ অগ্রাধিকার খাত।

ক্রীড়া

১০৫. ২০৩০ সালের মধ্যে খেলাধুলার কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ যাতে একটি গ্রহণযোগ্য স্থান করে নিতে পারে সে লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১০৬. খেলাধুলায় আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য প্রতি জেলায় একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ক্রীড়া একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১০৭. মাল্টি গেমস্ ইভেন্ট (Multi Games Event) যেমন সাউথ এশিয়ান গেমস, এশিয়ান গেমস, কমন ওয়েলথ গেমস, অলিম্পিক গেমস ইত্যাদিতে বাংলাদেশ সম্মানজনক স্থান অর্জনের জন্য দেশে একটি আধুনিক জাতীয় অলিম্পিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১০৮. ক্রীড়া ও খেলাধুলার উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষক, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্রীড়া সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে। ব্যাংক ও

বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রীড়া ও খেলাধুলার মান উন্নয়নকে তাদের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির (CSR) অন্তর্ভুক্ত করতে আরো উৎসাহিত করা হবে।

১০৯. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ভিত্তিতে যাদেরকে প্রতিশ্রুতিবান বিবেচনা করা হবে তাদের একটি জাতীয় তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এ সব প্রতিশ্রুতিবান ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড়দেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের মধ্য থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় সক্ষমদের চিহ্নিত করা হবে এবং জাতীয় ক্রীড়া ও খেলার টিমে এদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হবে। এছাড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে ক্রীড়া ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে 'ট্যালেন্ট হান্ট' স্কিম চালু করা হবে।

১১০. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের সম্মানজনক জাতীয় পুরস্কার দেয়া হবে। প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে (উপজেলা, জেলা, বিভাগ) ক্রীড়া ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় পুরস্কার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

১১১. ক্রীড়াঙ্গন ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে।

সংস্কৃতি

১১২. সংস্কৃতি একটি জাতির মুখচ্ছবি। সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে জাতির মনন ও রুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিবন্ধী জাতি কখনো বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ গড়ে উঠবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেল-বন্ধনে। সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্য হবে দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, জাতির আত্ম-পরিচয় এবং নির্মল বিনোদনের জন্য পরিবেশ তৈরি করা। বহিঃর্বিশ্বের যা কিছু শুভ ও কল্যাণময় সেসব উপাদান জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করা হবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনৈতিক আকাশ-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করা হবে। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ-সংগীত, নৃত্য-কলা, নাটক, সাহিত্য চর্চা, চলচ্চিত্রসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে সমৃদ্ধ করা হবে। জাতীয় ভাবধারার পরিপন্থি অপসংস্কৃতি চর্চাকে নিরুৎসাহিত

করা হবে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার পথে সকল প্রকার বাধা অপসারণ করা হবে। সংস্কৃতির মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তাধারা ও মতাদর্শের যেন সুষ্ঠু প্রতিফলন হয় তার জন্য গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতির অনুসরণ করা হবে।

১১৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন চর্চার পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

১১৪. জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে জাতীয় পদক প্রদানের রীতি আরো সম্প্রসারিত করা হবে।

বিদেশে কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ

১১৫. বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, ঝুঁকিমুক্ত অভিবাসন নিশ্চিতকরণ ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১৬. বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার নিরিখে বিদেশে নিয়োগ প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশি ভাষাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

১১৭. অভিবাসন ব্যয় যুক্তিসঙ্গত ও সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সমস্যাটির জটিলতা পরীক্ষা করে কার্যকর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

১১৮. প্রবাসীরা যাতে তাদের কষ্টার্জিত আয় বৈধ পথে বাংলাদেশে প্রেরণ করতে পারে সে জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক এক্সচেঞ্জ হাউজ/ব্যাংকের সঙ্গে প্রণোদনা সুবিধাসহ রেমিট্যান্স প্রেরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

১১৯. প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানাবিধ সমস্যা বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনের বিষয় দ্বিপাক্ষিক-চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আলোকে সংশ্লিষ্ট সরকারের সাথে অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১২০. বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো যাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ করে প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা হবে। বিশ্বের যে সব দেশে ব্যাপক সংখ্যক

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে, ঐসব দূতাবাসে কনসুলার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। দূতাবাসসমূহে কর্মরত লেবার উইং এর জনবল যুক্তিসংগত হারে বৃদ্ধি করে সেবা সহজলভ্য করা হবে।

১২১. জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের মতামত ও পরামর্শের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধাসহ বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।

১২২. বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের বিমানবন্দরে বিদ্যমান হয়রানি বন্ধ করা হবে। বিদেশ থেকে ফেরত আসা প্রবাসীদের যথাযথ তালিকা প্রস্তুত করে তাদের কল্যাণে নানামুখী প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

১২৩. প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান বিবেচনায় প্রবাসীদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশ পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

মিডিয়া ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

১২৪. বিএনপি বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাকে সব সময় স্বাগত জানায়। সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচকের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে বিএনপি সর্বদা স্বচেষ্ট থাকবে।

১২৫. তথ্য প্রযুক্তি আইনের বিতর্কিত ৫৭ ধারা বাতিল করা হবে।

১২৬. প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইনে মিডিয়ার জন্য মুক্ত চিন্তা ও গণতান্ত্রিক চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি নীতিমালা থাকা দরকার। বিএনপি সুপ্রিম কোর্টের একজন সাবেক বিচারপতির নেতৃত্বে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট নাগরিক, আইটি বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করবে। কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অন-লাইন মিডিয়ার জন্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

১২৭. বিএনপি সৎ সাংবাদিকতার পরিবেশ পুনরুদ্ধার করবে এবং চাঞ্চল্যকর সাগর-রুনি হত্যাসহ সকল সাংবাদিক হত্যার বিচার নিশ্চিত করবে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রুজুকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

স্থানীয় সরকার

১২৮. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। ঢাকার সচিবালয় থেকে দেশ শাসন করা হবে না। দেশ চলবে তৃণমূল্যের জনগণের ইচ্ছায় ও মতামতের ভিত্তিতে। জনগণের স্বার্থেই স্থানীয় সরকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা চিহ্নিত করে সুশাসন সহায়ক পরিবেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উন্নীত করা হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে যাতে এ সংস্থাগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ জনগণের জন্য পরিষেবা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

১২৯. যেখানে সমস্যা সেখানেই সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। ‘স্থানীয় নেতৃত্বেই টেকসই সমাধান সম্ভব’—এ নীতির ভিত্তিতে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে ক্ষমতায়িত করা হবে। ক্ষমতা ও উন্নয়নের ভরকেন্দ্র হবে গ্রামমুখী।

১৩০. জনগণের মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে বিধি অনুযায়ী শক্তিশালী করা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।

১৩১. স্থানীয় সরকারের অনুকূলে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা এবং বৈষম্য নিরসনের জন্য জাতীয় বাজেটের একটি অংশ বরাদ্দ করা হবে। আইন দ্বারা গঠিত একটি স্বাধীন কমিশন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থবণ্টনের ব্যবস্থা করবে।

১৩২. বর্তমানে রাজনৈতিক কারণে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বিচারে সাসপেন্ড/বরখাস্ত/অপসারণ করা হচ্ছে যা অনৈতিক ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থি। আদালত কর্তৃক

দণ্ডপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাহী আদেশবলে সাসপেন্ড/বরখাস্ত/অপসারণ করা হবে না।

কৃষি ও কৃষক

১৩৩. তীব্র জন-ঘনত্ব এবং ক্রম সংকোচনশীল কৃষি জমি বিবেচনায় নিয়ে উদ্ভাবনমূলক কৃষি-কৌশল গ্রহণ করা হবে। সমতল, পাহাড় ও হাওর-বাওর এলাকার জন্য বিশেষ বিশেষ ফসল চাষের উপযোগিতা বিবেচনায় রেখে ক্রপ-জোনিং (crop-zoning) উৎসাহিত করা হবে। কৃষকদের উচ্চফলনশীল এবং উচ্চমূল্যে-ফসল চাষে উৎসাহিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রয়াস টেকসই করার জন্য সঠিক বাজারজাতকরণ নীতি প্রণয়ন করা হবে। সেচের পানির প্রাপ্যতা এবং জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য খাল-খনন ও নদীশাসন কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা হবে।

১৩৪. বিএনবি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাজার প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করার ফলে কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। মূল্য-সমর্থন এবং উপকরণ ভর্তুকির সঠিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৃষক যাতে তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সে ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ডাটা বেইস গড়ে তুলে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাওয়ার যোগ্য কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

১৩৫. উন্নতমানের বীজের দুষ্প্রাপ্যতা বাংলাদেশ কৃষকের একটি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রত্যেক উপজেলায় বীজ-বর্ধন (essd multiplication) ও প্রক্রিয়াকরণ খামার গড়ে তোলা হবে। এ থেকে কৃষি উৎপাদনে ৮% থেকে ১০% বৃদ্ধি পাবে।

১৩৬. ব্যস্ত মৌসুমে পর্যাপ্ত কৃষি শ্রমিকের অভাবে ঐ সময়ে কৃষি মজুরি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কৃষি উৎপাদনে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। কৃষি শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যতা মোকাবেলা করার জন্য লাগসই কৃষি-যন্ত্র উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেয়া হবে। ব্যস্ততাহীন মৌসুমে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কাজে লাগানোর জন্য কৃষিবহির্ভূত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩৭. বাজার প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। উৎপাদন থেকে বাজারজাত পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরকে সমন্বিত করে ঊর্ধ্বমুখী (Vertical) সমবায় পদ্ধতি গড়ে তুলে ফসলের দেখভাল, বাছাইকরণ, মজুতকরণ এবং পরিবহন সুবিধাসহ সরাসরি কৃষকের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সমর্থন প্রদান করা হবে।

১৩৮. আধুনিক কৃষি নিবিড় গবেষণা নির্ভর। নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল বীজ, লবণাক্ততা নিরোধক বীজ, কম-তৃষ্ণার্ত ফসল, ফসল পাকার সময়হ্রাস, পোকামাকড় নিরোধক, ফসল, একই মৌসুমে একাধিক ফসলের চাষ অথবা একই ফসল একাধিক মৌসুমে উৎপাদন এবং উপকরণ-সাশ্রয়ী ফসল প্রভৃতি উদ্ভাবনে আধুনিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী করা হবে। জিএমও (GMO) ফসল সম্পর্কে নিবিড় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরিবেশ বান্ধব ও জাতীয় কল্যাণমুখী নীতি গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রীয় বাজেটের একটি যৌক্তিক অংশ কৃষি গবেষণার জন্য বরাদ্দ করা হবে।

১৩৯. বাংলাদেশে কৃষিতে অতি ক্ষুদ্র আকারের খামার কৃষির বাণিজ্যায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরো প্রকট হবে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনার মাধ্যমে ক্ষুদ্রায়নে খামারের বাণিজ্যায়নের সমস্যা অতিক্রম করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৪০. কৃষি নানা ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ে। এই ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও শস্য বীমা, পশু বীমা, মৎস্য বীমা এবং পোল্ট্রি বীমা চালু করা হবে।

১৪১. গরীব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত কৃষকের কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করা হবে।

১৪২. হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামারের জন্য নিরাপদ 'ফিড' উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (regulatory mechanism) গড়ে তোলা হবে। বার্ড ফ্লু জাতীয় মড়ক থেকে হাঁস মুরগী রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। হাঁস মুরগীর পালক ও বিষ্ঠা পুনচক্রায়নের (recyeling) জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে।

১৪৩. হাঁস-মুরগী, মৎস্য, পশুসম্পদ, কৃষিজাত ফসল এবং বন-সম্পদ উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৪৪. প্রতি উপজেলায় পর্যাপ্ত পশু-রোগ প্রতিষেধক ঔষধের যোগান নিশ্চিত করা এবং পশু-রোগ চিকিৎসক (Veterinary) নিয়োগ দেয়া হবে।

১৪৫. ছাগল, গবাদি পশু এবং মহিষের খামার গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তি খাতকে প্রণোদনা দেয়া হবে।

১৪৬. কৃষি-পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পখাতকে (agro-processing) প্রণোদনা দেয়া হবে।

১৪৭. কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার সাধ্যমত বন্ধ করা হবে। গ্রামাঞ্চলে গুচ্ছ-বসতির (clustered housing) মাধ্যমে কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার রোধ করা হবে।

১৪৮. কৃষি উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হবে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান। সুষম ও নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি (ক্যালরি, আমিষ, ভিটামিন, মিনারেল্স, ফ্যাট প্রভৃতি) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রণোদনার মাধ্যমে গোটা কৃষি খাতকে পুনর্বিন্যাস ও বিকশিত করা হবে। কৃষিতে অনিরাপদ ও ক্ষতিকর সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

১৪৯. হাওর ও হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়নে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই প্রথম ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। হাওর-অর্থনীতি এবং হাওর অঞ্চলের জনগণ, তাদের জীবন-জীবিকা ও পরিবেশ নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। পরিকল্পিতভাবে কম জীবনকাল ফসলের চাষ, ভাসমান শাকসবজি আবাদ (Aquatic Agriculture) নিয়ন্ত্রিতভাবে সেচ ব্যবস্থাপনা, মাছের অভয়াশ্রম গড়ে তোলা, জেলেদের আকাল সময়ে সাবসিডি প্রদান, পুরো হাওরকে পর্যটন উপযোগী করে গড়ে তোলার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেয়া, পরিকল্পিতভাবে হাঁস চাষসহ হাওরের জীব ও প্রানীকুলের (Flora & Fauna) সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কৌশল অবলম্বন এবং শুষ্ক মৌসুম ও ভেজা বর্ষায় হাওর অঞ্চরের অমিত সম্ভাবনাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পরিকল্পিত বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

শ্রমিক কল্যাণ

১৫০. বিএনপি শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি করার গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করবে। বাজারমূল্য ও মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সকল সেক্টরে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য প্রতি দুই বছর অন্তর রিভিউ ব্যবস্থা চালু করা হবে। যৌক্তিক শ্রমিক স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিখাতের দায়িত্ব সম্পর্কে আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করবে। এই আইন ও বিধি হবে জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জ্যপূর্ণ। একই ধরনের ব্যবস্থা থাকবে রাষ্ট্রীয় খাতের জন্য।

১৫১. বিগত কয়েক বছরে ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনায় শত শত শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছে। শত শত শ্রমিক বিকলাঙ্গ হয়েছে। বিএনপি এ ধরনের ট্রাজিক দুর্ঘটনা থেকে শিল্প-খাতকে মুক্ত করতে চায়। এই লক্ষ্যে বিদ্যমান শিল্প-কারখানাগুলোর উপর প্রত্যক্ষ জরিপ চালিয়ে শিল্প-কারখানাগুলোতে বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড, বয়লার বিস্ফোরণ, কারখানা ভবন-ধ্বসসহ দুর্ঘটনার উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে শিল্প-কারখানাগুলোকে দুর্ঘটনামুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। নতুন কোনো শিল্প-কারখানা যাতে দুর্ঘটনা কবলিত না হয় সে লক্ষ্যে কারখানার অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগসহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর কারিগরি মান নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

১৫২. গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ আসাবন ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

নগরায়ণ ও আবাসন

১৫৩. দেশের দ্রুত বর্ধনশীল এবং নৈরাজ্যপূর্ণ নগরায়ণকে সুশৃঙ্খল এবং ডবল ডিজিট প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সমন্বিত করতে একটি জাতীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে এবং সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

জন্য যুগোপযোগী বাজার প্রণোদনা ও রাষ্ট্রীয় নজরদারির (regulatory mechanism) নীতি অনুসরণ করা হবে।

১৫৪. প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, জেলা ও উপজেলা শহরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে মহানগরগুলোতে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ হ্রাস করে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হবে।

১৫৫. কৃষি জমি নষ্ট না করে পরিকল্পিত আবাসন যেমন—গুচ্ছ আবাসন (clustered), বহুতল আবাসন (vertical residence) গড়ে তোলা হবে। শিল্পায়ন ও নগরায়নে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১৫৬. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টসহ নগর জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমন্বিত কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১৫৭. বাসস্থান প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। বিএনপি সীমিত আয়ের মানুষের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক বহুমুখী প্রকল্পের আওতায় সাশ্রয়ী মূল্যে পরিকল্পিত আবাসন সুবিধা প্রদানের প্রয়াস নিবে। অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করে তাতে বস্তিবাসী ও বাস্তু-ভিটাহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসিত করা হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন নিশ্চিত করা হবে।

নিরাপদ খাদ্য ও ওষুধ

১৫৮. ভেজাল প্রতিরোধ, বিশেষ করে খাদ্যে ও ওষুধে ভেজালরোধে আইনি ব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। একটি শক্তিশালী ও কার্যকর খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

স্বাস্থ্যসেবা

১৫৯. 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'—এই হবে বিএনপির স্বাস্থ্য-নীতি। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার নিমিত্তে দ্রুততম সময়ের মধ্যে

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage) চালু করা হবে।

১৬০. পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য বীমা চালু করা হবে।

১৬১. বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে GP (General Practitioners) ব্যবস্থাপর প্রবর্তন করা হবে। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একজন চিকিৎসক নির্দিষ্ট থাকবেন। এতে Universal Health Coverage নিশ্চিত হবে। অপরদিকে ডাক্তারদেরও কর্মসংস্থান হবে। গরীব মানুষের জন্য ৫০ ধরনের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে দেয়া হবে। একটি কার্যকর রেফারেল সিস্টেম গড়ে তোলা হবে।

১৬২. 'নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ শ্রেষ' এই নীতির ভিত্তিতে বিএনপি সংক্রামক, অসংক্রামক ও নতুন উদ্ভূত রোগসমূহের বিস্তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৬৩. ডিজিপির ৫% অর্থ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হবে। স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ করে জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাস্থ্যবান উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠাই বিএনপির লক্ষ্য।

১৬৪. উৎপাদনকারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার যুক্তিসঙ্গত মুনাফা নিশ্চিত করে ওষুধের মূল্য যুক্তিসঙ্গত হারে হ্রাস করা হবে। দেশে ওষুধ, ওষুধের মূল উপকরণ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।

১৬৫. রাজধানী শহরে প্রাপ্ত সকল চিকিৎসা সুবিধা ক্রমান্বয়ে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করে উন্নত চিকিৎসা সুবিধা দেশের মফস্বল পর্যায়েও সহজলভ্য করে তোলা হবে। উপজেলা পর্যায়ে সার্জারি সুবিধা সুলভ করার লক্ষ্যে এনেসথেসিস্ট তৈরি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বেতন প্রণোদনার মাধ্যমে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পোস্টিং দেয়া হবে।

১৬৬. উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে আড়াই লক্ষ নতুন ডাক্তার এবং আনুপাতিক হারে নার্স ও টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তব ও মানসম্মত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

১৬৭. দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে ল্যাব সুবিধাসহ অন্ততঃ দুইজন ডাক্তারের অবস্থান নিশ্চিত করে এ সেন্টারগুলোতে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে। প্রত্যেক ডাক্তারকে কমপেক্ষ দুইবছর আবশ্যিকভাবে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সেবা দিতে হবে। এই ডাক্তারদের মাধ্যমে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকগুলোকে আরো শক্তিশালী করা হবে।

১৬৮. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল রেখে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসকদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৬৯. জাতীয় স্বাস্থ্য সেবায় ট্রাডিশনাল মেডিসিন এর সমন্বয় ও উন্নত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নীতি গ্রহণ করা হবে।

১৭০. বিশিষ্ট চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জাতীয় এক্রেডিটেশন কাউন্সিল (accreditation Council) গঠন করা হবে।

১৭১. সংক্রামন ব্যাধি রোধ, মাতৃস্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, শিশু-মৃত্যুর হার হ্রাস ও শিশুদের অপুষ্টি রোধকল্পে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।

১৭২. সর্বজনীন স্বাস্থ্যসম্মত সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

১৭৩. মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নেয়া হবে। উপকূলীয় এলাকা এবং চরাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা হবে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের কষ্ট লাঘবের জন্য 'HOSPICE-CARE' স্থাপন করা হবে।

১৭৪. জেলা-উপজেলা পর্যায়ে উন্নত হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে বেসরকারি হাসপাতাল নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১৭৫. সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসহ সমাজের সর্বস্তরের বিশিষ্ট নাগরিক সমন্বয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

১৭৬. বিএনপি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যায়ক্রমে শূন্য শতাংশে কমিয়ে

আনার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য বস্তিবাসী, নিম্নবিত্ত ও শিক্ষার আলোক বঞ্চিতসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্প্রসারিত করা হবে।

যুব, নারী ও শিশু

১৭৭. যুব, নারী ও শিশুদের জীবন বিকাশের চাহিদার নিরিখে যথোপযুক্ত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হবে। জাতীয় উন্নয়নে যুব, নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১৭৮. সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে নারীর অবদানকে বিএনপি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিএনপি সকল কর্মকাণ্ডে নারী সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করবে। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সকল বাধা অপসারণ করা হবে।

১৭৯. নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, এডিস নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচাররোধে কঠোর কার্যকর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিশু-শ্রম রোধে কার্যকর বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৮০. শিশু সন্তান রেখে নারীরা যাতে নিশ্চিন্তে কাজে মনোনিবেশ করতে পারে সেই লক্ষ্যে অধিক সংখ্যাক Day Care Centre গড়ে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৮১. নারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ গ্রহণের পথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সমর্থন, স্বল্প-সুদে ব্যাংক ঋণ এবং কর-ছাড় দেয়া হবে।

১৮২. বিএনপি বেকার যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োগের জন্য দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের চাহিদার নিরিখে যুবসমাজকে যথাযথভাবে দক্ষ ও সক্ষম করে তুলবে।

১৮৩. যুব উদ্যোক্তাদের বেশি বেশি করে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সমর্থন, স্বল্প-সুদে ব্যাংক ঋণ এবং কর-ছাড় দেয়া হবে।

১৮৪. এক বছরব্যাপী অথবা কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত, যেটাই আগে হবে, শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন

১৮৫. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবজাতির অস্তিত্ব যেভাবে বিপন্ন হতে চলেছে, তার জন্য বাংলাদেশের মত দেশ দায়ী নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের দায়ভার শিল্পোন্নত বিশ্বকে নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শিল্পায়িত বিশ্বকেই এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামো গড়ে তুলতে বিশ্বজনমত গঠন ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

১৮৬. জলবায়ু পরির্তনের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য টেকসই Mitigation এবং Adaptation কৌশল গ্রহণ করা হবে, যেমন—কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, খাল-বিল-নদী-নালা ও জলাভূমি পুনরুদ্ধার, পরিকল্পিত নগরায়ণ ইত্যাদি। উপকূল এলাকাসহ সারাদেশে নিবিড় বনায়ন ও সুন্দরবনসহ অন্যান্য বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পানি সম্পদ, নীল অর্থনীতি (Blue economy) ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১৮৭. সামাজিক ও পরিবেশগত কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করে সারাদেশে পানি সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নততর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। National Water Grid গড়ে তোলা হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৮৮. শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির সংকট নিরসনে কল্পে শহীদ জিয়ার খাল-খনন কর্মসূচি পুনরায় চালু করে শুকিয়ে যাওয়া বা পলিমাটিতে

ভরাট হয়ে যাওয়া খাল-বিল, নদী-নালা এবং হাজা-মজা পুকুর ও দীঘি পুনঃখনন করা হবে।

১৮৯. জনসচেতনতার অভাবে নদী, খাল, বিল ও জলাধারের পানি বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। কৃষি-কেমিক্যাল, শিল্প বর্জ্য ইত্যাদি জলাধারে ফেলা বন্ধে কঠোর রেগুলেটরি আইনের প্রয়োগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

১৯০. সুপেয় পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ এবং বিশুদ্ধকরণের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯১. আমাদের ভূ-গর্ভস্থ পানি ও ভূ-উপরিস্থ পানির অনুপাত হচ্ছে ৭০.৩০। ভূ-উপরিস্থ পানির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১৯২. দেশের নদী, হাওর-বাওর ও জলাশয়/জলাধারগুলোর পানি সম্পদ সংরক্ষণে সমন্বিত নীতি ও নদী শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। নদীবাহিত পলিমাটি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নদীবাহিত বালির সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

১৯৩. আমাদের নদীর সংখ্যা চার শতাধিক। এর মধ্যে ২৩০টি নদী মৃতপ্রায়। এ সব মৃতপ্রায় নদী খনন করে নৌ-চলাচলের উপযোগী করা হবে এবং শুস্ক মৌসুমে এগুলো জলাধার হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, ধলেশ্বরী, গড়াই, মধুমতি, করতোয়া ইত্যাদি খনন করে পানি সংরক্ষণ জলাধার সৃষ্টি করা হবে।

১৯৪. ব-দ্বীপ ভূমি (delta) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ (condervation), উপকূলীয় সম্প্রসারণ (constal expansion) নিশ্চিত এবং ভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য নদ-নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে বিএনপি প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার প্রয়াস নিবে। উপকূলীয় এলাকায় গড়ে ওঠা নতুন দ্বীপগুলোর সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভূমি পুনরুদ্ধার ও ভূমি-বর্ধনে উপযুক্ত গবেষণা উন্নয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। নদী ভাঙন প্রতিরোধে উপযুক্ত নদী শাসন, গবেষণা-উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রতিরোধী কাঠামো

নির্মাণ করা হবে। উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার, পুনর্বাসন ও শক্তিশালী করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯৫. বাংলাদেশে আমরা পানির স্থান দখর করেছি, পানি তাই আমাদের স্থান দখর করে বন্যা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। দেশকে জলাবদ্ধতা (Water Logging) থেকে মুক্ত করার জন্য কার্যকর কৌশল গ্রহণ করা হবে।

১৯৬. হাওর ও পাহাড়ি এলাকা এবং বন্যা প্রবণ এলাকাগুলোতে বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯৭. ঢাকা বসবাসের জন্য বিশ্বের দ্বিতীয় নিকৃষ্টতম নগরীতে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার জনজীবনের স্বার্থে বুড়িগঙ্গা, বালু ও তুরাগসহ ঢাকার চারপাশের জলাভূমি দুষণমুক্ত করে এগুলোতে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকার পরিবেশ দুষণ হ্রাসের জন্য প্রযুক্তিগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। এতে ভূ-পৃষ্ঠে পরিচ্ছন্ন পানি ও সুলভ নৌ-যোগাযোগ নিশ্চিত হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীসহ দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও পরিবেশসম্মত করা হবে।

১৯৮. আন্তর্জাতিক নদী আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে বহমান আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে বিএনপি আঞ্চলিক ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্যোগও গ্রহণ করা হবে।

১৯৯. সমুদ্রের উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের মজুদ (Blue economy) সম্পর্কে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানসম্পন্ন জরিপ পরিচালনা করা হবে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের (Flora and fauna) টেকসই (sustainable) আহরণ, ব্যবহার ও বাজারজাত করা হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

২০০. কাঙ্ক্ষিত ডবল ডিজিট প্রবৃদ্ধির চাহিদা পূরণের জন্য (২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুতের আনুমানিক চাহিদা ৩৫ হাজার মেগাওয়াট

বিবেচনায় নিয়ে) বিএনপি যথোপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত সকল প্রকার জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

২০১. দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসন এবং দীর্ঘ মেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা বিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। নিম্নতমমূল্য বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা (Least Cost Generation Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। বিভিন্ন ধরনের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ এনার্জি-মিক্স নিশ্চিত করা হবে। জ্বালানির উৎস বহুমুখী করা হবে। সাশ্রয়ী ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এনার্জি-এফিসিয়েন্ট বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। গৃহস্থালি, কলকারখানা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহারকারীদের জন্য এনার্জি-অডিটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জ্বালানি-দক্ষ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যবহারে প্রণোদনা দেয়া হবে।

২০২. অদক্ষ পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ অতি জরুরি ভিত্তিতে আধুনিকায়ন এবং পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নেয়া হবে। দেশীয় গ্যাস এবং ফার্নেস-অয়েল এর উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে। বিদ্যুৎ সংকট স্থায়ীভাবে নিরসন এবং কার্বন নিঃস্বরণ হ্রাস করার লক্ষ্যে ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি আহরণ করে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জিও-থারমাল, সমুদ্র তরঙ্গ, বায়োগ্যাস, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির উৎস হিসেবে ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে মিল রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

২০৩. বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দামের সাথে সঙ্গতি রেখে অভ্যন্তরীণ বাজার জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করা হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি উৎস বহুমুখী করা হবে। উপযুক্ত স্থানে

৫০ লক্ষ টন ক্রুড অয়েল রিফাইন বা পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন রিফাইনকারী নির্মাণ করা হবে।

২০৪. দেশের স্থলভাগ এবং বঙ্গোপসাগরে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র, তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশের জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশকে পারস্য উপ-সাগরীয় দেশ সমূহ, ইরান ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ এবং পাকিস্তান ও ভারতের আন্তঃদেশীয় গ্যাস পাইপ লাইনে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০৫. আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আঞ্চলিক বিতরণ সিস্টেম উন্নয়ন ও আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০৬. অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে সীমাহীন দুর্নীতি করা হয়েছে এবং অনৈতিক দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ এর মূল্য বার বার বৃদ্ধি পেয়ে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। বিএনপি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করবে। Electricity and Energy Repid Supply Increase Act. 2010 পুনঃপরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।

২০৭. জ্বালানি ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত জ্বালানি মূল্যের ভারসাম্যমূলক সমন্বয়ের ভিত্তিতে শিল্প কারখানা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সুলভ ও সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি (বিদ্যুৎ, এলএনজি, এলপিজি ইত্যাদি) সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

২০৮. সমুদ্রের নিঃশেষযোগ্য সম্পদ (depletable resource) যেমন—গ্যাস, তেল ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করা হবে। জরিপের ভিত্তিতে এসব সম্পদ উত্তোলন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণে নির্ভরযোগ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

২০৯. জ্বালানি উৎপাদনে পারমানবিক শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এই আলোকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি পুনঃপরীক্ষা করা হবে।

শিল্প

২১০. শিল্প খাতের বিকাশে বিনিয়োগ বান্ধব নীতি প্রণয়ন করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে। শিল্পায়নের তিনটি মৌলিক উপাদান-প্রণোদনা, (Incentive), অবকাঠামো (Infrastructure) এবং (Institution) সংক্ষেপে 'থ্রি আই' এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী সমন্বিত শিল্প-অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। যৌক্তিক নীতি-কৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বাড়ানো হবে। বিশ্বে যেসব দেশ তাদের শিল্প-কারখানাগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিতে চায় (Relocate) সেগুলো যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২১১. বাংলাদেশে ভূমি স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করে কম ভূমি ব্যবহারকারী শিল্প, বিশেষ করে সেবা-শিল্প গড়ে তোলার কৌশল গ্রহণ করা হবে।

২১২. পোশাক শিল্পে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা ও বিস্তৃত করার পাশাপাশি শিল্প খাতের বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে টেকসই শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করা হবে।

২১৩. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিল্প পার্ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে। সব ধরনের সম্ভাবনাময় শিল্প স্থাপনে বেসরকারি খাতকে সহায়তা দেয়া হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং শ্রমঘন শিল্পকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে।

২১৪. বাংলাদেশ একদিকে যেমন রপ্তানি বাজারের জন্য শিল্প-পণ্য উৎপাদন করবে, অন্যদিকে দেশীয় চাহিদার নিরিখে বিদেশি পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা স্থাপনের ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রণোদিত করা হবে।

২১৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২১৬. দেশে সূক্ষ্ম-মান শিল্প (precision industry) গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২১৭. ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা

হবে। ভেঞ্চার ক্যাপিটেল এর প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা হবে। মাঝারি উদ্যোক্তাদের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করার জন্য একটি 'Start-up Fund' এর আওতা প্রসারিত করে কারিগরি পরামর্শ, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানসহ নানাবিধ প্রণোদনা দেয়া হবে।

যোগাযোগ (সড়ক, রেল ও নৌ-পথ)

২১৮. দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে রেল ও নৌ-পথের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হবে। সড়ক রেল ও নৌপথের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে সারাদেশে সমন্বিত বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

২১৯. চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকায় বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করে একে একটি Regional Bub হিসেবে গড়ে তোলা হবে। গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করে রাজধানী ও প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুপার হাইওয়ে দ্বারা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২২০. চট্টগ্রাম ও মংলা সমদ্র বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ আরো সহজসাধ্য করা হবে।

২২১. একসময় এদেশের চব্বিশ হাজার (২৪০০০) কিলোমিটার নৌ-চলাচলের উপযোগী জনপথ ছিল। কিন্তু এতোদিনে অধিকাংশ নদী ভরাট হয়ে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি নদীপথ এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৬০০ কি.মি.। নদীমাতৃক বাংলাদেশে এ এক ভয়াবহ চিত্র। একটি মহা প্রকল্পের আওতায় নদী খননের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া নির্বাচিত নদীপথগুরো পুনরুদ্ধার এবং এর বহুমুখী ব্যবহার (ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস, মৎস্য চাষ, সার্ফেস-ওয়াটার (surface-water) প্রবাহ বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জিং ইত্যাদি) নিশ্চিত করা হবে।

২২২. কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা, গোমতী, পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীতে আন্ডারগ্রাউন্ড-টানেল নির্মাণ করা হবে।

২২৩. নৌ-পথে যাত্রী পরিবহন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ করার জন্য ব্যক্তিখাতে

নিরাপদ জাহাজের সংখ্যা এবং বুড়িগঙ্গাসহ অন্যান্য স্থানে ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ঢাকা-চাঁদপুর ও ঢাকা-বরিশাল রুটে অধিকতর দ্রুতগ্রামী যাত্রীবাহী নৌ-যান প্রবর্তন করা হবে।

২২৪. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট বন্দর ও ঘাটসমূহের যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে পন্টুন স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নৌ অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২২৫. গত বিএনপি সরকারের সময়ে ঢাকার পানগাঁওয়ে নির্মিত কন্টেইনার টার্মিনালের মত ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের নিকটস্থ এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।

২২৬. উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন দ্বীপসমূহের সাথে মূলভূখণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সুগম করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকূলীয় জাহাজ চালু করা হবে।

২২৭. ঢাকা-লাকসাম কর্ডলাইন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ও ঢাকা-বরিশাল রেল লাইন নির্মাণ এবং ঢাকা বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে দ্রুতগামী ট্রেন চালুর মাধ্যমে সারাদেশকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যেক জেলাকে রেল-নেটওয়ার্কে আওতায় আনা হবে।

২২৮. এশিয়ান হাইওয়ে এবং ঢাকা-কুনমিং রেল ও সড়ক যোগাযোগসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২২৯. ঢাকা চট্টগ্রামসহ মহানগরী সমূহের যানজট নিরসনে ট্রাফিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও দ্রুত গণপরিবহন ব্যবস্থা চালুসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩০. সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নকল্পে দ্বিতীয় যমুনা সেতু, সাটুরিয়া-দৌলতদিয়া প্রান্তে দ্বিতীয় পদ্মাসেতু ও ব্রহ্মপুত্র সেতু নির্মাণ করা হবে। বুড়িগঙ্গা, মেঘনা ও কর্ণফুলী নদীর উপর আরো সেতু নির্মঠু করা হবে। বিভিন্ন ছোট বড় নদীর উপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেতু নির্মাণ করা হবে।

২৩১. ঢাকার সাথে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের দ্রুত যোগাযোগের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণ করা হবে। সারাদেশে বিভিন্ন মহাসড়ক পর্যায়ক্রমে চার লেনে উন্নীত করা হবে। সারাদেশে সড়ক নেটওয়ার্ক তথা জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, উপজেলা সংযোগ সড়ক ও স্থানীয় সড়কসমূহের যথাযথ উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

২৩২. সার্কভুক্ত ও আশিয়ান দেশসমূহের সাথে রেল ও সড়ক যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। গণচীনের 'ওয়ান বেল্ট-ওয়ান রোড' উদ্যোগে সংযুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পর্যটন

২৩৩. 'সকল দেশের রানী' বাংলাদেশ এখনো বিশ্বে একটি পর্যটন-প্রিয় দেশ হয়ে উঠতে পারেনি। পর্যটন শিল্পকে জনপ্রিয়করণ, এর প্রসার ও বিকাশ এবং বাংলাদেশকে পর্যটন-বান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা হালনাগাদ করা হবে। বাংলাদেশের প্রবেশ-পথগুলোকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন, ঝামেলামুক্ত এবং সেবামুখী প্রবেশ-পথ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। বড় বড় শহর নগরগুলোর পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মুখচ্ছবিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সকল প্রকার পদক্ষেপ নেয়া হবে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও ভূমি স্বল্প দেশ হওয়ায় পর্যটন শিল্প বিস্তারে সৃজনশীল কৌশল অনুসরণ করা হবে।

২৩৪. পর্যটন শিল্পের প্রধান মূলধন প্রকৃতি ও সংস্কৃতি সঠিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন বিশেষভাবে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে। পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের গ্রামে মডেল সুযোগ সুবিধা গড়ে তুলে পর্যটকদের জন্য আর্কষণীয় করে তোলা সম্ভব। গ্রামের চিরায়ত সংস্কৃতি যেমন জারিগান, সারিগান, গম্ভিরা, যাত্রা-পালা, লাঠি-খেলাসহ গ্রামীণ খেলাধূলা, গ্রামীণ ঢাক-ঢোলা, চারু ও কারুকলা, গ্রামের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রকৃতি, নদী-নালা, নৌকা-ভ্রমণ, নৌকাবাইচ প্রভৃতি দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। বাংলাদেশের প্রতি

জেলায় ন্যূনতম একটি গ্রামকে বেছে নিয়ে রাত-যাপনের বুবিধাসহ গ্রাম-পর্যটন গড়ে তোলা হবে। গ্রাম-পর্যটনের অনন্য আকর্ষণ হবে গ্রামীণ পিঠা-পুলি এবং ফলদ বৃক্ষ থেকে সদ্য পাড়া ফল-ফলাদি। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

২৩৫. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রত্ন-নিদর্শনসম্পন্ন এলাকাগুলো পর্যটকদের আকর্ষণের স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া কক্সবাজার, কুয়াকাটা, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, সুন্দরবন, সিলেট, গারো পাহাড় এবং কিছু নদী তীরবর্তী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা বিশেষ পর্যটন-স্পট হিসেবে উন্নত করা হবে।

২৩৬. দেশের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে 'এথ্‌নিক ট্যুরিজম' এবং 'ওয়াটার ট্যুরিজম' চালু করা হবে।

২৩৭. পর্যটন শিল্পের সমন্বিত ও পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য পর্যটন-বান্ধব আইন প্রণয়ন করা হবে, বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী আরো সহজিকরণ করা হবে। দেশি বিদেশি পর্যটকদের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ ও আবাস নিশ্চিত করা হবে। বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার্থে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দোভাষী ও পর্যটক-গাইড সেবা নিশ্চিত করা হবে।

২৩৮. দেশী ও বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পকে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম খাত হিসেবে গড়ে তোলা হবে। দেশের পর্যটন স্পটসমূহে আধুনিক পর্যটন সুবিধা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আত্মকর্মসংস্থান এবং স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের পর্যটনখাতে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা এবং কর অবকাশসহ বিবিধ উদ্দীপনামূলক সুবিধা প্রদান করা হবে।

২৩৯. পর্যটকদের জন্য পুরনো ঢাকাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রাচীন দালান কোঠা সংলক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং পানীয় স্বাস্থ্যসম্মত ও দৃষ্টিনন্দনভাবে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশনের উদ্যোগ গ্রহণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

২৪০. পর্যটন শিল্প বিকাশে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারি ও বেসরকারি খাতে পর্যটন পুরস্কার চালু করা হবে।

২৪১. পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উৎসাহিত করার জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ উদ্যোগী ভূমিকা নেবে এবং প্রয়োজনীয় প্রচারণা নিশ্চিত করবে।

সম্পদ সংরক্ষণ

২৪২. বাংলাদেশে যে পুঁজি ও বস্তুগত সম্পদ গড়ে তোলা হয় এবং যে নবায়ননযোগ্য সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে যায়, কদাচিৎ সেগুলো সংরক্ষণ ও পুনর্ভরণ করা হয়। সংরক্ষণহীনতার এ সংস্কৃতি আমাদের অর্থনীতির ক্ষয় সাধন করছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য সম্পদ-প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে। সংরক্ষণহীনতার ফলে সম্পদ থেকে যে ভবিষ্যৎ উপযোগ আসার কথা তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর আয়ু হ্রাস পায়। বিএনবি বনগুলোকে পুনর্জীবিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালাবে। শুকিয়ে যাওয়া নদী-খাল, হাওর ও বিল অঞ্চল, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (ox-bow lake), প্রাকৃতিক নিম্নভূমি-এগুলো জলাধার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও বিএনপি বর্ষাকালের উদ্বৃত্ত পানি শুস্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য খাল খনন ও জলাধার নির্মাণ করবে, পানির পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করবে এবং পানির গুণগত মান রক্ষা করবে। ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করবে।

২৪৩. সমুদ্র সম্পদের (bLUE eCONOMY) উপর একটি বিস্তারিত এবং নিবিড় জরিপ/সমীক্ষা চালানো হবে এবং এগুলোর পরিমিত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। বৈরী শক্তির লুণ্ঠন থেকে সমুদ্র-সম্পদ রক্ষা করা হবে।

২৪৪. বাংলাদেশে নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অনেক স্থান রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এ স্থানগুলো বেআইনি দখলের শিকার হয়েছে। সরকার এ স্থানগুলোকে চিহ্নিত ও উদ্ধার করে পর্যটকদের উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করবে।

২৪৫. যে সব নদী দূষণের শিকার হয়েছে এবং মনুষ্য হস্তক্ষেপ ও লোভের কারণে বেদখল হয়ে গেছে সেগুলোকে পুরাতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। দূষণ ও দখলের শিকার নদীগুলোকে পুনর্জীবিত করতে পারলে জলজ প্রাণী, সেচ এবং নৌ পরিবহন উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখবে। চর এলাকাগুলোকে গবাদি পশুর চারণভূমিতে পরিণত করে পুষ্টিমানসম্পন্ন দুধ ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হবে।

২৪৬. বারবার রাস্তা খোড়াখুড়ি এবং রোড ডিভাইডার ভাঙার ফলে যে জনদুর্ভোগ ও সম্পদের ক্ষতি হয়, সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিএনপি সুদূরপ্রসারী ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

সামাজিক ব্যধির সমস্যা

২৪৭. নেশার মরণ ছোবল থেকে কিশোর ও যুব সমাজকে মুক্ত করার জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করা হবে। মাদক আমদানি, উৎপাদন এবং বাংলাদেশে এসবের বেআইনি প্রবেশ রোধে কঠোর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হবে। হতাশা এবং অন্যান্য মনস্তাত্বিক সমস্যার কারণে মাদকাসক্তরা বিপদগামী হয়। এদের পুনর্বাসনের জন্য মানসিক চিকিৎসা সমর্থন দেয়া হবে। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যার সাইকোলোজিস্ট, মনোবৈকল্য বিশেষজ্ঞ এবং সাইকোথেরাপিস্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোকে মনোবৈকল্য চিকিৎসক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ভূমিকম্প

২৪৮. বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু করার আছে। আর একটি নতুন সম্ভাব্য দুর্যোগ হল ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের মত দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। বিএনপি মনে করে ভূমিকম্প বাংলাদেশের মানুষ, প্রাণিকূল এবং উন্নয়নের জন্য ভয়াবহ

হুমকি। সম্ভাব্য এ দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিদ্যমান সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হবে। ভূমিকম্প-উত্তর পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। কার্যকর উদ্ধার তৎপরতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ও ভারী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে। ভূমিকম্প-উত্তর সময়ের জন্য ত্রান ও পুনর্বাসন সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হবে এবং রোগ নিরাময় ও জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্য-সেবা যথাযথভাবে গড়ে তোলা হবে। ভূমিকম্পজনিত-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি সর্বাত্মক ও পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অনগ্রসর অঞ্চল

২৪৯. পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম ও মর্যাদা সুরক্ষা করা হবে।

২৫০. অনগ্রসর পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল সুবিধা এবং পার্বত্য অঞ্চরের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

২৫১. পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং সুষম উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতি-গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২৫২. চা-বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ ও মানবাধিকার লংঘন বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫৩. বস্তি, চরাঞ্চল, হাওর-বাওর এবং মঙ্গাপীড়িত ও উপকূলীয় অঞ্চলের অনগ্রসর জনমানুষের জীবন-মান উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

২৫৪. দল-মত ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতি গোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মকর্মের

অধিকার এবং জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

২৫৫. প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন। কাউকে কোনো নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করতে দেয়া হবে না। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।

২৫৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনস্টের সকল অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে।

আমরা যে ভিশন উপস্থাপন করলাম তা অর্জন কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। আমরা লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশটাকে উন্নত ও মর্যাদাবান দেশে পরিণত করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা আশা করি, এই ভিশন বাস্তবায়নে আমরা দেশবাসীর সক্রিয় সমর্থনের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহেরও সহযোগিতা পাবো।

দেশের স্বাধীনতা অর্জন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং আমাদের আপোসহীন ও সংগ্রামী ভূমিকা বিবেচনা করে দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক এই ভিশন বাস্তবায়নে আমাদের সক্রিয় সমর্থন জানাবেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

দেশ ও দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রণীত এই ভিশন বাস্তবায়নে পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

[এমাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত 'খালেদা জিয়া– তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

জাতির উদ্দেশ্যে বেগম খালেদা জিয়া সংবাদ-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

স্থান : বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়,
তারিখ : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

প্রিয় সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,
আসসালামু আলাইকুম।
দেশ-জাতির চরম সংকটের সময়ে আজ আপনাদের মাধ্যমে প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই।

ভাষা শহীদের মাসে মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, আমি শুরুতেই তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমরা সকলেই জানি, এ দেশের জনগণ গণতন্ত্রপ্রিয়। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই এই জাতিকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। তাই স্বাধীনতার পর জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করা হলে এ দেশের মানুষ তা মেনে নেয়নি। সে কারণেই বাংলাদেশের জনগণের প্রিয় নেতা শহীদ জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিলেন। জনগণকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেড়ে নেয়া সব অধিকার।

এরপর আবারো স্বৈরশাসন চেপে বসলে এদেশের মানুষ প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠে। আমরা ছাত্র, তরুণ, পেশাজীবীসহ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রের জন্য আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করি। বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা বুকের রক্ত ঢেলে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনে।

জরুরি অবস্থা জারীর নামে দেশে অগণতান্ত্রিক শাসনকেও এদেশের

সাধারণ মানুষ মেনে নেয়নি। ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের কারণেই তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করার খায়েশ পূরণ হয়নি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,
গণতন্ত্রের প্রতি এদেশের জনগণের প্রবল অনুরাগের কারণেই আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রকেই বেছে নিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এদেশের মানুষের। তারা রক্ত ঢেলে দিয়ে গণতন্ত্র এনেছে। বারবার সেই গণতন্ত্র এবং এদেশের মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ তাদের কষ্টার্জিত গণতন্ত্র এবং অধিকারগুলো আজ আবার হারিয়ে ফেলেছে। তথাকথিত উন্নয়নের নামে শোষণ, বঞ্চনা, লুটপাট ও অত্যাচারের এক দুঃসহ দুঃশাসন আজ জনগণের বুকের ওপর চেপে বসেছে। এই স্বৈরশাসন জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা মানুষকে আজ ভাতে মারছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

মানুষের কাজের সংস্থান নেই। চাকরির খোঁজে লুকিয়ে বিদেশে যাবার পথে আমাদের তরুণেরা সাগরে ডুবে মরছে।

উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় পাঁচ-দশগুণ বাড়িয়ে এরা লুটের রাজত্ব কায়েম করেছে। কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের নামে বিদ্যুৎ খাতকে বানিয়েছে হরিলুটের কারখানা। শেয়ার বাজার এরা লুটে খেয়েছে। অর্থ লোপাট করে ব্যাংকগুলো করে ফেলেছে দেউলিয়া। হাজার হাজার কোটি টাকার তছরুপকে এরা 'সামান্য ক্ষতি' বলে উপহাস করছে। বিদেশে পাচার করছে হাজার হাজার কোটি টাকা। সুইস ব্যাংকে এরা পাচার করা অর্থের পাহাড় গড়েছে। যারা এই দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত হয় না, তদন্ত হলেও সেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়না। দোষীদের গ্রেফতার করা হয় না। বিচার হয় না। অন্যায়-অবিচার ও শোষণ-বঞ্চনা-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সকল পথ এরা বন্ধ করে দিয়েছে। হামলা-মামলা, গ্রেফতার ও জেল-জুলুম চালিয়ে প্রতিবাদী সব কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়া হচ্ছে। গণতন্ত্রেও লক্ষ কর্মী আজ মানবেতর জীবনযাপন করছে। অপহরণ, গুম, খুনের এক ভয়াবহ বিভীষিকায় বাংলাদেশ আজ ছেয়ে গেছে। ঘরে ঘরে আজ হাহাকার। স্বজন হারানো কান্নার রোলে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

হেনস্তা ও অপমানের ভয়ে নাগরিক সমাজ স্বাধীন মত প্রকাশের সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও একদল উচ্ছিষ্ট স্তাবকের গুণকীর্তনে মানুষ অতীষ্ট হয়ে উঠেছে। দলীয়করণ, ভীতিপ্রদর্শন ও নানা অপকৌশলের মাধ্যমে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আজ প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। ২০১৪ সালে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিএনপি অবশ্যই সে নির্বাচনে অংশ নিতো। তাহলে বিএনপিই জনগণের সমর্থনে এখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকতো। যাদের আজ ক্ষমতায় থাকার কথা সেই দলের সঙ্গে বিনাভোটের সরকার এমন আচরণ করছে যেন বিএনপি নির্মূল করাই তাদের প্রধান কাজ।

আমাদেরকে অফিসে মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়েছে। সেই সময়ে বাইরের নানা ঘটনার জন্য আমাকে আসামী করে মামলা করা হয়েছে। আমার দলের নেতা-কর্মীদের দিয়ে জেলগুলো ভরে ফেলা হয়েছে। হাজার হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। যারা লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ খুনের নির্দেশ দেয়, গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন দিয়ে বাসযাত্রী পুড়িয়ে মারে, যারা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের নামে ব্যাংকে আগুন, পেট্রোল পাম্পে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, রেল লাইন তুলে দিয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করেছে দেশজুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে, তারাই আজ আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করছে। আমরা সন্ত্রাসে বিশ্বাস করি না। সারা দেশে প্রকাশ্য সন্ত্রাস করছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় না। তাদের কোনো বিচার হয়না।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
দেশের সব প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। কথা বলার অধিকার নেই, গণতন্ত্র নেই, মানুষের ভোটের অধিকার নেই। দশ টাকা দরে চাল খাওয়াবার ওয়াদাকে ভয়াবহ ভাঁওতাবাজি হিসেবে প্রমাণ করে মোটা চালের কেজি এখন পঞ্চাশ টাকা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে প্রতিটি নিত্যপণ্যের দাম। দেশে ন্যায়বিচার নেই। ইনসাফ নেই। জনগণের কোনো নিরাপত্তা নেই। নারী ও শিশুরা নির্যাতনের শিকার। দেশে আজ সত্যিকারের সংসদ নেই। তথাকথিত সংসদে নেই প্রকৃত বিরোধী দল। শাসকদের কোথাও কোনো জবাবদিহিতা নেই।

সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে বৈরী প্রচারণা ও ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। দলীয়করণ ও অন্যান্য হীন পন্থায় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। শিল্পায়ন, উৎপাদন ও বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষের কাজ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে গভীর মন্দা। ডলারের দাম বাড়ছে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে। মাদকের বিষাক্ত ছোবলে তরুণ সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ ডুবে যাচ্ছে এক গভীর অন্ধকারে।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তি চায়। তারা তাদের অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতেই আমরা গণতন্ত্রের জন্য আবারো সংগ্রাম শুরু করি। সেই সংগ্রামের পথে অনেক জীবন ইতোমধ্যে ঝরে গেছে। অনেক মানুষ গুম ও খুন হয়েছে। দুঃসহ বন্দীজীবন কাটাচ্ছে অগণিত নেতা-কর্মী। অসংখ্য মানুষ হামলা, মামলা, হুলিয়া, নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আজকের দুঃশাসনের হাত অনেক নিরাপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত। এই রক্তপিপাসু শাসকদের কবল থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করা সহজসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু আমরা হার মানিনি। জনগণ পরাজিত হবে না। দুঃশাসন একদিন থাকবে না। কিন্তু যে কলঙ্কের ইতিহাস তারা রচনা করছে সেই কলঙ্কের ছাপ চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,
কেবল নিজেদের দলীয় স্বার্থে ও সুবিধার্থে সংবিধান বদল করে গায়ের জোরে যারা এখন ক্ষমতায় টিকে আছে তারা জনগণের ভোটে আসেনি। দেশের মানুষ তাদের নির্বাচিত করেনি। তাদের দেশ পরিচালনার প্রতি জনগণের সায় ও সম্মতি নেই। নৈতিক দিক থেকে এরা অবৈধ। তাই তারা যতই হুংকার দিক, তাদের কোনো নৈতিক সাহস ও মনোবল নেই।

এই শাসকদের কোনো গণভিত্তি নেই। পেশিশক্তি, সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোকে জনগণের বিরুদ্ধে অপব্যবহার করে ওরা টিকে আছে। জনগণের সমর্থন নেই বলেই তারা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ভয় পায়।

আমরা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চাই। জনগণের অধিকার তাদেরকে ফেরত দিতে চাই। তাই আমরা আন্দোলন করছি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের

জন্য। যে নির্বাচনে মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারবে এবং সেই ভোট সঠিকভাবে গণনা করে সুষ্ঠুভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। সকল দল অংশগ্রহণ করতে পারবে। তেমন সুষ্ঠু নির্বাচন তারা চায় না। তাদের কথা, ক্ষমতায় থেকে এবং সংসদ বহাল রেখেই তারা নির্বাচন করবে। যাতে মানুষ ভোট দিতে না পারে এবং কারচুপির মাধ্যমে ফলাফল পাল্টে দেয়া যায়। এই প্রহসন তারা একবার করেছে। আবারো করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যেই তারা আমাদেরকে নির্যাতন ও হামলা-মামলা ও বন্দি করে তটস্থ রেখে সরকারি খরচে এক বছর আগে থেকেই নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ প্রহসন নয়, সত্যিকারের নির্বাচন চায়। তেমন নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছি বলেই আজ আমাদের ওপর এতো জুলুম-নির্যাতন, এতো মিথ্যা মামলা।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে তেমনি এক মিথ্যা মামলায় আগামীকাল রায় হবে। এই রায়কে কেন্দ্র করে শাসক মহল ভীত হয়ে জনগণের চলাচলের অধিকার প্রতিবাদের অধিকার সভা-মিছিলের সাংবিধানিক অধিকার, প্রশাসনিক নির্দেশে বন্ধ করা হচ্ছে। ভিত্তিহীন ও মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের ভয়ে ভিত হয়ে এ হীন পথ খুঁজে নিয়েছে সরকার। সারাদেশে তারা বিভীষিকা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। জনগণের প্রতিবাদের সম্ভাবনাকে তারা এতটাই ভয় পায়।

আদালত রায় দেয়ার বহু আগে থেকেই শাসক মহল চিৎকার করে বলে বেড়াচ্ছে, আমার জেল হবে। যেন বিচারক নন, ক্ষমতাসীনরাই রায় ঠিক করে দিচ্ছে। প্রধান বিচারপতিকে চাপের মুখে পদত্যাগ ও দেশত্যাগে বাধ্য করার পর কোনো আদালত শাসকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে সাহস পাবে কিনা তা নিয়ে সকলেরই সন্দেহ আছে। তারপরেও দেশবাসীর উদ্দেশে সগৌরবে জানাতে চাই যে, আপনাদের খালেদা জিয়া কোনো অন্যায় করেনি। কোনো দুর্নীতি আমি করিনি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কুয়েতের তৎকালীন আমীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কুয়েতের আমীর যে অনুদান প্রদান করেন তা তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমানের উদ্যোগে নিয়ে আসা, সেই অর্থের বিলিবণ্টন, তহবিল পরিচালনা

অর্থাৎ জিয়া অরফানেজের সঙ্গে আমি কখনো কোনোভাবেই জড়িত ছিলাম না। তাছাড়া এই অর্থ সরকারি অর্থ নয় এবং ট্রাস্টটিও প্রাইভেট ট্রাস্ট। ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে এ মিথ্যা মামলায় আমাকে জড়িত করা হয়েছে। আমার আইনজীবীরা আদালতে তা প্রমাণ করেছেন। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, জিয়া অরফানেজের একটি টাকাও তছরুপ হয়নি। সমস্ত টাকা প্রতিষ্ঠানের নামেই ব্যাংকে জমা আছে। এখন সুদাসলে সেই টাকা বেড়ে প্রায় তিনগুণ হয়েছে। এ মিথ্যা মামলায় ন্যায়বিচার হলে আমার কিছুই হবে না। ইনশাআল্লাহ্ আমি বেকসুর খালাস পাবো। দেশে ন্যুনতম আইনের শাসন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকলে এই জালিয়াতিপূর্ণ মামলা যারা দায়ের করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া উচিত। যারা এই মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছে তাদেরও সাজা হওয়া উচিত। আর যদি শাসক মহলকে তুষ্ট করার জন্য অন্য রকম কোনো রায় হয়, তাহলে তা কলঙ্কের ইতিহাস হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের মানুষ অন্যায়কারী কাউকেই ক্ষমা করে না, করবে না।

আমি যে-কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আছি। আমাকে জেল বা সাজার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমি মাথা নত করবো না। জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে পিছু হটবো না। জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমাকে রাজনীতির ময়দান ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখা এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আদালতকে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাতেই একদলীয় শাসন কায়েম ও খালি মাঠে গোল দেয়ার খায়েশ পূরণ হবে বলে আমি মনে করি না।

স্বৈরশাসক আইয়ুব খান এক সময় মিথ্যা অভিযোগে মামলা করে এদেশের জনপ্রিয় রাজনীতিবিদের 'এব্ডো' অর্থাৎ নির্বাচন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী, সেই 'এব্ডো' টেকে নাই। গণঅভ্যুত্থানে আইউবের পতন ঘটেছিল।

ফখরুদ্দীন মঈনুদ্দিনের অবৈধ সরকার রাজনীতিবিদদের হেয় করা এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে আমাকে বিদেশে চলে যেতে বলা হয়েছিল, আমি তাদের কথায় রাজি না হয়ে আপনাদের ছেড়ে দেশ ছেড়ে যাইনি। যার জন্য আমার এবং আমার সন্তানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছিলো। আমাকে এক বছর নয় দিন কারারুদ্ধ করে

রেখেছিলো। আমার দুই সন্তানকেও কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করেছিল। সেই অবৈধ সরকার আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছিল।

সেই অবৈধ সরকারের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনাসহ তাদের দলের নেতা-কর্মীদের হাজার হাজার মামলা তুলে নিয়েছে। আর আমিসহ আমাদের নেতা-কর্মীদের সেই সব মামলায় হেনস্তা করা হচ্ছে। যোগ হয়েছে হাজারো নতুন নতুন মিথ্যা মামলা।

জরুরি সরকারের সে-সব মামলায় আওয়ামী লীগের অনেকের সাজা হয়েছিল। দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত সেই আসামীরাও বিনাভোটে এমপি-মন্ত্রী হয়ে এখন আমার বিরুদ্ধে হুংকার দিচ্ছে। তারা ক্ষমতায় থাকবেন আর আমাদের বিরুদ্ধে শুধু অবৈধ সরকারের দেয়া মামলা চলবে এই অন্যায় বাংলাদেশ মেনে নেবেনা।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আমি কম বয়সেই স্বামী হারিয়েছি। দেশের জন্য জিয়াউর রহমান জীবন দিয়েছেন। দলের নেতা-কর্মীদের দাবিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির বিপদসংকুল পথে পা বাড়িয়েছি। আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও নিস্তরঙ্গ জীবন বিসর্জন দিয়েছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী আমাকে তার প্রতিদান দিয়েছে অপরিমেয় ভালোবাসায়। প্রতিবারের নির্বাচনে পাঁচটি করে আসনে পর্যন্ত তারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন। কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে আজ পর্যন্ত আমি পরাজিত হইনি। জনগণের সমর্থনে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হবার গৌরব আমি অর্জন করেছি। তিন-তিনবার তারা আমাকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন। এখনো আমি দেশের যে প্রান্তেই যাই উচ্ছসিত জনজোয়ারে আমি তাদের ভালোবাসায় অভিষিক্ত হই। আমি রাষ্ট্র পরিচালনায় কিংবা বিরোধী দলে যেখানেই থাকি এই জনগণ প্রতিটি সুখে-দুঃখে, শান্তিতে-সংগ্রামে আমার সাথী হন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখার পর থেকে আমি জনগণকে যতটা সময় দিয়েছি, পরিবার ও সন্তানদের ততোটা সময় দিতে পারিনি। কারাগারে থাকতে আমি আমার মাকে হারিয়েছি। অফিসে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় আমি একটি সন্তান হারিয়েছি। আরেকটি সন্তান নির্যাতনে পঙ্গু হয়ে

দূরদেশে এখনো চিকিৎসাধীন। আমার এই স্বজনহীন জীবনেও দেশবাসীই আমার স্বজন। আল্লাহ্ আমার একমাত্র ভরসা। আমি যেমন থাকি, যেখানেই থাকি যতক্ষণ বেঁচে থাকবো দেশবাসীকে ছেড়ে যাবো না।

প্রিয় দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, আমাকে আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হলেও বিশ্বাস করবেন, আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি। আপনারা গণতন্ত্রের জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য, জনগণের সরকার কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। বাংলাদেশে সব সময়ই ছাত্র-যুবক তরুণেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সৈনিক, ছাত্র-জনতার মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। এই ছাত্র-জনতা আন্দোলনেই স্বৈরাচার পরাজিত হয়েছে। আজ গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেই ছাত্র, জনতাকে আহ্বান জানাই এগিয়ে আসতে বিএনপি, ২০ দলসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক দল, কৃষক শ্রমিকসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে আমি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগেও অনেকে আছেন যারা গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকারে বিশ্বাস করেন এবং ভবিষ্যত পরিণতির কথা ভাবেন। তাদের প্রতিও আমার একই আহ্বান রইলো। আগামীতে অনেক ফাঁদ পাতা হবে, অনেক ষড়যন্ত্র হবে, সবাই সাবধান ও সতর্ক থাকবেন। বুঝে-শুনে কাজ করবেন। এই দেশ আমাদের সকলের। কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়।

আমরা সংঘাত, হানাহানি, নৈরাজ্য চাই না। আমরা শান্তি চাই। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। এখনো আমরা আশা করে বসে আছি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে। সেই প্রত্যাশা রেখেই আহ্বান জানাই, হুমকি-ধামকি ও নির্যাতনের পথ ছেড়ে আসুন, আমরা আলোচনার মাধ্যমে শান্তির পথে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করি। এ নির্বাচন কাউকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ এবং কাউকে ক্ষমতায় বসাবার নির্বাচন নয়। এ নির্বাচন হবে জনগণের রায় নিয়ে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্বাচন।

আসুন, এই দুঃখী মানুষের দেশটাকে একটি শান্তির দেশে পরিণত করতে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অবদান রাখি। আমাদের বয়স হয়েছে।

আসুন, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর সম্ভাবনাময় দেশ রেখে যাই।

এই বাংলাদেশটাকে আজ এক বৃহত্তর কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। জনগণের শাসন কায়েমের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করতে পারলে আমরা সকলেই মুক্ত হবো ইনশাআল্লাহ।

সকলকে ধন্যবাদ
আল্লাহ্ আমাদেরকে কামিয়াব করুন
আল্লাহ্ হাফেজ।
বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

[এমাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত 'খালেদা জিয়া– তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

৮ ফেব্রুয়ারি বেগম খালেদা জিয়ার কারাবরণ

ক. আমি ফিরে আসব

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

'আমি ফিরে আসবো কান্নারত স্বজনদের উদ্দেশ্যে খালেদা জিয়া'।

একটি অফ-হোয়াইট শাড়ি পরে প্রার্থনা সারলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এরপর কান্নারত স্বজনদের সান্ত্বনা দিলেন তিনি। তারপর গুলশানের বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি গাড়িতে উঠে রওনা দেন আদালতের উদ্দেশ্যে।

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৮, দুপুর ১২টার দিকে বিএনপি নেত্রী আদালদের উদ্দেশ্যে গুলশানের বাসভবন 'ফিরোজা' ছাড়েন যখন, তখন আত্মীয়দের অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

খালেদা জিয়া তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'কান্নার কিছু নেই। আমি ভালো থাকবো। তোমরা অপেক্ষা করো। আমি ফিরে আসবো। মন খারাপ করো না। শক্ত থাকো।'

বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোড়, ছোট ভাই, ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, দলের নেতা নজরুল ইসলাম খান, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার নওশাদ জমির এবং আইনজীবী এজেড মোহাম্মদ আলী বিএনপি নেত্রীর সঙ্গে আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

প্রতিহিংসার বিচারে বন্দী; গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জনগণের আস্থার প্রতীক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দেশবাসীর প্রতি আবেদন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ বেগম জিয়া কারাগারে তার সাথে সাক্ষাৎকারে যাওয়া

নেতাদের কাছে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আবেদন জানান :

'দেশের সব প্রথা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। কথা বলার অধিকার নেই, গণতন্ত্র নেই, মানুষের ভোটের অধিকার নেই। দশ টাকা ধরে চাল খাওয়ানোর ওয়াদাকে ভাঁওতাবাজী প্রমাণ করে চালের কেজি এখন সত্তর টাকা। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম।'

'মানুষের কাজের সংস্থান নেই। চাকুরির খোঁজে লুকিয়ে বিদেশ যাবার পথে আমাদের তরুণরা সাগরে ডুবে মরছে। উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় পাঁচ-দশগুণ বাড়িয়ে এরা লুটের রাজত্ব কায়েম করছে। দুর্নীতি এখন লাগাম ছাড়া। দেশে ন্যায় বিচার নেই। ইনসাফ নেই। জনগণের কোন নিরাপত্তা নেই। নারী ও শিশুরা পাশবিক নির্যাতনের শিকার।'

'দেশে আজ সত্যিকারের সংসদ নেই। তথাকথিত সংসদে নেই প্রকৃত বিরোধী দল। শাসকদের কোথাও কোনো জবাবদিহিতা নেই।'

'অনেক মানুষ গুম খুনের শিকার হয়েছেন। দুঃসহ বন্দী জীবন কাটাচ্ছে অগণিত নেতাকর্মী ও ভিন্ন মতের মানুষরা। অসংখ্য মানুষ হামলা-মামলা-হুলিয়া-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।'

'বাংলাদেশের মানুষ এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি চায়।'

'আমাকে আপনাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হলেও বিশ্বাস করবেন—আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি।'

আমি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবো না।

'আপনারা গণতন্ত্রের জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য, জনগণের সরকার কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আমি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবো না।'

'জেল-জুলুম দিয়ে আমাকে দুর্বল করা যাবে না। আমার প্রতি অন্যায় করেছে। দেশের মানুষ আমার সাথে আছে। দেশবাসীকে বলব, আপনারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন, ধৈর্য্য ধরবেন। ইনশাল্লাহ আমাকে নত করার সুযোগ নেই। অচিরেই বিজয় হবে।'

জিয়া অরফারেন্স ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পেয়ে কারাগারে প্রবেশের আগে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া উল্লিখিত কথাগুরো বলেছিলেন বলে জানান তার আইনজীবী ও দলটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাসুদ আহমেদ তালুকদার।

খ. ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে জনতার ঢল

আদালতের উদ্দেশ্যে রাজধানীর গুলশানের নিজ বাসা থেকে রওনা হওয়ার সময় মোনাজাত করে বের হয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। মোনাজাতে তিনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। দেশের ভালো চেয়েছেন। নেত্রী বের হওয়ার আগে তার পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য্য ধরতে বলেছেন। এ সময় তার বড় বোন, ভগ্নিপতি, দুই মামীসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে গুলশানের বাসভবন ‘ফিরোজা’ থেকে আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন বিএনপি প্রধান। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিশেষ প্রটোকল দিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। গুলশান জোনের ডিসি মোস্তাক আহমেদ বলেন, ‘তিনটি গাড়ির বিশেষ প্রটোকল দিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আদালতে নেয়া হবে।

বেগম জিয়াকে আদালতে নেবার সময় তার বাসভবন এবং অস্থায়ী আদালতে যাবার নির্ধারিত রুটে সব গাড়ি এবং জন সমাগম নিষিদ্ধ করা হয়। ঢাকায় জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বাসভবনের সামনে ও আশপাশের সড়কে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে গুলশানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। মোতায়েন করা হয় বাড়তি পুলিশ।

নিরাপত্তা বাহিনী আশেপাশের সব সড়কে ব্যারিকেড দেয়। বাসার সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ টহল চলছে। সড়ক বন্ধ করে দেয়ায় এখানে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। খালেদার বাসার সামনের ৭৮/৭৯ নম্বর রোড বন্ধ। সেখানে গণমাধ্যম কর্মীরা অপেক্ষা করছেন। তবে বাসার আশেপাশে সংবাদমাধ্যমের গাড়িও রাখতে দিচ্ছে না নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ৪৩ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাজধানী ঢাকায় ২০ প্লাটুন বিজিব সদস্য টহল দিচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা শহরে ২৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

গুলশান থেকে যাত্রা শুরু করে র‍্যাব পুলিশ প্রহরায় কোনো নেতা কর্মী

ছাড়া বেগম জিয়াকে অস্থায়ী আদালতের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়। কিন্তু বেগম জিয়ার গাড়ী তেজগাঁও এলাকায় পৌঁছানোর পর চারদিক দিয়ে বেগম জিয়া স্লোগানে মুখরিত হয়ে ১৪৪ ধারা ভেঙে হাজার হাজার মানুষ পুলিশি ব্যারিকেড অগ্রাহ্য করে বেগম জিয়ার গাড়ি বহরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তাদের প্রাণের নেত্রীকে জনতার প্রহরায় বকশি বাজার নিয়ে আসে। ওই দিন বেগম জিয়ার ওপর যে অন্যায় হচ্ছে তাতে তার আঙ্গুলি ইশারায় হতে পারত রক্তগঙ্গা। কিন্তু সারা জীবনের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বেগম জিয়া প্রতিটা মুহূর্তে জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সামান্যতম উত্তেজিত হতে দেননি।

[এমাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত ‘খালেদা জিয়া– তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

মাদার অব ডেমোক্রেসি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া

গণতন্ত্রের প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' সম্মাননা দিয়েছে কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটার্স ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও)। সংস্থাটির 'হিরো অব ডেমোক্র্যাসি' খাতে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সংবাদ সম্মেলনে এই প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া ক্রেস্ট ও সনদপত্র সাংবাদিকদের দেখিয়েছেন। রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে সোমবার অনুষ্ঠিত বিএনপি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো এতে তুলে ধরা হয়। এ সময় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু উপস্থিত ছিলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও) গণতন্ত্রের প্রতি দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার অসামান্য অবদান এবং তিনি যে এখনো গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি এখন গৃহবন্দী আছেন। এসব কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশনেত্রীকে 'মাদার অব ডেমোক্র্যাসি অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে। মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, কানাডীয় হাইকমিশনও ঐ প্রতিষ্ঠানকে এনডোর্স করেছে। দীর্ঘ ৮১ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ১ ফেব্রুয়ারি গুশলানের বাসা ফিরোজায় ফিরেন। ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দুদকের দায়ের করা মামলায় সাজা নিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা

জিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। দু বছর কারাবাসের পর করোনা শুরুর দিকে ২০২০ সালে ২৫ মার্চ পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বিশেষ বিবেচনায় শর্তসাপেক্ষে মুক্তি পান তিনি।

বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অনন্যসাধারণ নাম এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সাধারণ গৃহবধূ থেকে তিনি একজন সফল রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছেন। দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি পরিণত হয়েছেন গণমানুষের নেত্রীতে। স্বৈরশাসনের কবল থেকে গণতন্ত্র উদ্ধারে তাঁর সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সেই কথা দেশ-বেদেশে সবাই জ্ঞাত। স্বৈরশাসকের নানা প্রলোভন ও ভয়ভীতি তাঁকে এতটুকু টলাতে পারেনি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সেই আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ভূমিকার জন্য তিনি ভূষিত হয়েছেন 'দেশনেত্রী' অভিধায়। আমরা এতে গর্বিত। এর চেয়ে বড় সম্মান, বড় গৌরব আর কী আছে? সম্ভবত ১৯৮৯ সালে হংকংয়ের বিখ্যাত সাময়িকী 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' এক প্রতিবেদনে তাঁকে অভিহিত করেছিল 'মোস্ট আনকমপ্রোমাইজিং লিডার অব দি ইস্ট' হিসেবে। বলতে গেলে ১৯৮৩ থেকে ২০২২ দীর্ঘ ৩৯ বছরে বেগম খালেদা জিয়ার অর্জন অসামান্য। গৃহবধূ থেকে তিনি রাজনৈতিক নেত্রী হয়েছেন। তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আমাদের সংসদীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের নেতাও তিনি (১৯৯৬-২০০১) ছিল। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্মানও তিনি অর্জন করেছেন। নির্বাচন করে কখনো তিনি পরাজিত হননি। বেগম খালেদা জিয়া যদি তাঁর বাকি জীবনে আর রাজনীতি নাও করেন বা না করতে পারেন, তার পরও তাঁর এ অর্জনই তাঁকে ইতিহাসে বাঁচিয়ে রাখবে। 'খালেদা জিয়া' শব্দ দুটি উচ্চারণ করলেই মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজন গণতান্ত্রিক নেত্রী এবং মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। তাঁকে যত দূর জানি তিনি অসম্ভব দৃঢ়চেতা, অমিত সাহসী এবং আপোষহীনতায় কঠোর। এছাড়া তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদার এবং গণতন্ত্র মনা। রাগ-অভিমান থাকলেও পরবর্তীতে ভুলে যান। তিনি শহীদ জিয়ার যোগ্যতম উত্তরসূরি, তাই তাঁর দেশ শাসন এবং নেতৃত্ব ছিল নজর কারার মতো। তিনি নির্বাচন সম্পর্কে বার বার বলতেন আমি সংঘাত চাই না, এখনও আলোচনার সময় আছে।

তিনি প্রায়শঃ আলোচনার মাধ্যমে আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কূটনৈতিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে খালেদা এ সকল কথাগুলো বলতেন—আমরা দেশে কোনো সংঘাত ও অশান্তি চাই না। নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। সরকারকে বলব—আসুন এখনো সময় আছে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরি করি। ঐ সময় তিনি বলেন দেশটা সরকারের একার নয়। জনসভার তারিখ আমরা আগেই ঘোষণা করেছি। সুতরাং ২৫ অক্টোবরের জনসভা করতে দিতে হবে। সরকার গায়ের জোরে একতরফা নির্বাচন করলে কেন্দ্রভিত্তিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে তা প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছি, আমরা দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। সেই নির্বাচন এই সরকারের অধীনে হবে না। কেবল নির্দলীয় সরকারই দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারবে। বর্তমান সরকারের আমলে উপনির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, অতীত কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায়, জাতীয় নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু হবে না। কিন্তু সরকার জবরদস্তিভাবে একতরফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করছে, যা দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। কারণ দেশের মানুষ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন মেনে নেবে না। সরকার কেবল সংবিধানের দোহাই দেয় মন্তব্য করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সরকার সংবিধানের কথা বললে আমি প্রশ্ন করব, ১৯৯৫-৯৬ সালে কেন আপনারা সংবিধান মানেননি। তখন কেন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য এত হরতাল-আন্দোলন-জ্বালাও-পোড়াও করেছিলেন।

ঐ সময়ে তাঁর বক্তব্য ছিল—সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য নিজেদের ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধন করে নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, সরকার একেকবার একেক কথা বলে। তাদের বিশ্বাস করা যায় না। এতদিন বলেছে, সংসদ ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। এরপর নির্বাচনের জন্য স্থগিত থাকবে। এখন বলছে, সংসদ অধিবেশন আরও চলবে। তাহলে একটি সংসদ বহাল রেখে আরেকটি সংসদ নির্বাচন কিভাবে হবে। একজন সিটিং এমপি থাকতে কিভাবে আরেক এমপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এটা হতে পারে না। খালেদা জিয়া বলেন,

প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের সব সুযোগ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা বিরোধী দল কোনো সুবিধা পাচ্ছি না। আমি বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে কোথাও গেলে ডিসি সাহেবও দেখা করতে আসেন না। তাহলে নির্বাচনে সবার সমান সুযোগ সৃষ্টি অর্থাৎ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে কিভাবে। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় অবস্থা। অর্থনৈতিক কারণে দেশের মানুষ না খেয়ে আছে। আর ক্ষমতাসীনরা লুটপাট করে টাকার ওপর বসে আছে। দেশ আজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। দেশের মানুষ এই সরকারের হাত থেকে মুক্তি চায়। আগামীতে ক্ষমতায় গেলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি নির্মূল, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, ঐক্যের রাজনীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেবেন বলে জানান বিএনপি চেয়ারপারসন।

প্রফেসর মাহবুব উল্লাহও বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর সংসদে খুবই স্বল্পসংখ্যক আসন পাওয়া সত্ত্বেও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সহযোগিতার এই প্রস্তাব বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন রাজনৈতিক মতপার্থক্য যতই গভীর হোক না কেন সরকার ও বিরোধী দল একটি কার্যকর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং তা সম্ভবও। কিন্তু তার এই সহযোগিতার প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিতে বলীয়ান সরকারের কাছে ন্যূনতম গুরুত্ব পায়নি। আমরা লক্ষ করলাম, ২০০৯-এর বিডিআর বিদ্রোহের পর যখন সরকারের করণীয় ছিল বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় সম্মতির ভিত্তিতে পরিস্থিতির সামাল দেয়া, তখন কিন্তু এই পথে পা বাড়াল না সরকার। উপরন্তু দোষারোপের রাজনীতির চর্চা পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলল। এরপর সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের নামে পর্যায়ক্রমে সাত-আট হাজার মামলা প্রত্যাহার করল। এসব মামলার মধ্যে মারাত্মক ফৌজদারি অপরাধের মামলাও রয়েছে। যাদের মামলা প্রত্যাহার করা হলো তারা সৌভাগ্যবান। তাদের এই সৌভাগ্যের উৎস ছিল সরকারি দলের সমর্থক হওয়া। কিন্তু বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এক-আধটি ব্যতিক্রম বাদে কেনো মামলাই প্রত্যাহার করা হলো না। এটি ছিল সুস্পষ্টভাবে একটি বৈষম্যমূলক আচরণ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বৈষম্যমূলক আচরণের কোনো সুযোগ নেই।

সরকারের উচিত ছিল সরকারি দল ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা একই ধরনের মামলাগুলো প্রত্যাহার করা, অথবা সব পক্ষকে একইভাবে আইনি প্রক্রিয়ায় নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ প্রদান করা। এর পরিবর্তে যে উৎকট পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হলো তার ফলেই আইনের শাসনেরই ব্যত্যয় ঘটানো হলো। একে কী বলব? গণতান্ত্রিক আচরণ না প্রতিহিংসাপরায়ণতা?

'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর চেয়ে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার' বললে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। আমরা অবশ্য Transitional Council (অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল) নামটি আরও বেশি প্রযোজ্য বলে মনে করে থাকি।

তিনি আরও বলেন, অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়াতেও নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর সরকার একটি নির্দলীয় Mode-এ চলে যায়। এক Caretaker convention-এর অধীনে এ বিষয়ে সে দেশের সরকার অনুসরণ করে Guidance on caretaker conventions নামক বিধি-বিধানের। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করতে পারবে না, কোনো সরকারি নিয়োগদান করতে পারবে না, কোনো ব্যবসা-সংক্রান্ত উদ্যোগ নিতে পারবে না। কোনো আন্তর্জাতিক Negotiation বা visit করতে পারবে না। মালয়েশিয়ায় ইলেকশন কমিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'code of ethic' নিরূপিত করে। পার্লামেন্ট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের ব্যবস্থাপনা তারা পরিচালিত করে এই বিধানের আওতায়।

কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা এতটাই ভিন্ন যে এখানে সরকার দ্বারা ভোট চুরি, ভোট ডাকাতি, সূক্ষ্ম কারচুপি, স্থূল কারচুপি হয়ে থাকে। এসব শব্দাবলি দিয়ে ভাষা হয়তো সমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সার্বিক নৈতিকতার অভিধান প্রচণ্ডভাবে কলঙ্কিত হয়েছে। নির্বাচনে নিরপেক্ষতা রক্ষা করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন ও জনপ্রশাসনের। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন কারও সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই সরকারপ্রধান দ্বারা মনোনীত ও রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা নিযুক্ত। এই পন্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত বলেই প্রতিষ্ঠানটিকে কোনোক্রমেই নিরপেক্ষ বা স্বাধীন বলা যায় না। বরং বলা যায় যে এই সংববিধানিক প্রতিষ্ঠানটি সরকার ও সেদিক থেকে সরকারি দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর জনপ্রশাসনকে এমন নিখুঁতভাবে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ

পর্যায় পর্যন্ত দলীয়করণ করেছে সরকার যে সেখানে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করা একেবারেই মূর্খতার শামিল।

ক্ষমতাসীনদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শতকরা একশ' ভাগের বেশি ভোট পড়তে কি আমরা দেখিনি বাংলাদেশে? যেখানে শতকরা ভাগের বেশি ভোট দিতে দেখা যায় না বিগত একশ' বছরের ইতিহাসে, সেখানে ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ ভোট পেতে কি আমরা দেখিনি—এমনকি নিকট অতীতে?

এ দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা যখন এই যে, সঙ্গত কারণেই কোনো দল অপর কোনো রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাস করে না, তখন নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে এবং কারচুপিহীন করতে হলে এবং সঠিক নির্বাচনী ফলাফল পেতে হলে একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্বাচন পরিচালনার কোনো বিকল্প নেই।

বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে তার ক্যান্টনমেন্টের বাসভবন থেকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উচ্ছেদ করা হলো ২০১০ সালের ১৩ নভেম্বর। আমার যতদূর মনে পড়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর তার পরিবারের সহায়সম্বলহীন অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তৎকালীন সরকার এই বাড়িটি বেগম খালেদা জিয়াকে দিয়েছিল। সম্ভবত সংসদেও তাকে একটি বাসস্থান দেয়ার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের সমাজ ও কালচারে কাউকে তার আশ্রয়স্থল থেকে উচ্ছেদ করা অত্যন্ত অমানবিক বলে বিবেচনা করা হয়। বেগম খঅলেধা জিয়া উচ্চতর আদালত থেকেও কোনো ধরনের রিলিফ পেলেন না। বিষয়টি আইনি শুদ্ধাচারের দৃষ্টিতে যা-ই হোক না কেন এ ধরনের ঘটনায় যে কোনো মানুষই মর্মাহত হন নিশ্চয়ই। বেগম খালেদা জিয়াও একইভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তা বোঝা যায় সাংবাদিকদের সামনে তার অশ্রুসিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখে। দেশের সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখেনি। এর মধ্য দিয়ে আমাদের মজ্জাগত প্রতিহিংসার রাজনীতিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ জন্য দেশ-বিদেশে কতই না প্রতিবাদ ঝড় উঠছে। পথে-ঘাটে নানা মিছিল-মিটিংও হয়েছে। কিন্তু সরকার নাছাড়ো বান্দা। কিছুতেই মানলো না। এ যেন দেশনেত্রীর করুণ ঘরছাড়া। এটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।

আমরা তো নিজেদের একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবি করি। তাহলে দেশ তো চলবে জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী। দেশের পঁচানব্বই ভাগ

মানুষ যখন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চায়, তখন তাদের ইচ্ছানুযায়ী দেশের নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। গণতন্ত্র চলবে সংখ্যাগরিষ্ঠ গণরায়ের ভিত্তিতে। এর অন্যথা হলে সে ব্যবস্থাকে আর যাই বলা যাক, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যাবে না। বেগম খালেদা জিয়া এ বিষয়গুলোতে অনড় ছিলেন এবং প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদও করেছিলেন, যার ফলে আজ তিনি গৃহবন্দী। এ জন্যই তিনি গণতন্ত্রের মানস কন্যা, গণতন্ত্রের মা এবং বিদেশীদের কাছে 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি'।

***লেখক :** একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ*
২৮ মার্চ ২০২২

টার্গেট বাংলাদেশ
টার্গেট জিয়া পরিবার

আবদুল হাই শিকদার

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের ভারতের একটা টার্গেট ছিল। ক্ষমতা থেকে রাজীব গান্ধীকে উৎখাত। রাজীব গান্ধী তখন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ছিলেন না, হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু মৌলবাদ, তামিল সন্ত্রাসী ও কংগ্রেসের উচ্চভিলাষী চক্রের প্রতিপক্ষ। বোফর্স কেলেঙ্কারির কেচ্ছা সাত কাণ্ড নিয়ে দেশজুড়ে বিজেপি এবং মিডিয়া সিন্ডিকেটেডভাবে জোর প্রোপাগান্ডার এমন হুলুস্থুল বাধালো যে, 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়'—শুনে শুনে সবাই ধরে নিয়েছিল সত্যি সত্যি ভিলেন রাজীবই দেশের অকল্যাণের উৎস। এ সাথে আদভানীরা চালু করলো গল্প, ইন্দিরা গান্ধীর এক ছেলে চালাতে গেল প্লেন—প্লেন ধ্বংস হলো। অন্য ছেলে প্লেন ছেড়ে চালাতে এলো দেশ—দেশ ধ্বংস হলো। কিন্তু পোহাইলে শর্বরী দেখা গেল, সমস্ত প্রচার প্রচারণা ছিল মিথ্যা তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। দুই দশকেও বোফর্স কেলেঙ্কারির সাথে রাজীব গান্ধীর ন্যূনতম কোন সংশ্লেষ পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে জিয়া পরিবারের ব্যাপারে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্থপতি, বাংলাদেশের রক্ষাকবচ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ইমেজ যে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র সেটা শত্রুরা ভালো করে জানে। শত্রুরা আরো ভালো করে জানে, অনেক ষড়যন্ত্র অনেক সীমাবদ্ধতা, অনেক দমন-পীড়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে 'জিয়া' নামটি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি বলেই অনুপস্থিত

জিয়ার আদর্শ রাজনৈতিক দর্শন হাতে নিয়ে যখন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কিংবা তারেক রহমান এগিয়ে যান—তখন বাংলাদেশ তার রাষ্ট্রিক ও জাতিক অস্তিত্ব এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্ত কাতারবন্দিভাবে তাদের মিছিলে শরিক হয়। পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখাটা জরুরি, শহীদ জিয়া প্রদর্শিত পথ থেকেও তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সরিয়ে রাখা যায়নি। ফলে রাষ্ট্র হিসেবে যারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর করার জন্য অহর্নিশি কাজ করে যাচ্ছেন—তাদের চক্রান্ত সফল হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে প্রতিভাত হন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তথা তারেক রহমান।

আমাদের মনে রাখাটা খুব জরুরি, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড় কিংবা বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে কিন্তু কোনো প্রভু নেই। এই ধরনের বক্তব্য সাচ্চা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের মুখ থেকেই শুধুমাত্র উচ্চারিত হতে পারে। অন্যদের কাছ থেকে নয়। এজন্য আধিপত্যবাদ-সাম্রাজ্যবাদ সবসময় সচেষ্ট থাকে এই জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ববিনাশী তৎপরতায়। কারণ সাচ্চা দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার দেশপ্রেম, তার স্বচ্ছ ইমেজ আর তাদের শক্তির মূল উৎস দেশের জনগণ। এখন এই ইমেজ যদি কালি দিয়ে মলিন করা যায়, স্বচ্ছতাকে যদি প্রশ্নবিদ্ধ ধরা যায়, জনগণের মধ্যে যদি সন্দেহ, সংশয় ঢুকিয়ে দেয়া যায়, জনগণের সাথে যদি তাদের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলেই কেল্লা ফতে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে অদ্যাবধি এই কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে স্থূল এবং সূক্ষ্মতার সাথে করেছে আধিপত্যবাদী শক্তির এদেশীয় তল্পিবাহকরা। এরা দেশে এবং দেশের বাইরে বিশাল ভয়াল আকারে ক্রমাগত ছড়িয়ে গেছে বিষ। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী শক্তির ব্যানার ও জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে যে মিডিয়া গড়ে উঠেছিল তারাও মূল অঙ্গীকার থেকে দূরে সরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আগ্রাসী শক্তির পায়ের নিচে। ফলে যথাসময়ে যথার্থ জবাবটি দেয়া হয়ে ওঠেনি। এই মোনাফেকীর পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়েছে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ।

বিশেষ করে তারেক রহমানকে টার্গেট করা হয় এই কারণে, বিএনপি'র মতো একটি বৃক্ষসদৃশ বড় দলকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বেশকিছু কর্মসূচি যা তৃণমূল পর্যন্ত আলোড়ন তুলেছিল। আর প্রতিপক্ষ হয়ে পড়েছিল ভয়ানকভাবে কোণঠাসা।

শহীদ জিয়ার ইমেজ ও রাজনৈতিক দর্শন, বেগম জিয়ার উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ এবং তারেক জিয়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্যদের নিক্ষেপ করে অস্তিত্বের সংকটে। ফলে মরিয়া হয়ে ওঠে অপশক্তি। তারা অপপ্রচারের এক ঝড় বইয়ে দেয় দেশজুড়ে। এটা না করলে একবিংশ শতাব্দীর পথে যে দৃঢ়তায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল—তা-ও ফেরানো যেতো না। চিরকালের জন্য বিকলাঙ্গ, পরমুখাপেক্ষী যে বাংলাদেশ তারা চায়—তাদের জন্য সত্যি সত্যি বাধার বিন্ধ্যাচল ছিলেন তারেক রহমান। অতএব এ কথা বলা বাহুল্য, ১১ জানুয়ারি মইন উ আহমেদ, ফখরুদ্দীন আহমদের মূল টার্গেটে পরিণত হন তারেক রহমান।

হেন অপপ্রচার নেই যা তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানের বিরুদ্ধে করা হয়নি। ঠিক যেমন ভারতে হয়েছিল গান্ধী পরিবার তথা রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে। তবে শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধ্বংস করে, দেশপ্রেমিক জনগণকে নেতৃত্বহীন করে একটি দেশকে কব্জা করার জন্য যে জঘন্য অপপ্রয়াস সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদীরা করে থাকে বাংলাদেশ তার বাইরে ছিল না কোনদিনও। এধরনের জটিল কুটিল পথচলা তাদের জন্য নতুন নয়। আজকের প্রস্তরযুগে পর্যবসিত আফগানিস্তানে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য সত্যিকারের সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বাদশাহ আমানুল্লাহ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সংবাদপত্র প্রকাশ, নারী শিক্ষা, ডাক ও টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি নানা কাজে হাত দিয়ে আফগানিস্তানকে যখন প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলেন সেই সময় টনক নড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিনীদের। তারা অত্যন্ত দরাজ হাতে শুভেচ্ছা জানাতে দূতের পর দূত পাঠাতে থাকেন কাবুলে। পাঠাতে তৎপর হন সাহায্য। বিগলিত বাদশাহ আমানুল্লাহ এই সাদা শয়তানদের চালাকি বুঝতে পারেননি। খোলা অন্তরে এসব ভালোবাসা গ্রহণ করে তাদের খুলতে দেন নানা মিশন, অফিস, আবাস। এর মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের জন্য আসে একরাশ আমন্ত্রণ।

বাদশাহ আমানুল্লাহ তার স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন ইউরোপ ভ্রমণে—আর এদিকে তার এবং তার স্ত্রীর ছবির সাথে বিভিন্ন নারী ও পুরুষের ছবি, অশ্লীলভাবে লাগিয়ে, তা থেকে পোস্টার ও বইপত্র ছাপিয়ে সয়লাব করে দেয়া হলো সারা আফগানিস্তানে। বলা হয় সেই সময়কার আফগানিস্তানের

এমন একটি বাড়িও ছিল না যেখানে এইসব পোস্টার লাগানো হয়নি। পৌঁছে দেয়া হয়নি অজস্র মিথ্যার ফুলঝুরি দিয়ে গাঁথা-নোংরা বইপত্র। তো, সামান্তযুগে পড়ে থাকা আফগানিস্তানের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য উপজাতীয় সর্দারদেরও বিরাট অংশকে ঘুষ দিয়ে, উপহার, উৎকোচ দিয়ে কিনে নিয়েছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। যেভাবে তারা চেয়েছিল সেভাবেই গণবিস্ফোরণ ঘটে কাবুলে। দেশে ফিরতে ব্যর্থ হন বাদশাহ আমানুল্লাহ আর কাবুলের সিংহাসন দখল করে নেয় পার্বত্য অঞ্চলের ডাকাত বাচ্চাই সাক্কা। রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিণত হয় গোশালায়। পুড়িয়ে দেয়া হয় লাইব্রেরি, হাসপাতাল। উপড়ে ফেলা হয় টেলিগ্রাফের তার। মেয়েদের ধরে ধরে দোররা মারা হয় রাস্তায় রাস্তায়। অর্থাৎ আফগানিস্তানকে আবার ইউটার্ন করে পাঠিয়ে দেয়া হয় মধ্যযুগের অন্ধকারে।

রুমানিয়ার চসেস্কুর অপরাধ কি ছিল? চসেস্কুর প্রবল অপরাধ ছিল সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করতে চাননি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থকে দেখেছেন বড় করে। তিনি রাষ্ট্র হিসাবে ইসরায়েলকে কখনই মেনে নেননি। সমর্থন করেছেন ফিলিস্তিনীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে বজায় রেখেছেন প্রীতির সম্পর্ক। তো তাকে রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হলো সাম্রাজ্যবাদের। সাম্রাজ্যবাদ রুমানিয়ার ভেতরে সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো একটি আত্মঘাতি এলিট সম্প্রদায়। দেশে এবং দেশের বাইরে চসেস্কুর বিরুদ্ধে চললো অপপ্রচারের বিভীষিকাময় ঝড়। চসেস্কু ড্রাকুলার মতো জনগণের রক্ত খান, চসেস্কু নির্যাতনকারী, চসেস্কু মার্বেল দ্বারা নির্মিত প্রাসাদে থাকেন, তিনি সোনার পালঙ্কে ঘুমান ইত্যাদি আরো কত রূপকথা।

সবশেষে পাশ্চাত্য মিডিয়া টিমিসোয়ারায় এক হাসপাতালে মর্গে রক্ষিত কতগুলো পুরনো লাশ রাস্তায় ফেলে দেশে ও বিশ্বময় ছড়িয়ে দিল যে চসেস্কু গণহত্যা চালাচ্ছেন। এ যাবত মারা গেছে হাজার হাজার মানুষ। মিডিয়ার গুণে এই মিথ্যাচারের নিচে চাপা পড়ে গেল সত্যিকারের ঘটনাবলী।

মাও সে তুঙের চীনের তিয়েন আনমেন স্কোয়ারের ঘটনাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে দেখাবার সাম্রাজ্যবাদী কৌশল কি আজও থেমেছে? থামেনি। মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের, আলজেরিয়ার আহমদ বেনবেল্লা, ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ন, ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রমা, লিবিয়ার

গাদ্দাফী, উগান্ডার ইদি আমিন, ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী, আলবেনিয়ার আনোয়ার হোজ্জা, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র, কিউবার বিপ্লবী ফিডেল কাস্ত্রো, বিপ্লবী চে গুয়েভারা, ভারতের চারু মজুমদার—এরা সবাই নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। অপপ্রচারের ধাক্কার নিচে এদের পিষ্ট করার জন্য নিরন্তর কাজ করে গেছে ওরা। এখনও করছে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম সফল পুরুষ স্টালিনের ভাবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য হেন কাজ নেই যা পুঁজিবাদের নিশান বরদাররা করেনি। আগে আমাদের মতো দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ ধর্মীয় নেতাদের উৎকোচ দিত স্টালিন, মাও সে তুঙ তথা কম্যুনিস্টদের গালাগালি করার জন্য। এখন যেমন সাম্রাজ্যবাদ কম্যুনিস্ট তথা নানামাত্রিক চেতনাওয়ালাদের টাকা ঘুষ দেয় হুজুরদেরকে মৌলবাদী ও জঙ্গী বলার জন্য।

সাম্রাজ্যবাদের তথা আধিপত্যবাদের এই অতি পুরাতন কৌশলকে মাও সে তুঙের চীন যেমন ব্যর্থ করে দিয়েছিল তেমনই ইদানীং এই অপপ্রচার, মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে যুৎসই জবাব দিয়েছেন ভেনজুয়েলার মানুষ। তাদের প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজ, তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, নেতৃত্বের অনমনীয় দৃঢ়তা, গভীর দেশপ্রেম, নিজ জনগণের প্রতি অবিচল ভালোবাসা এবং আদর্শবাদীতা দিয়ে কঠোরভাবে মোকাবিলা করেছেন এসব অপতৎপরতার। ভেনজুয়েলার মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এলিট শ্রেণীর বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তারা রুমানিয়ার জনগণের মতো ভুল করেনি। অথবা স্যাভেজের গণমুখী চরিত্রই এমন যে নিজ জনগণের আর তার মাঝখানে তিনি কখনই কোনো 'মধ্যস্বত্বভোগীদের' পাত্তা দেননি। ফলে নিবিড়-গভীর জনসম্পৃক্ততাই যেমন হুগো স্যাভেজের শক্তির উৎস তেমনই রাষ্ট্র হিসাবে বেঁচে গেছে ভেনজুয়েলা। ফলে আজ ফিডেল কিংবা হুগোর পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা সামনের দিকে—পশ্চাতে ফেলে পাশ্চাত্যপীড়িত পচা অতীত।

বাংলাদেশের আজকের বাস্তবতায় এ কথা অনস্বীকার্য যে, আজকের এই দুর্যোগ থাকবে না বেশিদিন। বাংলাদেশের মানুষ বেশিদিন অবাস্তব ফানুসের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে থাকবে না। শহীদ জিয়ার ভাবমূর্তি কিংবা জিয়া পরিবারের অনিষ্ট তারা হতে দেবে না। কারণ তারা জানে, শহীদ জিয়ার ভাবমূর্তি মলিন হতে দেয়ার অর্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক অস্তিত্বকে মলিন করে

ফেলা। তারা জানে, জিয়ার ভাবমূর্তি পরাজিত হওয়ার অর্থ রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের পরাজিত হওয়া। কিন্তু সেই জনগণের কাছে, তাদের প্রাণের পাশে আসন নিয়ে, তাদের ভাষায় তাদের কথাটি বলবার জন্য চাই মধ্যস্বত্বভোগীমুক্ত ব্যাপক বিশাল আয়োজন। তাহলেই জাতীয়তাবাদী শক্তির অগ্রযাত্রা আবার সঠিক পথে এগুবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই কাজটি তারেক রহমান আগেই শুরু করে দিয়েছেন।

লেখক : কবি, সাংবাদিক। সাবেক নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

বেগম খালেদা জিয়া : মানচিত্রে মিশে থাকা নাম

ড. মোর্শেদ হাসান খান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে তখন। চারিদিকে ধ্বংস আর ধ্বংসাবশেষ। প্রলয়ঙ্করী এমনই এক সময়ে ইস্কান্দার মজুমদার ও তৈয়বা মজুমদার দম্পতির কোলজুড়ে নতুন ভোরের দীপ্তি নিয়ে আগমন করেন খালেদা খানম পুতুল। সময়ের পরিক্রমায় বাবা-মায়ের আদরের সেই পুতুলই বর্তমান বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সমার্থক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৬০ সালে তৎকালীন ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই থেকে দিনাজপুরের এক অরাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে খালেদা খানমের বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাসের সঙ্গে যুগপৎ পথচলার শুরু। দিনে দিনে বাংলার আপামর জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, সুখ-দুঃখের সারথি বনেছেন। মানুষ তাকে ভালবেসে দেশনেত্রী উপাধিতে ভূষিত করেছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অন্যায়ের সাথে কখনো আপস করেন নি। তাই তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আপসহীনতার প্রতীক। গণতন্ত্রের জন্য তার দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম তাকে ভূষিত করেছে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' খেতাবে। তবে তার এই দেশনেত্রী বা মাদার অব ডেমোক্রেসি হয়ে উঠার পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রথম লগ্ন থেকেই বেগম খালেদা জিয়ার কণ্টকাকীর্ণ পথচলার শুরু। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে অভিভাবকহীন দিশেহারা জাতির জন্য যখন আলোকবর্তিকা হয়ে জিয়াউর রহমানের অভ্যুদয় ঘটলো তখন থেকেই বেগম জিয়ার সংগ্রামী জীবনের সূচনা। দেশমাতৃকার টানে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান 'I Revolt' বলে বিদ্রোহের সূচনা করেন এবং মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পরিবার-

পরিজন রেখে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বেগম খালেদা জিয়া তার দুই শিশুপুত্র নিয়ে সেই অনিশ্চিত ও ঘোরতর অমানিশার মাঝে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। কিছুদিন চট্টগ্রামে অবস্থান করে সেখান থেকে বড় বোন খুরশিদ জাহান হকের সাথে যোগাযোগ করে দুই সন্তানসহ লঞ্চযোগে ১৬ মে ১৯৭১ নারায়ণগঞ্জে পৌঁছান। তবে তিনি বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারেন নি। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়ের চেষ্টাকালে পাক বাহিনী তার সন্ধান পেয়ে যায় এবং দোসরা জুলাই এস কে আব্দুল্লাহর সিদ্ধেশ্বরীর বাসভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি সামরিক হেফাজতে বন্দিজীবন কাটান।

পাক বাহিনীর দীর্ঘ জুলুম, নির্যাতন ও অপশাসন থেকে মুক্তিলাভের পর জিয়া সামরিক শৃঙ্খলা মেনে ব্যারাকে ফিরে যান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যেতে থাকেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ১৯৭৫ সালের ঘটনাবহুল পরিক্রমার মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা জিয়া জনতার জিয়ায় পরিণত হন। ঐতিহাসিক সিপাহি জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়া শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাসনকালে বেগম খালেদা জিয়া সবসময়ই পাদপ্রদীপের পেছনে ছিলেন। রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করে একজন আপাদমস্তক গৃহবধূ হিসেবে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করছিলেন। তবে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী হিসেবে তিনি স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন দেশে সফর করেছিলেন। রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও স্বামী জিয়ার দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, নেতৃত্বদানের বলিষ্ঠতা বেগম জিয়ার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাই তো ১৯৮১ সালের ৩০ মে কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর বুলেটের আঘাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বরণের পর তার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সফলতার সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলছেন বাংলার এই অবিসংবাদিত কিংবদন্তী।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে কতিপয় বেপথু সেনাসদস্যের গুলিতে প্রেসিডেন্ট জিয়া শাহাদাতবরণ করলে তার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিতে আন্তঃকলহ প্রকট হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছিল সর্বজনে গ্রহণযোগ্য একজন নেতা, যিনি শহীদ জিয়ার দেখানো পথে তার প্রবর্তিত আদর্শকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলকে পরিচালিত করতে পারবেন। নিভৃতচারী বেগম খালেদা জিয়াই ছিলেন সেই

আইকনিক ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন বিএনপি নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তিনি শহীদ জিয়ার অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে পদার্পণ করেন। সেই থেকে তার বিপ্লব ও সংগ্রামের সূচনা। ১৯৮৩ সালের মার্চে তিনি বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বিচারপতি আবদুস সাত্তার অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব আলন করেন। অতঃপর ১৯৮৪ সালের ১০ মে তিনি বিএনপি'র চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন এবং এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

১৯৮৩ সাল থেকে স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি রাজপথে জনতার কাতারে নেমে এসে নেতৃত্ব দেন। তার নেতৃত্বে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনসমূহ এরশাদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। নব্বই দশকের সেই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অনেকেই সমঝে চলার নীতি গ্রহণ করলেও বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি স্বৈরাচার পতন আন্দোলনে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে কোন আপস করেন নি। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষ তাকে 'আপসহীন নেত্রী' উপাধিতে ভূষিত করলো। একাধিকবার তিনি স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের রোষাণলে পড়েন। তাকে মোট চারবার—১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৪ সালের ৩ মে এবং ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বর আটক করা হয়। ১৯৮৭ সালে হোটেল পূর্বাণী থেকে আটক করে আরো কয়েকজন নেতাসহ তাকে মতিঝিল থানায় নেয়া হয়। তবে সে সময় পুলিশ তাকে জেলে পাঠায়নি। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় তাকে এক প্রকার গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু তিনি দমে যাননি। সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বারবার দীপ্তি ছড়িয়েছেন। অতঃপর দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে ৯০-এর ছাত্রজনতার প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরাচার এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। জনগণের মুক্তির জন্য আপসহীন সংগ্রামী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের রায়ে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ শপথ গ্রহণ করেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। এরপর ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার নেতৃত্বে বিএনপি আরো দুইবার বিজয়লাভ করে। ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর তিনি তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্রের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বেগম খালেদা জিয়ার সংগ্রাম আজোবধি অব্যাহত রয়েছে। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের মতই আধিপত্যবাদী ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি বারবার তার উপর খড়গহস্ত হয়েছে। ২০০৭ সালের ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী সময়েও তাকে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হয়েছে। রাজনীতি থেকে তাকে মাইনাস করে দেয়ার এক নীলনকশা প্রস্তুত করেছিল এক-এগারোর অবৈধ সরকার। নানারূপ হুমকি-ধমকি, প্রলোভন দেখিয়েও তাকে দেশছাড়া করা সম্ভব হয় নি। এদেশের মানুষের সাথেই তিনি নিজের ভাগ্যকে মিলিয়ে নিয়েছেন। বর্তমানে প্রবীণ অবস্থায় এসেও অবরুদ্ধ গণতন্ত্রের মুক্তির পক্ষে কথা বলার কারণে তাকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় কারাবন্দি থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি হার মানেননি; আধিপত্যবাদি শক্তির আগুনসদৃশ লালচোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি গণতন্ত্রের, জাতীয় ঐক্যের, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন। ২০১৭ সালে বকশিবাজারের বিশেষ আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, 'এদেশের গতি প্রকৃতির সাথে আমার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে।' ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাবরণের আগের দিন তিনি এক বার্তায় বলেন, 'কম বয়সে স্বামীকে হারিয়েছি। দেশেরর জন্য জিয়াউর রহমান জীবন দিয়েছেন। কারাগারে থাকতে আমি আমার মাকে হারিয়েছি। অফিসে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় একটি সন্তান হারিয়েছি। আরেকটি সন্তান দূরদেশে চিকিৎসাধীন। আমার স্বজনহীন জীবনে দেশবাসীই আমার স্বজন। আমি যেমন থাকি, যেখানেই থাকি, যতক্ষণ বেঁচে থাকবো দেশবাসীকে ছেড়ে যাবো না।' প্রকৃত অর্থেই তিনি এ দেশের দেশপ্রেমিক আপামর জনতার আস্থা ও বিশ্বাসের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। ১৯৯১ সালে আধিপত্যবাদি শক্তির দোসরদের বিপরীতে সগর্বে মাথা উঁচু করে বেগম খালেদা জিয়া উচ্চারণ করেছিলেন, 'ওদের হাতে গোলামীর জিঞ্জির; আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা।' এই ভয়ডরহীন আত্মমর্যাদাবোধই তাকে রাজনীতির উচ্চাসনে আসীন করেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গেঁথে দেয়া বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে একটি

সার্বভৌম মর্যাদাসম্পন্ন, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গরার যে প্রত্যয় তার মাঝে রয়েছে, তা আর কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাঝে মেলা ভার। ভুরি ভুরি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, গালগল্পের ভীড়ে বেগম জিয়ার 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'—এই একটি বাক্যই দেশ ও জনগণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির বর্ণনা দিতে যথেষ্ঠ। ২০০৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা আজোও বাংলাদেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বিপ্লবী বেগম জিয়া বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের পাশে থাকার পুরস্কারস্বরূপ তিন তিনবার এদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। জনগণ যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই তাকে নির্বাচিত করেছে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্চাসনে আসীন হয়েও তিনি জনগণের পাশেই ছিলেন। দেশ গড়ার লক্ষ্যে, ভাগ্যবিড়ম্বিত আপামর জনতার ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিজেকে ব্রত রেখেছেন। স্বাধীনতার ঘোষক ও রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের সহধর্মিনি বেগম খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে অমর করে রাখা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসমূহকে সমুজ্জ্বল রাখার লক্ষ্যে প্রভূত কাজ করেছেন। তিনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন; দুই শিশুপুত্রসহ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তিনি অবর্ণনীয় ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার রয়েছে প্রবল আবেগ। তিনি ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিরক্ষা ও স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রায়েরবাজারে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতীসৌধ নির্মাণ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদারদের হাতে নির্মমভাবে নিহত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি জাতির সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ২০০১ সালে সরকার গঠন করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা গ্রহণে সরাসরি সরকারকে সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযোদ্ধা রেদোয়ান আহমদ এ মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবিকে খুঁজে বের করে মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পদক 'বীর প্রতীক' হস্তান্তর করা হয়। তিনি পাকিস্তানে অসম্মানিত অবস্থায় পড়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাববশেষ বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালের ২৪ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

তৎকালীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ গ্রহণ করেন। অতঃপর তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দেশের মাটিতে সমাহিত করা হয়। এর আগে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে খালেদা জিয়া এক জনসভায় ঘোষণা করেন, শিগগিরই মতিউরের দেহাবশেষ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হবে। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের নামে খুলনায় একটি স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তি সরকারের আমলে এসে সেটি পরিবর্তন করে দেয়া হয়! দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা সৈনিকদের স্মৃতি রক্ষার্থে এরকম আরো স্থাপনাসমূহের নামকরণ করেন।

তিন দফায় সরকার গঠন করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেগুলো এ দেশের রাজনীতির ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা ও ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ এসবের মধ্যে অন্যতম। খালেদা জিয়ার সরকার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনায় ৬০টি সংসদীয় কমিটি গঠন করেন, যাতে বিরোধীদলীয় সাংসদদেরকে গুরুত্ব সহকারে অবস্থান দেয়া হয়।

শিক্ষাখাতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা তার সরকারের অন্যতম অবদান। তার সরকারের আমলেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন তার সরকারের আমলেই গৃহীত হয়। তিনি জিয়াউর রহমানের অর্থনীতির অনুসরণ করে প্রাইভেটাইজেশনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ব্যক্তিগত আয়কর প্রদানের হার ৫৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নিয়ে আসেন। ব্যবসায় সহজ করার লক্ষ্যে ২৭ ধরনের শুল্ক হ্রাস করে ৭ ধরনের আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করেন। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির সূচনা করেন। দেশের ভূ-ভাগের খনিজ সম্পদকে কাজে লাগাতে বড়পুকুরিয়ায় কয়লা খনি ও মধ্যপাড়ার শ্বেত পাথরের খনি থেকে উত্তোলন কার্যক্রমের সূচনা তার সরকারের আমলেই করা হয়। এছাড়াও ভোলা, বঙ্গোপসাগর ও দিনাজপুরে তার শাসনকালে নতুন প্রাকৃতিক গ্যাসের খনির সন্ধান পাওয়া যায়।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে নারীদের আত্মনির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচির অংশ হিসেবে সহজ শর্তে ঋণসেবা সহায়তায় তিনি আনসার-ভিডিপি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাস্থ্যখাতে সমস্যা ও সংকট নিরসনে তার সরকারসমূহের কার্যক্রম সুবিদিত। প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং জেলা কমপ্লেক্সকে ১০০ থেকে ২৫০ এবং ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের জন্য তার সরকার সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে টেলিকমিউনিকেশন খাতে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার সময়েই সেলুলার ফোন ও আইএসডি ফোনের সূচনা হয়; অন্তত তিন লক্ষ টেলিফোন সংযোগ চালু করা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ৩৩০টি উপজেলাকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসে। উপকূলীয় এলাকাগুলোতে এক হাজারেরও বেশি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করেন। ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বেগম খালেদা জিয়ার সরকার প্রবল গুরুত্ব দেয়। তার সরকারের আমলে এদেশে অসংখ্য মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ ও অন্যান্য উপাসনালয় নির্মাণে সরকারি তহবিল থেকে অনুদান প্রদান করা হয়। ঢাকার আশকোনায় হজ্ব যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি স্থায়ী হাজী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও তাবলীগ জামাতের বৃহৎ সম্মেলন বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে অতিরিক্ত ৩০০ একর জমির বন্দোবস্ত করে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের দৃঢ় সংগ্রাম ও রাষ্ট্র গঠনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখা এই মহিয়সী নারীর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় যখন, তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৮৪ সালে তখন আমরা আমার সিভিল সার্জন বাবার কর্মস্থল পিরোজপুরে ছিলাম। স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে তখন তিনি বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক সফর করছিলেন। এমনি এক সফরে তিনি পিরোজপুরে আসেন এবং সাবেক মন্ত্রী আফজাল সাহেবের বাসায় অবস্থান করেন। আফজাল সাহেবের বাসার ঠিক বিপরীতে ছিল আমাদের বাসা। তিনি যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন আমি তার সাদা করোলা গাড়িটির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে দেখে প্রথমে তিনি বললেন, 'এই ছেলে, সরো।' কথার স্বর না থামতেই তিনি

মায়াবি কণ্ঠে বললেন, 'কি নাম তোমার? কোন ক্লাসে পড়ো?' আমি কোন ভয় না পেয়ে উত্তর দিলাম। এরপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সে-ই ছিল আমার প্রথম কথোপকথন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের এই জীবন্ত কিংবদন্তী মাদার অব ডেমোক্রেসি খ্যাত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এখন ৭৬ বছর বয়স্কা একজন নারী। কিন্তু বরাবরের মতই এই বয়সে এসেও তাকে নানারূপ জুলুম, অবিচারের শিকার হতে হচ্ছে। শাসকশ্রেণী আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঔজ্জ্বল্য রুখতে অসংখ্য চেষ্টা করেছে; এখনো করছে। কিন্তু যে নামের অর্থই ঔজ্জ্বল্য, তার আবির্ভাবকে কি চিরতরে রুদ্ধ করা যায়! যায় নি। তিনি বারবার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। যে 'বাংলাদেশবাদ' জিয়া এই জাতিকে দিয়ে গিয়েছেন, সেই দর্শনের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তিনি আগুয়ান হয়েছেন; জীবনের ঘোরতর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থেকেও জাতিকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। জাতিও তার উপরে আস্থা রেখেছে অদ্যাবধি। এ ধারা অব্যহত থাকবেই।

লেখক : *বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সহসম্পাদক, বিএনপি ও সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*
১১ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও অর্থনীতির ভীত নির্মাণ করেন বেগম খালেদা জিয়া

মোস্তফা কামাল মজুমদার

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে যখন ম্যাডাম বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, তখন অনেকেই তা বিশ্বাস করতে পারেননি। কমনওয়েলথ-এর নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট সাংবাদিকদের সামনে পেশ করার সময় কথা উঠল বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে। তাদের দৃষ্টি পড়ল দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উপর। কে এই বিশাল ব্যক্তিত্ব যার গড়া দল এত জনপ্রিয় এবং জয়ী হলো। পর্যবেক্ষক দলের মহিলা জনসংযোগ অফিসার বললেন, এদেশের রাজনীতির কাহিনী গোলক ধাঁধার মতো। যার শুরু আছে শেষ নেই। দলনেতা বিশালদেহি মালয়েশিয়ার এমপির মন্তব্য—"জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। তবে এ পর্যন্ত যতটুকু শুনেছি তাতে মনে হয় একজন বীরের যত গুণাবলি থাকার কথা সবই তার আছে।" শহীদ জিয়া নিহত হওয়ার প্রায় দশ বছর পর খালেদা জিয়া তার দলকে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন। স্বৈরাচারবিরোধী ৯ বছরের লাগাতার আপোষহীন আন্দোলনে নেতৃত্বের মাধ্যমে খালেদা জিয়া বাংলাদেশের মানুষের মনে স্থায়ী আসন গড়ে তোলেন। শহীদ জিয়া এবং বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তাই ছিল ১৯৯১ সালে জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পেছনে প্রধান পুঁজি।

বিএনপির তখনকার মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালামের কাছ থেকে জেনেছি, ঐ নির্বাচনে দলের বাইরে থেকে অনেককে নমিনেশন দিতে

হয়েছিল। কারণ স্বৈরাচারী সরকারের আমলে বিএনপিকে আটবার ভেঙে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়। অনেক নেতাকর্মী এভাবে দল থেকে ছিটকে পড়ে। সে চক্রান্তে বিএনপির শত্রুরা সফল হয়নি। বিএনপি আরো জনপ্রিয় হয়েছে, মহীয়সী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে। স্বাধীনতার ঘোষক ও মহানায়ক জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শে ছাত্র-যুব-জনতা এতোই আপ্লুত ছিল যে একদিকে স্বৈরাচারী সরকার চারদিকে থাবা বিস্তার করতে থাকে, অন্যদিকে এক এক করে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল বিজয়ী হতে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে শুনেছি, অনেক সময় তাদের অজ্ঞাতে ছাত্ররা সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয় এবং দেশের দূর-দুরান্ত থেকে তাদের সাথে দেখা করতে আসে। এই বিপুল জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করেই রাজনীতিতে নতুন মুখ অনেকে শুধুমাত্র বিএনপির টিকেটের উপর ভর করে এমপি নির্বাচিত হন। ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রের আশেপাশে স্থাপিত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বুথগুলি নিয়ে যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা কখনো ভোলার নয়। বিএনপির বুথগুলিতে কর্মীর চেয়ে ভোটার বেশি, আর আওয়ামী লীগের বুথে কর্মী বেশি ভোটার কম।

তবে বেগম খালেদা জিয়ার আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা এমনিতে এবং একদিনে আসেনি। সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জাস্টিস আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন জারির দুই বছর পর বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির নেতৃত্বে এসে দলের হাল ধরেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর গভীরভাবে আস্থাশীল, অবাধ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একাগ্রতা, গণতন্ত্রের জন্য পরিচালিত আন্দোলনে আপষহীনতা, মানুষের উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাকে একজন সফল নেত্রী হিসেবে গড়ে উঠতে শক্তি যোগায়। দলের নেতৃত্বে আসার দুই বছরের মাথায় তার সামনে চলে আসে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোটের অধিকাংশ দল, জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ এরশাদ সরকারের অধীনে ১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচনে যোগ দেয়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দল এবং ১৫ দল থেকে বেরিয়া আসা পাঁচ দলীয় বাম জোট এই নির্বাচনের বিরোধিতা করে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন ছেড়ে নির্বাচনে অংশ

গ্রহণকারীদের জাতীয় বেইমান ঘোষণা করে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গৃহে অন্তরীণ রেখে সে নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। তবে আন্দোলনের চাপে সে নির্বাচনের ধারাবাহিকতা বেশিদিন ধরে রাখা যায়নি। এ সময় তুমুল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে হোটেল পূর্বাণী থেকে গ্রেফতার করে আবার তার গৃহে অন্তরীণ করে। জামায়াতে ইসলামীর এমপিরা যোগসাজোশের সংসদ থেকে ইস্তফা দেয়। আওয়ামী লীগ এমপিরা সংসদে থেকে যায়। রাজনৈতিক অবস্থা বেগতিক দেখে তখন রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংসদ ভেঙে দেন। পরবর্তী ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী আর যোগ দেয়নি। হাতে গোনা কিছু বিরোধী এমপিদের নিয়ে এরশাদ সরকার ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পতনের আগ পর্যন্ত এই সংসদের কার্যক্রম চালায়। বেগম খালেদা জিয়া আপষহীনভাবে গণতন্ত্রের আন্দোলন চালিয়ে না গেলে ১৯৮৬ সালের বোঝাপড়ার পার্লামেন্ট নিয়ে স্বৈরাচারী শাসন আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যেত।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর খালেদা জিয়া যে সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নেন তার কারণে দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। তখনো বিএনপির গঠনতন্ত্র রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে ছিল। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন এবং সংসদের সকল দল ও ব্যক্তিকে নিয়ে সর্বসম্মতভাবে দ্বাদশ সংশোধনী পাস করেন। এটা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক সোনালি নতুন অধ্যায়। ১৯৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েমের সময় যে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চালু হয় সে অধ্যায়ের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের পার্টিশান থেকে সে অবধি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ-এর ৫৪ বছরে কোনো সংবিধান সর্বসম্মতভাবে পাস হয়নি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, আজ যখন সংবিধান নিয়ে চলছে নানান মতদ্বৈততা তখন ১৯৯১ সালের সংবিধান জাতিকে একটা দিকনির্দেশনা দিতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের সংবিধান পাস হওয়ার আগে আওয়ামী লীগের তরফ থেকেও একটা বেসরকারি সদস্যের বিলের আকারে সংবিধান সংশোধনী বিল আনয়ন করা হয়, যা ছিল মূলত ১৯৭২ সালের সংবিধানের আপডেটেড ভার্সন। আরো অনেক সদস্য বেসরকারি সদস্যের বিলের আকারে সংশোধনী আনেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ওয়ার্কার্স পার্টির একমাত্র এমপি রাশেদ খান মেননের ৬০ দিনের ব্যবধানে সংসদের অধিবেশন ডাকার বিধান, যা গৃহীত হয়। এর আগে বিধান ছিল

বছরে অন্তত দুইটি অধিবেশন ডাকার। এখন এই সংশোধনীর কারণে নিয়ম রক্ষার জন্যও মাঝে মধ্যে স্বল্পকালীন অধিবেশন ডাকতে হয়। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর আনা কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সম্পর্কিত বেসরকারি সংশোধনী বিল বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং অন্যান্যরা কমিটি পর্যায়ে বাতিল করে দেয়। পরে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশ যখন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছিল তখন তিন বছরের মাথায় এই কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংযোজনের জন্য আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টি তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৯১ সংবিধান প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদার মানসিকতা এবং দূরদর্শিতা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে বেগম খালেদা জিয়ার অনন্য সাধারণ অবদান হলো, ভিনদেশী সাহায্যনির্ভর এবং ভঙ্গুর অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করে দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে দেয়া। ১৯৯১ সালে যখন তিনি ক্ষমতায় আসেন তখন এই দেশের উন্নয়ন বাজেট ছিল ৯৫ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। বাকি যে পাঁচ ভাগের যোগান দেয়া হতো তার আবার সিংহভাগ আসতো বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর আমদানির উপর থেকে আদায় কর আমদানি শুল্ক থেকে। এটা যারা যাচাই করতে চান তাঁরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের দেয়া ৫ম সংসদের উদ্বোধনী ভাষণ দেখে নিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কমান্ড অর্থনীতিকে সংস্কার করে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়, প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে। ফলে দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু হয়। শিল্প কারখানা অপরিকল্পিত জাতীয়করণ এবং দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনীতি তার আগে ছিল বিপর্যস্ত। সংস্কারের ফলে অনেক রুগ্ন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লোকসান থেকে রাষ্ট্র অব্যাহতি পায়। খালেদা জিয়ার আমলে দেশে মুক্ত অর্থনীতি চালু হয়। এখানে জিয়ার আমলের শুরুতে অর্থনীতিবিদ ড. এমএন হুদা ও হিসাববিজ্ঞানী সাইফুর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার পুরো শাসনামলে সাইফুর রহমানের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যখন বিনিয়োগের পরিপন্থি আইন ও বিধি তুলে দিয়ে উদ্যোক্তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়, কর বিন্যাস এবং ব্যবস্থাপনায় আনা হয় বিপ্লবী পরিবর্তন তখন অনেকে তামাশা করে তাকে বলেন জানালার সাথে দরজাও একবারে খুলে দিবেন না। খালেদা জিয়া সাইফুর রহমানকে তার

ক্ষেত্রে কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অভিজ্ঞ সাইফুর রহমান তার দায় শোধ করেন অর্থনীতিকে গড়ে তোলেন। ডেইরি এবং পোলট্রি সেক্টরে আসে বৈপ্লবিক উন্নয়ন। বাধামুক্ত হয়ে ব্যক্তি উদ্যোক্তারা আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যজনক বিনিয়োগ করে অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দেন। খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামল শেষ হয় রাজনৈতিক হট্টগোলের মাঝে। কিন্তু অর্থনীতিতে যে অসামান্য অবদান তিনি রেখে যান তা প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন ইন্ডিকেটরে। পাঁচ বছরে উন্নয়ন বাজেটে দেশজ সম্পদের পরিমাণ ১৯৯০ সালের শরকরা ৫ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৪২ ভাগে। সর্বোপরি তাঁর সরকার যমুনা সেতুর নির্মাণের ব্যাপারে সাহায্যদাতাদের অনুমোদন আদায় করে নির্মাণ কাজের শতকরা ৭০ ভাগ সমাপ্ত করে যান। তার আগের নয় বছরেও পূর্ববর্তী সরকার উক্ত সেতুর সম্ভাব্যতার ব্যাপারে দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া সৃষ্টি করতে পারেননি। উক্ত সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হয় ১৯৯৬-২০০১ সময়ে আওয়ামী লীগের শাসনামলে।

বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় অর্থনীতিকে দ্বিতীয়বার বিনির্মাণের সুযোগ পান ২০০১ সালে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর। তখনও অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থানে চলে এসেছিল। বড় বড় প্রকল্পে বেশি ব্যয় এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে আয়ের উৎস বাড়াতে না পারায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তদুপরি শেয়ার বাজার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একটা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে যদি কেউ খেয়াল করেন যে, বিচারপতি লতিফুর রহমানের কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ওয়াহিউদ্দিন মাহমুদকে দায়িত্ব দেয়া হয় পরামর্শ দিতে কীভাবে চললে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে না এবং সে সরকারের হাতে চলতি খরচের কিছু টাকা দিয়ে যাওয়া যাবে। কারণ বড় বড় প্রকল্পগুলোর অর্থ যোগান দিতে দিতে রাজকোষ খালি হয়ে যাচ্ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। এই স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ চলতিখাতে বড় প্রকল্পগুলোর কাজ স্থগিত রাখার পরামর্শ দেন। এবং সে অনুসারে তারা কাজ করে যান। সংস্থাপন বিভাগের তৎকালীন সচিব আকবর আলি খান যিনি পরবর্তীতে কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন এক মন্তব্যে বলেন, অবস্থা খুবই খারাপ। তবে সাইফুর রহমান আবার অর্থনীতির দায়িত্ব নিলে সব ঠিক করে ফেলবেন। ২০০১ সালে সংসদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন জিতে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় ফিরে

আসার পর, সাইফুর রহমান আবার অর্থনীতির দায়িত্ব পান। শুরুতেই তিনি বিভিন্ন ফাঁক ফোঁকড় দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার বন্ধের উদ্যোগ নেন এবং দ্রুত অর্থনীতিকে আবার স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসেন। শেয়ার বাজার আবার আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মুক্তবাজার অর্থনীতির সুফল বইতে শুরু করে। রপ্তানি আয় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। সেই মেয়াদান্তে অর্থনীতি একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়। আজকে বাংলাদেশের যে বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি তার ভিত্তি রচনা করে দেন বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর সরকার। দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণ এবং অর্থনীতির স্থবিরতা কাটিয়ে গতিশীলতা সৃষ্টিতে খালেদা জিয়ার অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজকে অর্থনীতির বুনিয়াদ মোটামুটি আছে, তবে বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে গেছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার স্থান করে নিয়েছে সিন্ডিকেট। শেয়ার বাজার আবার কয়েক দফা লুট হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকলে অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। গণতন্ত্র এখন নিয়ন্ত্রিত। সরকারি দল ও তার সহযোগিরা ছাড়া কেউ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ভোগ করে না। সংবাদপত্র তথা সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। দেশে অনেক সংবাদ মাধ্যম থাকলেও কেউ স্বাধীনভাবে সরকার এবং তার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে পারে না। ভিন্ন মতাবলম্বি অনেক সংবাদ মাধ্যম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে কয়টা অবশিষ্ট আছে সেগুলো সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত। দেশে বাক-স্বাধীনতা নেই। মানুষ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। ভাবতে অবাক লাগে এই গণতন্ত্রের জন্যই এদেশের মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল।

লেখক : ইংরেজি অনলাইন দৈনিক গ্রীনওয়াচ ঢাকা পত্রিকার সম্পাদক

প্রসঙ্গ : বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ

সৈয়দ আবদাল আহমদ

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসনের অবসানের পর বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। 'দেশনেত্রী' ও 'আপসহীন' নেত্রী বিশেষণে দেশে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। সেই তিনি দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের ইতিহাসের এটি অবিচ্ছেদ্দ অংশ, যা মুছে ফেলা যাবে না।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের কথা। ওই সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি নিয়ম চালু ছিল, মাসে একটি বা দুটি 'মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত বিশেষ সভা' হতো। মন্ত্রণালয়ের নানা প্রকল্পের ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ নেয়াই ছিল সভার লক্ষ্য। এতে সিনিয়র মন্ত্রী ও সচিবরা উপস্থিত থাকতেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস শাখায় দায়িত্ব থাকায় ওই সভায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতাম। কোনো সভায় প্রেস সচিবও থাকতেন।

একদিন এমনই একটি সভা চলছিল ত্রাণ মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত। মন্ত্রী-সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে তৎকালীন একান্ত সচিব সাবিহ উদ্দিন আহমেদ এবং আমারও উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়। সভা শুরু হলো। বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন, কাবিখা, খাল খনন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। মানুষের কল্যাণের সাথে জড়িত প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই অনুমোদন করে দেয়া হলো। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকেও দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে দ্রুত টাকা

ছাড় করার কথা বলছেন। আলোচনার একপর্যায়ে তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদ একটি বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করে বললেন, "ম্যাডাম এ সময় তো 'কামলা' পাওয়া যায় না"। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তৎক্ষণাৎ মাইক্রোফোন অন করে বললেন, "আজাদ আপনি এটা কী শব্দ বললেন? তারা ঘাম ঝরিয়ে কাজ করেন। তাদের 'শ্রমজীবী মানুষ' বলতে অসুবিধাটা কোথায়? 'কামলা' তো গালাগাল অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রতিমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন এর পর থেকে শব্দটি আর তিনি ব্যবহার করবেন না। এই হলেন খালেদা জিয়া।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে যোগ দেয়ার পর প্রেস সচিব হিসেবে তৎকালীন পিআইও আবদুস সোবহান ভাইকে পাই। তার আগে প্রেস সচিবের কক্ষে বসতেন সাংবাদিক সম্পাদক তোয়াব খান। তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রেস সচিব ছিলেন। সোবহান ভাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রেস সচিব হিসেবে এ কক্ষে বসার পর আমরা তার টেবিলের ড্রয়ারে আগের আমলের কিছু আছে কি না দেখছিলাম। একটি ড্রয়ারে পেলাম অনেকগুলো লেখা প্যাডের কাগজ। রাষ্ট্রপতির অফিসের প্যাডের কাগজ। এতে প্রাপ্তি স্বীকার স্বাক্ষর করা। এরশাদের কাছ যারা অর্থ নিয়েছিলেন তার প্রাপ্তি স্বীকার। আমরা বেশ মজা পেলাম।

এদের মধ্যে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক এবং অন্যান্য পেশার ব্যক্তি রয়েছেন। টাকার পরিমাণ খুব একটা বেশি না। পঁচিশ, পঞ্চাশ হাজার, এক লাখের মতো। অবশ্য ১৯৯১ সালের আগে এ পরিমাণ টাকা একেবারে কমও না। যাই হোক, আমরা কাগজগুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাই। বেগম খালেদা জিয়ার কক্ষে তাকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রগুলো দেয়ার পর তিনি এক এক করে সেগুলো দেখলেন। আমরা তার সামনে চেয়ারে বসা। দেখা শেষ হয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বললেন, 'সোবহান সাহেব, এগুলো পুড়িয়ে ফেলুন। এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।' আমি বললাম, ম্যাডাম প্রেসে দিলে তো মানুষ জানতে পারতেন। তিনি আমাকে অনেকটা ধমকের সুরেই বললেন, 'এরশাদ সাহেব যে টাকা বিলাতেন সেটি তো সবাই জানেন। তা ছাড়া তার তো পতন হয়েছে, জনগণ তাকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। আর প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে যাদের নাম দেখছি তারা তো আমাদের দেশের সৃজনশীল ও গুণী মানুষ।

হয়তো একান্ত প্রয়োজনেই টাকা নিয়েছেন। প্রেসে গেলে তাদের সুনাম ও মর্যাদা নষ্ট হবে না? কেন আমরা তা করব? এই হলেন খালেদা জিয়া।

১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চের ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার শেষ কার্য দিবস। কিছুক্ষণ পরই তিনি বঙ্গভবনে যাবেন রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দিতে। প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ থেকে বের হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তার মনে হলো 'রাজারবাগ-শহিদবাগ মোড়ে' নিহত একজন পুলিশ কর্মকর্তার পরিবারকে প্রতিশ্রুত অর্থ সহযোগিতা করা হয়নি। তিনি তৎকালীন সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীকে ডাকলেন। ফাইল আনিয়ে সেই অর্থ সহযোগিতার নোটে স্বাক্ষর করে বললেন, 'আমি বঙ্গভবনে যাওয়ার আগেই যেন নিহতের পরিবার টাকার চেক পায়।' এই হলেন খালেদা জিয়া।

বেগম খালেদা জিয়া আজ ভীষণ অসুস্থ। তিনি ৭৫ বছর পার করে এখন বার্ধক্যে উপনীত। দেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দু'বার। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কখনো হারেননি। সব সময়ই রেকর্ডসংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের মানুষ এখনো তাকে অসম্ভব ভালোবাসেন। প্রতিটি দুর্যোগে তিনি ছুটে গেছেন দুর্গত মানুষের পাশে। দুই হাতে সহযোগিতা করেছেন। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরিতে, শিক্ষার বিস্তারে, মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করেত হাঁস-মুরগির খামার, গরু-ছাগলের খামার, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতিতে নিয়োজিত করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প নিয়ে তা অনুমোদন করে দিয়েছেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন তিনি। স্বামী জিয়াউর রহমান যখন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে একাত্তরে বন্দিশিবিরে তিনি। স্বামী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর জনগণের চাওয়াকে প্রাধান্য দিয়েই গৃহবধূ থেকে রাজনীতি আসেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সাথে নিয়ে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেন। নব্বইয়ের স্বৈরশাসনের পতনের পর দেশে আবার গণতন্ত্র ফিরে আসে। তিনিই সংসদে বিল এনে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতর চট্টগ্রামে সরিয়ে নিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ একটানা তদারকি করে মানুষকে আবার উঠে দাঁড়াতে সহযোগিতা করেন। সফলভাবে এ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন—তৎকালীন বাংলাদেশে আসা মার্কিন

টাস্কফোর্সের প্রধান জেনারেল স্ট্যাকপল। ভয়েস অব আমেরিকাকে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের (সিনিয়র) নির্দেশে আমরা ত্রাণ কাজ চালাতে গিয়েছিলাম। আমাদের এক মাসের অভিজ্ঞতা চমৎকার। ত্রাণসামগ্রী যাদের জন্য এসেছে, তারাই পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দৃঢ় মনোভাব ও কঠোরতার প্রশংসা করি। তিনি কোনো ত্রাণসামগ্রী অপচয় হতে দেননি। দুর্নীতি হয়নি, লুটপাটের প্রশ্নই ওঠে না। তার সাথে কাজ করতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে বিরোধী দলের দাবি মেনে নিয়ে সংসদে তিনিই বিল পাস করে দিয়েছিলেন। এর আগে স্যার নিনিয়ান যে ফর্মুলা দিয়েছিলেন, সেটিও মেনে নিয়েছিলেন। যদিও যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন করে এনেছিলেন, তারাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা এখন ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।

রাজনীতিতে বিনয় আর উদারতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার জনসভায় গুলি হয়েছিল। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে দুই নেত্রীর নেতৃত্বে শোক মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। মিছিলে সেই দিন শেখ হাসিনা আসতে পারেননি। খালেদা জিয়া এসেছিলেন। মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তেমনি ১৯৮৬ সালে বায়তুল মোকাররম থেকে দুই নেত্রীর নেতৃত্বে গণমিছিলের কর্মসূচি ছিল। সেই মিছিলেও শেখ হাসিনা আসতে আসেননি, খালেদা জিয়াই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৮৬ সালের পাতানো নির্বাচনের পর ৭ দল ও ১৫ দলের ঐক্য ভেঙে যায়। ১৯৮৮ সালে খালেদা জিয়ার কারণেই সেই ঐক্য আবার হয়। আন্দোলন ঐক্যবদ্ধভাবে চলে।

খালেদা জিয়াই শেখ হাসিনাকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে ধানমরি ৩২ নম্বরে গিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিয়েতে যোগ দিতে বেগম জিয়া এমপি হোস্টেলে গিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা ব্যস্ততার কারণেই হয়তো তাকে রিসিভ করতে পারেননি। কিন্তু তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানের বিয়েতে শেখ হাসিনা এলে বেগম জিয়া তাকে রিসিভ করেন। একসাথে খাবার খান। ছেলের বউ দেখাতে নিয়ে যান। জরুরি সরকারের সময় সাব-জেলে শেখ হাসিনার চোখের অসুখ বেড়ে

গেলে খালেদা জিয়া কোর্টে এসে তাকে চিকিৎসা করানোর আহ্বান জানান। শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার মৃত্যুর পর খালেদা জিয়া শেখ হাসিনাকে সমবেদনা জানাতে সুধা সদনে ছুটে গিয়েছিলেন। একটিমাত্র ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুলশান অফিসে গেলে তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। অবশ্য খালেদা জিয়া তখন অচেতন ছিলেন। এ ভুলের জন্য তার কর্মকর্তারা দায়ী। এই একটিমাত্র ঘটনা ছাড়া খালেদা জিয়ার বিনয়ের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি লক্ষ করা যায়নি। নারী জাগরণের নেত্রী মহীয়সী বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের রূপকার ছিলেন বেগম জিয়া। নারী উন্নয়নে এবং মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এমন একজন অসাধারণ গুণের মানুষ আজ জটিল রোগে জর্জরিত হয়ে প্রবীণ বয়সে নিদারুণ কষ্টের জীবনযাপন করছেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ১৭ জুন সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, করোনা-পরবর্তী জটিলতা ও পুরনো রোগে খালেদা জিয়া খুবই অসুস্থ। দীর্ঘ চার বছর তার কোনো চিকিৎসা হয়নি। কারাগারে অমানবিক পরিবেশে তিনি অনেক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। হার্টের সমস্যা, কিডনি সমস্যা, লিভারের সমস্যা, পুরনো আর্থ্রাইটিস—সব মিলে তিনি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। সরকার তাকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দেয়নি।

১৯ জুন রাতে খালেদা জিয়াকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বাসায় আনা হয়েছে। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক দলের প্রধান অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী সাংবাদিকদের জানান, ৫৩ দিন তিনি হাসপাতালে ছিলেন। এ সময় কতটা জটিলতার মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ধারণা ছিল না, কনফিউশন ছিল অনেক। তিনি জানান, তাকে হাসপাতালে নেয়ার পর সিটি স্ক্যানসহ সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। প্রথম দেখা যায় তার বুকে পানি এসেছে, হার্ট ফেইলিওর-সংক্রান্ত। করোনায় হার্ট ফেইলিওর হতে পারে। প্রথন তিন দিন চিকিৎসার পর কিছুটা উন্নতি হলেও জ্বরে আক্রান্ত হন আবার। বুকে আবার পানি আসে। এক দিনের মধ্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যায়। এ অবস্থায় সিসিইউতে নিয়ে গিয়ে দেখা যায় অর্ধেক বুক পানিতে ভরে গেছে। চেস্ট টিউব দিয়ে পনি বের করি। দেখা যায় পানি নয়, রক্ত। প্রায় ১৮ দিন চেস্ট টিউবে পানি নিঃসরণ করা

হয়। ভেন্টিলেটরে দিতে পরিবারের মতও ছিল। তার বুক থেকে ৭ লিটারের মতো পানি ও রক্ত বের করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় দেখেছি হার্ট ফেইলিওর, কিডনি ও লিভার সমস্যা প্রকট।

ব্লাড কালচার করে দেখেছি, হাসপাতালে যেসব জীবাণু থাকে সেগুলো আক্রমণ করছে। দুই তিন ধরে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টায় কিছু নার্স, মেডিক্যাল স্টাফ, ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছেন। মেডিক্যাল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ অবস্থায় খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে রাখাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে তাকে পাঁচ ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়েছে। অথচ খালেদা জিয়ার সারা জীবনে তাকে রক্ত দেয়ার কোনো নজির নেই।

খালেদা জিয়া এমন অসুস্থতায় বর্তমানে এক দুঃসহ, মর্মান্তিক ও অসহায় জীবন অতিবাহিত করছেন। একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী, তিন যুগেরও বেশি সময়ের দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন, মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকা পালনকারী এবং যার স্বামী একজন সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের প্রধান ছিলেন, সর্বোপরি একজন নারী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ হিসেবে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার তার রয়েছে। এটি তার মানবাধিকার। আশা করি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন নারী হয়ে বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিদেশে উন্নত চিকিৎসায় তাকে সুযোগ করে দেবেন।

লেখক : *সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব*
২২ *জুন* ২০২১

খালেদা জিয়া : মাদার অফ ডেমোক্রেসি

ড. এম মুজিবুর রহমান

বেগম খালেদা জিয়া। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ। জনগণের আশা-ভালোবাসা নিয়ে সময়ের প্রয়োজনে আশির দশকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত হয়েছিলেন। নানা অপপ্রচার আর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এখনো তিনি সারা দেশে তুমুল জনপ্রিয়। জনগণের কাছে সবচেয়ে গ্রহণীয় বরণীয়। জীবনে যতবার তিনি যত সংসদীয় আসন থেকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কখনোই কোনো নির্বাচনে তিনি হারেননি। তিনি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীক। তিনি মাদার অফ ডেমোক্রেসি।

রাজনীতিতে নিজের সম্পৃক্ততা নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শের পতাকা হাতে নিয়ে। আমার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে। আমি রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশ ও জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে একাকার করে ফেলেছি। আমার নিজের কোনো পৃথক আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই আমার আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। আমার জীবন পুরোপুরি জড়িয়ে গেছে এদেশের মানুষের স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের সঙ্গে। তাদের সুখ-দুঃখ ও উত্থান-পতনের সঙ্গে। দেশের মানুষের জীবনের চড়াই-উৎরাই ও সমস্যা-সংকটের সঙ্গে। তাদের বিজয়, বিপর্যয় এবং সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে। দেশ জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গেই একাকার হয়ে গেছে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।'

দেশ এবং জনগণের স্বার্থ নিয়ে এমন কথা একমাত্র খালেদা জিয়াকেই মানায়। কারণ বাংলাদেশ, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং জিয়া সমার্থক। অপরদিকে গণতন্ত্র, ভোটের অধিকার, আত্মমর্যাদা এবং খালেদা জিয়া সমার্থক। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান তথা জিয়া পরিবার এক অবিচ্ছেদ্য নাম। জিয়া পরিবারের সঙ্গে জনগণের পরিচয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। সুতরাং জিয়া পরিবার আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বর্বর হামলা চালায় পাক হানাদার বাহিনী। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ না করে শেখ মুজিবুর রহমান বরং ঢাকায় ধানমন্ডিতে নিজের বাসায় বসেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে, স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব না দিয়ে কিংবা স্বাধীনতাকামী মানুষকে কোনো দিকনির্দেশনা না দিয়েই কেন শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিলেন এ বিষয়টি শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতেই উল্লেখ রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদের লেখা, 'তাজউদ্দীন আহমেদ : নেতা ও পিতা' বইতে। তাজউদ্দীন কন্যার বর্ণনা অনুযায়ী, তাজউদ্দীন আহমেদ বারবার শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা তিনি গ্রেফতার হলে কে নেতৃত্ব দেবে এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা চেয়েছিলেন। জবাবে মুজিব বলছেন, এটা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে।'

এ প্রসঙ্গে ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার সশস্ত্র হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই হামলায় প্রথমেই প্রবল পরাক্রমশালী রাশিয়ার প্রথম টার্গেট ছিল ইউক্রেনের তরুণ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ হয়েও জনগণকে অরক্ষিত রেখে প্রতাপশালী রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ কিংবা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি জেলেনস্কি। এমনকি আমেরিকা বিশেষ বিমান পাঠিয়ে জেলেনস্কিকে ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। জবাবে জেলেনস্কি বলেছেন,

'আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করবো। কারণ, আমাদের কাছে এখন আমাদের অস্ত্রই সত্য। আমাদের ভূমি, আমাদের দেশ ও আমাদের সন্তান সত্য, এগুলোর সবকিছুকেই আমরা রক্ষা করবো, ইউক্রেনে লড়াই চলছে। সুতরাং আমার দরকার অস্ত্রশস্ত্র, চলে যাওয়ার পথ নয়।'

অপ্রিয় সত্য হলো, বাঙালির স্বাধিকারের জন্য দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম কিংবা বছরের পর বছর কারাবরণ করলেও ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর হানাদারবাহিনীর আক্রমণের সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে জনগণ জেলেনস্কির মতো সাহসী ভূমিকায় দেখতে পায়নি। বরং, ঐতিহাসিক সত্য হলো, হানাদার বাহিনীর নৃশংস হামলার মুখে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ যখন দিকনির্দেশনাহীন, এমন কঠিন সময়েই জনগণের সামনে ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান তখন চট্টগ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাক হানাদারবাহিনী স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশিদের উপর সশস্ত্র হামলা চালালে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই 'উই রিভোল্ট' বলে মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। মধ্যরাতে বাঙালি সেনা অফিসার জওয়ানদের ডেকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশনা দিলেন। নির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, চট্টগ্রামে তাঁর নেতৃত্বাধীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার, সিপাহী এবং স্বাধীনতাকামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতা ঘোষণার সেই স্মরণীয় মুহূর্তটির কথা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিজের লেখা একটি নিবন্ধেও উল্লেখ রয়েছে। 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে স্বাধীনতার ঘোষকের লেখা নিবন্ধটি ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন সরকারি মালিকানাধীন 'দৈনিক বাংলা' এবং পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রায়'ও প্রকাশিত হয়।

'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধটির শেষ কয়েকটি লাইনে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া লিখেন, '...সময় ছিল অতি মূল্যবান।

আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম, তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।' তিনি আরও লিখেন, 'তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্তের আঁখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন।

বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখবে, ভালোবাসায়। এই দিনটিকে তারা কোনো দিন ভুলবে না। কোনো-দি-ন-না।'

এরপর স্বাধীনতার ঘোষণাটি মেজর জিয়াউর রহমান যথানিয়মে নিজেই লিখে পরদিন ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। রেডিওর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সময় তিনি নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান উল্লেখ করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এভাবেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার নিয়ম। স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্ব দরবারে গুরুত্ব পেতে হলে সেই ঘোষণায় একটি স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী সরকার থাকবে, স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী সরকারপ্রধান থাকবেন, যুদ্ধের একজন নেতা থাকবেন, এটাই নিয়ম। জিয়াউর রহমানের দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণায় এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে প্রথমে অস্থায়ী সরকারপ্রধান হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন সেই যুক্তিতে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাকে যাতে পাকিস্তানিরা স্রেফ সেনা বিদ্রোহ হিসেবে উল্লেখ করে বিশ্ব সমাজকে বিভ্রান্ত করতে না পারে এ কারণে জিয়াউর রহমান পরবর্তী ঘোষণায় তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামও উল্লেখ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মেজর জিয়া ছিলেন চট্টগ্রামের ষোলশহরে অবস্থিত ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক। অধিনায়ক ছিলেন একজন পাকিস্তানি কর্মকর্তা। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবাঙালি অধিনায়ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষমান এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য পাঠায়। অথচ এই এমভি সোয়াত জাহাজ প্রায় সাত হাজার টন অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে ২ মার্চ থেকেই চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাসের জন্য মেজর জিয়াকে পাঠানোর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না। হানাদারদের উদ্দেশ্য ছিল মেজর জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে কৌশলে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া। কারণ জিয়াউর রহমানের যুদ্ধকৌশল, সাহস ও দক্ষতা সম্পর্কে

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল সম্যক অবগত। ফলে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে হানাদারবাহিনী ছিল অত্যন্ত সতর্ক।

কিন্তু কথায় বলে রাখে আল্লাহ মারে কে? অস্ত্র খালাস করার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে রওয়ানা দেয়ার পর পথিমধ্যেই স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর পাক হানাদারবাহিনীর আক্রমণের খবর পান মেজর জিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই আর্মি জিপ থেকে নেমে পড়েন মেজর জিয়া। 'উই রিভোল্ট' বলেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সঙ্গে থাকা পাকসেনা সদস্য ও কর্মকর্তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করেন।

এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের নামে মেজর জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সুকৌশলে বের করে দিয়ে অবাঙালি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সোহরাব হোসেনসহ বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছিল। পরিস্থিতি টের পেয়ে সাহসী ভূমিকা রাখেন বেগম জিয়া। তিনিই তখন বাঙালি সেনাদের দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "তোমরা অস্ত্র সমর্পণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জিয়াউর রহমান ফিরে আসেন।" স্বাধীনতার ঘোষক জিয়ার সঙ্গে এভাবে শুরু থেকেই খালেদা জিয়াও জড়িয়ে যান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে।

এ কারণে খালেদা জিয়াকেই বলা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা।

সন্তান সংসার ফেলে রেখে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া, এদিকে ছোট্ট দুই শিশু পুত্র তারেক রহমান পিনো আর আরাফাত রহমান কোকো... এই দুই শিশু সন্তান নিয়ে খালেদা জিয়ার সামনে তখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তিনি কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। একপর্যায়ে ১৯৭১ সালের ১৬ মে খুবই সতর্কতার সঙ্গে নৌপথে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছান। এরপর বড়বোন খুরশিদ জাহানের কাছে ১৭ জুন পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিলেন। তবে স্বাধীনতার ঘোষকের পরিবারের খোঁজে ব্যাপক সন্ধান চালাতে থাকে পাকহানাদার বাহিনী। ফলে কোথাও এক জায়গায় বেশিদিন থাকা খালেদা জিয়ার জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠেছিল। বেশিদিন নিরাপদে থাকতে পারেননি স্বাধীনতার ঘোষকের সহধর্মিণী খালেদা জিয়া। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই এস কে আব্দুল্লাহর ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাসভবন থেকে দুই শিশুপুত্রসহ খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে পাক হানাদারবাহিনী। এরপর দুই শিশু পুত্রসহ ১৯৭১

সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবস পর্যন্ত পাক হানাদারদের কারাগারে বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দি জীবন কাটাতে হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় খালেদা জিয়া বন্দি ছিলেন পাক হানাদারবাহিনীর কারাগারে আর বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে খালেদা জিয়া বন্দি আওয়ামী হানাদার বাহিনীর প্রতিহিংসার কারাগারে। ১৯৭১ সালে খালেদা জিয়ার একমাত্র অপরাধ ছিল, তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে সম্মুখসমরে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আর বর্তমানে আওয়ামী হানাদারবাহিনী তাকে বন্দি করে রেখেছে কারণ তিনি খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের কণ্ঠস্বর। খালেদা জিয়া দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীক। খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রাখা গেলে জনগণকে বন্দি করে রাখা যায়। খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রাখা গেলে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করে রাখা যায়। তাকে চার দেয়ালে বন্দি করে রাখা হলেও বাস্তবতা হলো, বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের পরাধীন জনগণ আর দেশের জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রকামী জনগণের রাজনৈতিক শক্তি ও সাহসের উৎস্য মাদার অফ ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া।

খালেদা জিয়ার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব আর অবিচল নেতৃত্বের কাছে বরাবরই ম্লান নিশিরাতের সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা। যে আদালতের দোহাই দিয়ে খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেই আদালতই ২০০০ সালে শেখ হাসিনাকে 'রং হেডেড' বলে উল্লেখ করেছিল। আদালতের রায় মানলে রং হেডেড শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বেই থাকতে পারেন না। অথচ, বন্দুকের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পরাস্ত করতে ষড়যন্ত্র আর অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। মিথ্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দিয়ে খালেদা জিয়ার ইমেজ ধ্বংসের অপচেষ্টায় লিপ্ত শেখ হাসিনা।

তথ্যপ্রমাণ বলছে, ষড়যন্ত্রের পথ ধরে মইন-ফখরুদ্দীনের কাঁধে ভর করে ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতা দখল করেন তখন শেখ হাসিনার নামে ১৫টি মামলা ছিল। এসব মামলা কাঁধে নিয়েই মইন-ফখরুদ্দীনের সঙ্গে আঁতাত করে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে দলীয় বিচারপতিদের

দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিটি মামলা থেকে খালাস নিয়ে নেন। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে থাকা ১৫টি মামলার মধ্যে ৯টি মামলা দায়ের করেছিল তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো বর্তমানে দুদক। এ ছাড়াও মইন-ফখরুদ্দীন সরকারের অনিয়মতান্ত্রিক সরকারের আমলে একটি খুনের মামলাসহ আরো ৬টি মামলা ছিল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। ক্ষমতা দখল করেই শেখ হাসিনা প্রভাব খাটিয়ে নিজের নামে থাকা ১৫টি মামলার ৬টি রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করে নেয় আর হাইকোর্টের মাধ্যমে বাতিল করিয়ে নেয় বাকি আরো ৯টি মামলা।

এসব মামলার বিবরণে দেখা যায়, ২০১০ সালের ৩ মার্চ থেকে শুরু করে ৩০ মে পর্যন্ত মাত্র তিন মাসেই ৯টি দুর্নীতি মামলা বাতিল করে হাইকোর্টের বিশেষ দুটি বেঞ্চ। এই দুটি বিশেষ বেঞ্চের একটি বেঞ্চের বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি মো. শামসুল হুদা ও বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকী এবং অপর বেঞ্চের বিচারপতি ছিলেন এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক এবং বিচারপতি বোরহান উদ্দিন। এই দুই বেঞ্চের দুই সিনিয়র বিচারপতি ছিলেন যথাক্রমে শামসুল হুদা ও শামসুদ্দিন। এই দুই সিনিয়র বিচারপতি সরাসরি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিচারপতি শামসুল হুদার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলায়। শামসুল হুদা প্রায় ১৯ বছর যথাক্রমে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একবার উপজেলা নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অপরদিকে যুক্তরাজ্যের নাগরিক শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ২০১৫ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম মেয়াদের ক্ষমতা আসার পর ক্ষমতা ছাড়ার মাত্র পাঁচ মাস আগে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ শামসুল হুদা এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরীকে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে যায়। সংবিধান অনুযায়ী অস্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের দুই বছর পর বিচারপতি হিসেবে স্থায়ী নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। রাষ্ট্রপতি চাইলে বিচারপতি হিসেবে কারো চাকরি স্থায়ী করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। সেই ক্ষমতা বলে ২০০৩ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয়

জোট সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি দুই আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হুদা ও শামসুদ্দিনের নিয়োগ বিচারপতি হিসেবে স্থায়ী করেনি।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হলে এই দুই আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হুদা ও শামসুদ্দিনের ভাগ্য খুলে যায়। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে ২০০৯ সালের ২২ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হুদা ও শামসুদ্দিন পুনর্বহাল হয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে স্থায়ী নিয়োগ নেন। হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে স্থায়ী নিয়োগের কয়েক মাসের মধ্যেই এই দুই বিচারপতির বেঞ্চেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে থাকা ৯ মামলা বাতিল করে দেয়। বিচারপতি শামসুল হুদার বেঞ্চ মাত্র তিন মাসের মধ্যেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা ৫টি মামলা বাতিল করে দেয়। এই পাঁচটি মামলা হলো—ফ্রিগেট (যুদ্ধজাহাজ) ক্রয় দুর্নীতি মামলা, মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্নীতি মামলা, নাইকো দুর্নীতি মামলা এবং ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্নীতি মামলা এবং বেপজায় পরামর্শক নিয়োগের মামলা। ঠিক একই সময়ের মধ্যে হাইকোর্টের অপর বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকও মাত্র তিন মাসের মধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির চারটি মামলা বাতিল করে দিয়েছিলেন। এই চারটি মামলা হলো—নভোথিয়েটার দুর্নীতি সংক্রান্ত তিনটি মামলা এবং মিগ যুদ্ধবিমান ক্রয় দুর্নীতি মামলা।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখলেই বোঝা যায় শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার দলীয় বিচারপতিদের দিয়ে তার নিজের নামে থাকা সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আদালতকে ব্যবহার করে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাতিল করে দেয়া মামলাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

বেপজায় পরামর্শক নিয়োগে দুর্নীতি : রাষ্ট্রের ২ কোটি ১০ লাখ ১ হাজার ৬৮৮ টাকা ক্ষতিসাধনের অভিযোগে ২০০১ সালের ১১ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন ব্যুরো শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ মামলাটি দায়ের করেছিল। ২০১০ সালের ৩০ মে এই মালাটি বাতিল করে দেয় গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুল হুদার বেঞ্চ।

ফ্রিগেট ক্রয় দুর্নীতি মামলা : দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পুরাতন যুদ্ধজাহাজ ক্রয় করে রাষ্ট্রের ৪৪৭ কোটি টাকার ক্ষতি করার অভিযোগে ২০০২ সালের ৭ আগস্ট শেখ হাসিনাসহ ৫ জনকে আসামি

করে মামলাটি দায়ের করেছিল দুর্নীতি দমন ব্যুরো। ২০১০ সালের ১৮ মে হাইকোর্টে এই মামলাটি বাতিল করে দেন গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুল হুদার বেঞ্চ।

মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্নীতি মামলা : অবৈধভাবে কাজ দিয়ে রাষ্ট্রের ১৭ কোটি ৮৯ লাখ টাকা ক্ষতি করার অভিযোগে ২০০১ সালের ১১ ডিসেম্বর মামলা দায়ের করে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল এই দুর্নীতির মামলাটি খারিজ করে গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুল হুদার বেঞ্চ।

খুলনায় ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা : বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নামে তিন কোটি টাকা চাঁদা নিয়ে খুলনায় ভাসমান বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দরদাতাকে কাজ দেয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তেজগাঁও থানায় মামলা করে মইন-ফখরুদ্দীন আমলের দুদক। এই চাঁদাবাজি মামলায় ২০০৮ সালের ১৮ মে অভিযোগ গঠনের পর বিশেষ জজ আদালতে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছিল। ২০১০ সালের ১৩ এপ্রিল এ মামলাটি বাতিল করে দেয় গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুল হুদার বেঞ্চ।

নাইকো দুর্নীতি মামলা : রাষ্ট্রের ১৩ হাজার ৬৩০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ক্ষতি করার অভিযোগে মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দীন সরকারের সময় ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে এ মামলাটি দায়ের করেছিল দুদক। ২০১০ সালের ১১ মার্চ এ মামলাটি বাতিল করে দেয় গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুল হুদার বেঞ্চ।

৮টি মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় দুর্নীতি মামলা : নীতিমালা লঙ্ঘন করে রাশিয়া থেকে ৮টি মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় করে রাষ্ট্রের প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ক্ষতিসাধন করার অভিযোগে ২০০১ সালের ১১ ডিসেম্বর এ মামলাটি দায়ের করে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। এ মামলায় ২০০৮ সালের ২০ আগস্ট শেখ হাসিনাসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে আদালত। এ মামলার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার দায়ের করা একটি কোয়াশমেন্ট আবেদন আদালত খারিজ করে দিয়ে বলা হয় এই মামলাটি নিম্ন আদালতে চলতে পারে। প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির ফুল আপিলেট ডিভিশন এই রায় দেয়। ফলে বিশেষ জজ আদালতে মামলার কার্যক্রম শুরু

হয়। অথচ ২০১০ সালের ৯ মার্চ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয়ে দুর্নীতি মামলাটি বাতিল করে দেয় যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বেঞ্চ।

বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার নির্মাণ দুর্নীতি মামলা : মওলানা ভাসানীর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার নির্মাণ প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগে দুর্নীতি, অবৈধভাবে ব্যয় বৃদ্ধি করে রাষ্ট্রের ৫২ কোটি টাকা ক্ষতিসাধন করার অভিযোগে ২০০২ সালের ২৭ মার্চ তেজগাঁও থানায় তিনটি মামলা দায়ের করে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। ২০১০ সালের ৪ মার্চ তিনটি মামলা বাতিল করে দেন যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বেঞ্চ।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে শেখ হাসিনা নিজের নামে থাকা ১৫টি মামলা প্রত্যাহার করে নিলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দায়ের হওয়া মামলার বিচার কার্যক্রম চালাতে থাকে। মইন-ফখরুদ্দীন আমলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের ৩ জুলাই রমনা থানায় দায়ের করা হয় তথাকথিত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা। দুদক খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুই কোটি ১০ লাখ ৭১ হাজার ৬৭১ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনে মামলাটি দায়ের করে। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে অথচ বাস্তবতা হলো সেই টাকা এখনো ট্রাস্টের নামে ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে এবং ইতোমধ্যেই সেই টাকা সুদে-আসলে বেড়ে ৬ কোটি টাকার বেশি হয়েছে। তারপরও শেখ হাসিনা ক্ষমতার লোভে এবং স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে এ মামলায় ফাঁসিয়েছেন। তবে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি যে ষড়যন্ত্রমূলক, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এটি তথ্য প্রমাণসহ বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী আদালতের আওয়ামী বিচারকের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। আদালতে দেয়া খালেদা জিয়ার তথ্যবহুল বক্তব্যটি আগামী দিনের বাংলাদেশে গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিক মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে।

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার নির্দেশে চালানো মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা এবং এই বানোয়াট মামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ২০১৮ সালের

ফেব্রুয়ারি মাসে আদালতে যা বলেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। খালেদা জিয়ার বক্তব্যটি ইতিহাসের স্বার্থে হুবহু তুলে ধরছি :

মাননীয় আদালত, আসসালামু আলাইকুম।
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা স্মরণ করে আমার কথা শুরু করছি। এদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছিল আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য।

শহীদ জিয়াউর রহমান সেইসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সেই সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ অকাতরে জীবন দিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে।

স্বাধীনতার সেইসব লক্ষ্য আজ পদদলিত।

সারা জাতি আজ লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত।

সমগ্র বাংলাদেশকেই আজ এক বিশাল কারাগার বানানো হয়েছে।

সবখানেই চলছে অস্থিরতা ও গভীর অনিরাপত্তাবোধ।

মিথ্যা ও সাজানো মামলায় বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মী এই মুহূর্তে কারাগারে বন্দী।

বিএনপি'র প্রায় ৭৫ হাজার নেতা-কর্মী বিভিন্ন মেয়াদে কারা-নির্যাতন ভোগ করেছেন।

আমাদের দলের ৪ লাখের বেশি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ২৫ হাজারের মতো মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নির্যাতন, হয়রানি ও গ্রেফতারের ভয়ে বহু নেতা-কর্মী বাড়ি-ঘরে থাকতে পারেন না। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

গুম, খুন, অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বিরোধী দলের অসংখ্য নেতা-কর্মী। তাদের ঘরে ঘরে আজ কান্নার রোল।

এখন সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বড় বেশি বলা হয়। কিন্তু কোথায় আজ সাংবিধানিক শাসন?

আমাদের সংবিধান নাগরিকদেরকে যে-সব অধিকার দিয়েছে, কোথায় আজ সে-সব অধিকার?

কোথায় আজ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার?

মাননীয় আদালত,

শহীদ জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নিয়ে বর্তমান মামলায় আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমি শুনেছি।

আমি জেনেছি মামলার সাক্ষীদের দেয়া বক্তব্য। সবকিছু নিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী আমি আমার জবাব ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য মাননীয় আদালতে তুলে ধরতে চাই। রাষ্ট্রক্ষমতার অবৈধ দখলদাররা চায়নি আমি রাজনীতিতে থাকি। আমি রাজনীতি না করলে তারা আমাকে অনেক বেশি সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছিল। রাজনীতি করলে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে বলে আমাকে ভয়-ভীতিও দেখানো হয়েছিল। সবকিছু উপেক্ষা করে আমি রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখি।

কারণ, দেশে তখন গণতন্ত্র ছিল না। জনগণের নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়া হয়েছিল। জনগণের অধিকার ছিল না।

গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু থেকেই আমাকে রাজপথে নামতে হয়েছিল।

আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শের পতাকা হাতে নিয়ে। আমার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে।

আমি সব সময় চেয়েছি, বাংলাদেশ যেন গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয়। মানুষের যেন অধিকার থাকে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে।

আমি চেয়েছি, আমাদের অর্থনীতি যেন শক্তিশালী হয়। বিশ্বসভায় বাংলাদেশ মর্যাদার আসন পায়। সেই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্যই আমার রাজনীতি।

আমি রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশ ও জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে একাকার করে ফেলেছি।

আমার নিজের কোনো পৃথক আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই আমার আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে।

আমার জীবন পুরোপুরি জড়িয়ে গেছে এদেশের মানুষের স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের সঙ্গে। তাদের সুখ-দুঃখ ও উত্থান-পতনের সঙ্গে। দেশের মানুষের জীবনের চড়াই-উৎরাই ও সমস্যা-সংকটের সঙ্গে। তাদের বিজয়, বিপর্যয় এবং সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে। দেশজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গেই একাকার

হয়ে গেছে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

সম্ভবত সে কারণেই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং এ দেশের মানুষ যখনই দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের মুখে পড়েছে, তখন আমিও দুর্যোগের মুখে পড়েছি।

দেশজাতি যখন সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে, অধিকার হারিয়েছে, বিপন্ন হয়েছে তখন আমিও নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছি। আমার পরিবারও পড়েছে নানামুখী সমস্যা-সংকটে।

একইভাবে দেশজাতি যখন বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে, জনগণ যখন বিজয়ী হয়েছে, তাদের হারানো অধিকার ফিরে পেয়েছে তখন আমার নাগরিক অধিকারগুলোও সমুন্নত থেকেছে।

জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা যখন সমুন্নত হয়েছে, আইনের শাসন-সুবিচার-গণতন্ত্র ফিরে এসেছে, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমিও সংকট, বিপদ, আক্রমণ, নির্যাতন ও বিপর্যয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছি।

বারবারই প্রমাণ হয়েছে যে, বাংলাদেশ ও এদেশের জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে আমার নিজের ও আমার পরিবারের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে।

মাননীয় আদালত,

আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমার বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হচ্ছে। জারি করা হচ্ছে গ্রেফতারী পরোয়ানা।

প্রায় চার দশকের স্মৃতিবিজড়িত বসতবাড়ি থেকে আমাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আমাকে আমার গুলশানের বাসা ও রাজনৈতিক কার্যালয়ে বালির ট্রাক দিয়ে কয়েক দফায় দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখা হয়েছে।

আমি আমার অফিসে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় সে সময় বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

সেই অবরুদ্ধ অবস্থাতেই আমি মৃত্যু-সংবাদ পাই বিদেশে চিকিৎসাধীন আমার একটি সন্তানের।

আর সেদিনই আমার এবং আমার সঙ্গে অবরুদ্ধদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বানোয়াট একটি মামলা দায়ের করা হয়।

অভিযোগ করা হয়, রাস্তায় গাড়ি পোড়ানো এবং বিস্ফোরক দিয়ে মানুষ হত্যার। অফিসে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায়ই নাকি আমরা এসব করেছি।

এগুলো কি কোনো সভ্য ও মানবিক আচরণ?

মাননীয় আদালত,

আপনি দেখেছেন, শাসক মহলের নির্দেশে আমার স্বাধীন চলাচল বিভিন্নভাবে ব্যাহত করা হয়েছে।

প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে আমার ওপর বারবার হামলার ঘটনা সারা বিশ্ব দেখেছে। আমার ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালানো হয়েছে। আমার গাড়ির ওপর গুলি চালানো হয়েছে।

আমার গাড়ি বহরে সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মী ও নিরাপত্তা রক্ষীরা তাতে আহত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা কেউ আটক হয়নি। কোনো ঘটনার বিচার হয়নি আজ পর্যন্ত।

আমার নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়েছে বারবার।

আমার বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে অসত্য ও কুৎসিত অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

এর কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং এদেশের জনগণের বর্তমান সার্বিক দুর্দশার সঙ্গে আমার এসব হেনস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলেই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাই, মাননীয় আদালত, আমি যত সামান্য মানুষই হই না কেন, আমার প্রতি বর্তমান শাসক মহলের আচরণের কারণ, পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের ব্যাপ্তি কিন্তু সামান্য নয়। দেশজাতির দুর্দশা থেকে এটিকে আলাদা করে দেখা যাবে না।

কাজেই আলোচ্য মামলাটি দায়ের এবং এর সকল কার্যক্রম ও পরিণতি কেবল ফৌজদারী বিধিবিধান, আইন-কানুন ও বিচার-ব্যবস্থার মধ্যেই সীমিত নয়। পুরো বিষয়গুলো ব্যাখ্যা না করলে কেবল আইনগত খুঁটিনাটি দিক তুলে ধরে এই মামলাটির সঠিক চিত্র বিশদ ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই মাননীয় আদালত, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আমার কথাগুলো একটু শুনবেন। আমাকে সময় দেবেন, যাতে আমি আমার সব কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারি।

যাতে আমি পুরো প্রেক্ষাপট ও পটভূমি তুলে ধরতে পারি। দেশের যে পরিস্থিতি, জাতির যে অবস্থা এবং ইতিহাসের যে ধারাক্রম আজকে এ ধরনের মামলা সৃষ্টি করেছে সে কথাগুলো আমাকে বলতেই হবে। না হলে আমার বক্তব্য ও জবাব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যে কথাগুলো না বললে সব কিছু স্পষ্ট ও পরিষ্কার হবে না, সেই কথাগুলো তো আমাকে এই সুযোগে বলতেই হবে।

মাননীয় আদালত,

দেশে এখন সত্যিকার অর্থে নির্বাচিত কোনো সংসদ ও সরকার নেই। সবকিছু একতরফা ও একদলীয় ভিত্তিতে চলছে।

যে গণতন্ত্রের জন্য মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে সেই গণতন্ত্র আজ নির্বাসিত।

যে তথাকথিত সংসদ গঠন করা হয়েছে, সেই সংসদের বেশিরভাগ সদস্য নির্বাচিত হয়নি। বাকি সদস্যদেরকেও ভোটাররা নির্বাচিত করেননি। প্রহসনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শতকরা ৫ জন ভোটারও ভোটকেন্দ্রে হাজির হয়নি।

প্রহসনের সংসদ এবং সেই সংসদের মাধ্যমে গঠিত সরকার কখনো বৈধ হতে পারে না।

সংসদে কোনো কার্যকর বিরোধীদল পর্যন্ত নেই। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলোতে বিভিন্ন রকম কারসাজি সত্ত্বেও বিরোধী দলের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন।

সেই শোচনীয় পরাজয় দেখে ভীত হয়ে ক্ষমতাসীনেরা আর কোনো ঝুঁকি নেয়ার সাহস পায়নি। এরপর থেকে তারা পৌরসভা এমনকি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলো পর্যন্ত দখল ও যুদ্ধে পরিণত করেছে। বিরোধী দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তারা মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ ও অপসারণ করছে।

জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে আমরা যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলাম সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একতরফাভাবে বাতিল করা হয়েছে। সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে এক গভীর সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমরা সেই সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাই। আমরা দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাই। জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বদলে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

এটাই কি আমার অপরাধ? সেই কারণেই কি এতো হেনস্তা, এতো মামলা-মোকদ্দমা আমার বিরুদ্ধে?

মাননীয় আদালত,

আপনি জানেন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও চাঁদাবাজিসহ নানান রকম মামলা বিভিন্ন সময়ে হয়েছে।

কিন্তু তার পরম সৌভাগ্য, কখনো তাকে আমার মতো আদালতে এমন করে হাজিরা দিতে হয়নি।

আমি আইন-আদালত ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন নাগরিক।

তাই এই বয়সে এতো ব্যস্ততা ও নানান সমস্যার মধ্যেও যতদূর সম্ভব আদালতে সশরীরে হাজির থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আমার নিযুক্ত আইনজীবীরা আইনানুগ পন্থায় মামলাসমূহ মোকাবিলা করে যাচ্ছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি কখনো অনিবার্য কারণে আদালতে উপস্থিত হতে না পারলে আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করার মতো ঘটনা ঘটছে।

আমার পরিচয় দেশবাসী জানে। মাননীয় আদালতেরও অজানা নয়। আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পত্নী। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান ঘোষক। তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের অন্যতম সফল অধিনায়ক।

তিনি বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান।

দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক এবং জননির্বাচিত ও নন্দিত সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তিনি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাভাষী সৈনিকদের প্রতিরোধ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ আমাকে ইতিহাস দিয়েছে। এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি সে কর্তব্য পালন করেছি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দুটি শিশু সন্তানসহ গ্রেফতার হয়ে এই রাজধানীতে আরো অনেকের সঙ্গে চরম অনিশ্চিত ও দুঃসহ বন্দীজীবন আমাকে কাটাতে হয়েছে।

আমাদের বন্দী শিবিরের ওপর বোমা বর্ষণের সময়ে আল্লাহর অসীম রহমতে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরেছি।

কেবল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নয়, এরপর আরো অনেকবারই চরম বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আজো বেঁচে আছি।

প্রায় পৌনে নয় বছর স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজপথে জনগণের কাতারে থেকে গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে আমি নিরাপোস ভূমিকা রেখেছি।

আমি এর জন্য মানুষের অপরিসীম সমর্থন ও দোয়া পেয়েছি।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আসনে জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে আমি তিন-তিনবার তাদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছি।

আমি আমার জনগণের সেবা করার চেষ্টা করেছি তাদের অর্পিত দায়িত্ব সাধ্য, সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী পালন করে।

দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেয়ার এবং মানুষকে দুর্দশামুক্ত করে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেছি।

উন্নয়নে, উৎপাদনে, শিক্ষায়, নারীশিক্ষায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং সন্ত্রাস মুক্তির অভিযানে অবদান রেখে মানুষের জন্য স্বস্তি ও সম্ভাবনার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি।

জনগণের মৌলিক মানবিক অধিকার এবং বিচার বিভাগ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি।

দেশকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার নিরলস প্রয়াসে কখনো বিরতি দেইনি।

আমি বিরোধীদলীয় নেত্রীর দায়িত্বও পালন করেছি।

মাননীয় আদালত,

আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আমি এসব কথা বলছি না। আমার এই অবস্থান, ভূমিকা ও অবদানের বিনিময়ে বাড়তি কোনো সুবিধা বা মর্যাদা দাবি করার কোনো অভিপ্রায়ও আমার নেই। আমি নিজেকে আইন ও বিচারের উর্ধ্বে মনে করি না। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়েও আরেকজন নেত্রী যে-সব সুবিধা ভোগ করেছেন, আমি কখনো আদালতের কাছে তেমন সুবিধা দাবি করিনি। আমি দেশের একজন সাধারণ সিনিয়র সিটিজেনের প্রাপ্য অধিকারটুকু পেলেই খুশি। আইনসম্মতভাবে ন্যায়বিচার ছাড়া মাননীয় আদালতের কাছে আমার চাইবার আর কিছু নেই। আজ আমার

প্রতি যে ধরনের আচরণ করা হচ্ছে তা আমার অবস্থান ও ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং এর মাধ্যমে আমার প্রতি কোনো বৈষম্য করা হচ্ছে কিনা—সেটাও আদালতের বিবেচনার বিষয় বলে আমি মনে করি।

মাননীয় আদালত,

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, শেখ হাসিনার হাতে কোনো এক জাদুর কাঠি আছে।

সেই জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় তার বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতি, অনিয়ম ও চাঁদাবাজিসহ সকল মামলা তিনি সরকারে আসার পর একে একে উঠে গেল অথবা খারিজ হয়ে গেল।

আমাদের আর কারো হাতে তেমন কোনো জাদুর কাঠি নেই। কাজেই একই সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো একের পর এক সচল হয়েছে ও গতিবেগ পেয়েছে। হয়েছে নতুন নতুন আরো মামলা।

আজকের আলোচ্য মামলাটি তেমনই একটি নতুন মামলা। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং বিরোধী দলকে হেনস্তা করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগে এ মামলাটি দায়ের করা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। দেশে কত গুরুত্বপূর্ণ মামলা বছরের পর বছর ধরে চলছে। কত মামলা ঝুলে আছে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে মামলাগুলো পেয়েছে রকেটের গতি। যেন কেউ পেছন থেকে তাড়া করছে, শিগগির শেষ করো। তড়িঘড়ি করে একটা রায় দিয়ে দাও বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে। কেন, কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কীসের জন্য এতো তাড়াহুড়া? এই তাড়াহুড়ায় কি ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে? নাকি ন্যায়বিচারের কবর রচিত হবে?

আমাদের হাতে জাদুর কাঠি থাকলেও আমরা বলতাম না, মামলা প্রত্যাহার করেন। আমরা ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করতাম। এখনো আদালতের কাছে কেবল ন্যায়বিচারই প্রত্যাশা করছি। আশা করি সকল প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের প্রতি আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার করা হবে। ন্যায়বিচারের কথা জোর দিয়ে এতো বারবার আমি বলছি, এর কারণ আছে।

কারণ, ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে কি-না সে ব্যাপারে দেশবাসীর ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। আমরাও শঙ্কিত। আপনি জানেন, এই মামলাসহ আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন মামলার তদন্ত ও বিচারকাজ চলার সময় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য এবং শাসক দলের কোনো কোনো নেতা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে বক্তব্য দিয়েছেন। আমাকে

অভিযুক্ত করে বিরূপ প্রচারণা চালিয়েছেন। যেন তারা মামলার রায় কি হবে তা আগাম জানেন। অথবা তারা তাদের বক্তব্যে মাননীয় আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। তদন্ত ও বিচারাধীন বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের এহেন অপপ্রচার শুধু ন্যায়বিচারকেই প্রভাবিত করে না, বরং তা আদালত অবমাননার শামিল। এখানেই শেষ নয়, মামলার রায়ে আমার সাজা হবে এবং আমাকে কাশিমপুর কারাগারে রাখা হবে বলে ইতিমধ্যে কোনো কোনো মন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। কোনো কোনো মন্ত্রী এবং শাসক দলের কোনো কোনো নেতা প্রায় নিয়মিত হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে।

মাননীয় আদালত,

রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে আমাকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরাতে এবং নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে ক্ষমতাসীনরা একটি নীলনকশা প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট, মতামত ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের উচ্চ মহলের কার্যকলাপ, তৎপরতা এবং বক্তব্য-বিবৃতি থেকে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আর এসব কারণেই দেশবাসীর মনে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে যে, আমার বিরুদ্ধে মামলাগুলোতে ন্যায়বিচার হবে না। শাসক মহলের ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে কোনো একটা রায় দেয়া হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, আপনি সাহস ও সততার সঙ্গে সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার করবেন।

মাননীয় আদালত,

আপনি জানেন, দুনিয়ার ন্যায়বিচার আসমান থেকে নাজিল হওয়া কোনো অলৌকিক বস্তু নয়। এটা বেহেশত থেকে টুপ করে ঝরে পড়া কোনো মেওয়া নয়। আল্লাহ্ আহ্কামুল হাকেমিন অর্থাৎ সকল বিচারকের বিচারক। তিনি পরম ন্যায়বিচারকারী। তিনি সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি দুনিয়াতেও ন্যায়বিচার চান। অবিচার ও অন্যায় বিচারের জন্য তিনি কঠিন সাজাও নির্ধারণ করে রেখেছেন। আবার সুবিচারকের জন্য পুরস্কারের বন্দোবস্ত রেখেছেন তিনি। বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে আমরা তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করি। বিচারকের আসনকে জিল্লুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ছায়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায় হচ্ছে, ঐ আসনে যিনি বসবেন, তিনি সুবিচার করবেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন।

আল্লাহ্‌র সেই অভিপ্রায়কে অনেক বিচারকই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখান। আল্লাহ্‌ নিজেই ব্যক্তি বিচারককে সেই স্বাধীনতা দিয়েছেন। এরজন্য তিনি পুরস্কার ও সাজার ব্যবস্থা রেখেছেন। সে জন্য একজন বিচারককে জ্ঞান, বোধবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বিবেক দিয়েছেন তিনি। একজন বিচারক কোনো মোকদ্দমার বিচারকালে সেই বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত হবেন, নাকি লোভ, ভীতি, আনুকূল্য ও বিদ্বেষ পোষণ কিংবা দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তির প্রভাবে, ইচ্ছায় বা ইশারায় পরিচালিত হবেন, সেটা তার স্বাধীনতা। আমি যে কথাটি বুঝাতে চাচ্ছি, সেটা হলো, দুনিয়ার ন্যায়বিচার মূলত বিচারব্যবস্থা থেকে উৎসারিত এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিচারকের সততা ও বিবেকবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তবে, একথাও সত্য যে, বিচার-ব্যবস্থা ও ব্যক্তি বিচারক বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। দেশে কোন্‌ ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে, কেমন শাসনব্যবস্থা চলছে, বিচারব্যবস্থায় কোন্‌ ধরনের লোকজন দায়িত্ব পালন করছে তার ওপর নির্ভর করে বিচারব্যবস্থা স্বাধীন কিনা। আমাদের বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন দাবি করা হলেও সাম্প্রতিক বিভিন্ন উদাহরণ সেই দাবিকে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এই স্বাধীনতার দাবির বিশ্বাসযোগ্যতা বর্তমান মামলাতেও অনেকখানি বোধগম্য হবে। প্রমাণিত হবে, বিচারকগণ স্বাধীনভাবে, বিবেকশাসিত হয়ে এবং আইনসম্মতভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম কিনা।

মাননীয় আদালত,

আমাদের এই দেশে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিচারের নামে অবিচারের বিভিন্ন নমুনা আমরা দেখেছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একজন প্রভাবশালী নির্মাতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান। তাকেও দুর্নীতির মামলার বিচারে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও অলি আহাদের মতো জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কবিতা রচনার দায়ে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এই উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা শওকত আলী—মোহাম্মদ আলী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাস ও জওহর লাল নেহেরুর মতো নেতাদেরকেও কোনো না কোনো আদালতের রায়েই কারাদণ্ড ভোগ করতে

হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং বেনিগনো আকিনোর মতো মানুষদেরকেও কোনো না কোনো বিচারেই সাজা দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত সেইসব রায়ের পিছনেও কোনো না কোনো যুক্তি, অজুহাত ও আইন দেখানো হয়েছিল। হযরত ইমাম আবু হানিফা ও সক্রেটিসের মতো মহামানবদেরকেও তো বিচারের নামেই সাজা দেয়া হয়েছিল। সেইসব বিচারকে কি বিশ্ববাসী ন্যায়বিচার বলে মেনে নিয়েছে?

ইতিহাসের ধোপে সেসব রায় কি টিকেছে? যাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়া হয়েছিল, বিশ্বমানবতা ও ইতিহাস তাদেরকেই দিয়েছে অপরিমেয় মহিমা। আর যে বিচারকেরা আইনের কথা বলে, কোনো না কোনো যুক্তি দেখিয়ে বিচারের নামে অবিচার করেছিলেন, তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ইতিহাস রায় দিচ্ছে, নিরপরাধকে অপরাধী সাব্যস্ত করে যারা রায় দিয়েছিলেন তারাই প্রকৃত অপরাধী। তাদের জন্য পারলৌকিক সাজা তো নির্ধারিত আছেই। এই পৃথিবীতেও তাদের নাম ও স্মৃতি যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষের ঘৃণা ও ধিক্কার কুড়াচ্ছে। এ জগৎ যতদিন থাকবে, মানুষ যতদিন থাকবে, ইতিহাস যতদিন পাঠ করা হবে এবং যতদিন মানুষের স্মৃতি থাকবে, ততদিনই তাদের প্রতি চলতে থাকবে এই ঘৃণা ও ধিক্কার।

মাননীয় আদালত,

আপনি জানেন, ইতিহাসের এইসব শিক্ষা থেকে কেউ কেউ শিক্ষা নেন। আবার কেউ কেউ কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না। যারা শিক্ষা নেন, মানুষ ও ইতিহাস তাদেরকে সম্মানিত করে। আর যারা কোনো শিক্ষা নেয় না, তাদের ঠাঁই হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, আর মানুষের ঘৃণা ও ধিক্কারে। সময়ের পরিক্রমায় আজকের সময়ও এক সময় ইতিহাস হবে। আলোচ্য এ মামলাটিও নিশ্চয়ই ইতিহাসের এক মূল্যবান উপকরণ হবে। কাজেই এই পটভূমিতে আপনি ইতিহাসের শিক্ষা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি-না, সেই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। এর জন্য আপনাকে নির্ভর করতে হবে সুবিবেচনা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সাহস ও সততার ওপর। অনাগত দিন বলে দেবে, আইন ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে আপনি সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছিলেন কি-না।

মাননীয় আদালত,

আমরা ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছি। এই অঞ্চল প্রায় ২৫ বছর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

ছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এখনকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনগণের ভোটের ফলাফলেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তান হাসিলকে সম্ভব করেছিল। জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকবে বলেই সকলের আশা ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসাবে গণতন্ত্রকেই বেছে নেয়া হবে, এটাই ছিল জনগণের প্রত্যাশা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই প্রত্যাশাকে ভূলুণ্ঠিত করা হলো। গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে জোর-জবরদস্তি, জুলুম-নির্যাতন, ভয়-ভীতি, হামলা-মামলার শাসন কায়েম করা হলো। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন, অধিকার সবকিছু আক্রান্ত হলো। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রকে পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করে মানুষের রায় ও গণতন্ত্রকে আবারো হত্যা, নির্যাতন, সন্ত্রাস ও অস্ত্রের ভাষায় মোকাবিলার অপচেষ্টা শুরু হলো।

এসব অপচেষ্টার ফলাফল কী হয়েছে ইতিহাস তার সাক্ষী। অধিকার, স্বাধীকার ও গণতন্ত্র অর্জনের প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উন্নীত হয়েছে। সেই যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছি। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে।

অনেক ত্যাগ ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই বাংলাদেশেও কি আমরা পাকিস্তানের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছি? যদি নিতাম, তাহলে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় এদেশে গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় স্বৈরশাসন বা বাকশালী শাসনের প্রবর্তন করা হতো না। সব দল নিষিদ্ধ করা হতো না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক মানবিক অধিকার হরণ করা হতো না। চারটি মাত্র সরকারি প্রচারপত্র রেখে সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হতো না। কিন্তু সে সবই হয়েছে এবং এর ফলাফল ও পরিণতি ভালো হয়নি।

এসব থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছি। মানুষের অধিকার এবং বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছি। সে কারণেই আমরা কখনো স্বৈরশাসনকে মেনে নিইনি। মানুষের অধিকার,

নাগরিক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য বারবার আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম করেছি। মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে আমাদের বিশ্বাস ও বোধের অন্তর্গত করেছি। এই বিষয়গুলোকে সমুন্নত রাখতে আমরা সর্বশেষ শক্তি দিয়ে লড়াই করে যাবো।

মাননীয় আদালত,

আপনিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, মতবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজের সৌন্দর্য্য। ভিন্নমত দলন ও দমন নয়, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা নয়, বরং ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহ-অবস্থানকে উৎসাহিত না করলে গণতন্ত্র টেকানো যায় না। আমরা সে কথা জানি, বুঝি এবং মানি। আপনি জানেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর মধ্যে ভিন্নমত ও দাবি আদায়ের পন্থা এ দেশে বারবার কতটা সহিংস হয়ে উঠেছে। আমি বেশি পেছনে ফিরে যাব না। সাম্প্রতিক অতীত থেকেই আমি কিছু উদাহরণ দেব। আজ যারা ক্ষমতায় আছে, সেই আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং তাদের এক সময়কার ঘনিষ্ঠ মিত্র ও সহযোগী জামায়াতে ইসলামী মিলে দেশে কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তা আপনি জানেন।

নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের বিধানের দাবিতে তারা আন্দোলনের নামে দেশে কী সহিংস হানাহানি ও নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা সকলেই জানে। দিনের পর দিন হরতাল-অবরোধে তারা জনজীবনকে অচল করেছে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির 'লাইফ লাইন' সমুদ্রবন্দরকে দীর্ঘদিন বন্ধ করে রেখেছে। রেলস্টেশন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষকে বহনকারী যানবাহনে বোমা মেরেছে এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। গান পাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে চলন্ত বাসের বহু নিরাপরাধ যাত্রীকে তারা জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে।

বিভিন্নভাবে আরো বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের মাথা তারা ইট দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে। অফিসগামী বয়স্ক মানুষকে রাস্তায় ধরে প্রকাশ্যে দিগম্বর করেছে। মেয়েদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে।

সচিবালয়ের ভেতরে হাঙ্গামা করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় নোংরা ছড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা অবরোধ করে টানা অবস্থান নিয়ে জনচলাচল বন্ধ করে রেখেছে। সিভিল প্রশাসনে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা উস্কে দিয়েছে।

সর্বোপরি, গণতন্ত্র ধ্বংস করে সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রকাশ্যে উসকানি দিয়েছে।

আমি বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না।

২০০১ সালে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা আবারো সরকারে আসি। তারপর আবারো শুরু হলো রাজপথে আন্দোলনের নামে সহিংস হানাহানি। যা আমাদের পুরো মেয়াদ জুড়ে অব্যাহত ছিল। সেই সহিংসতা থেকে পুলিশ, বিচার বিভাগ, সুপ্রিমকোর্ট, প্রধান বিচারপতির এজলাস পর্যন্ত কোনো কিছুই রেহাই পায়নি। সেই ধারাবাহিক সন্ত্রাসের পরিসমাপ্তি ঘটে প্রকাশ্য রাজপথে পৈশাচিক কায়দায় লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে অনেক মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। এসব কর্মকাণ্ডের পরিণামও শুভ হয়নি। হানাহানির অজুহাতে জাতীয় নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে স্থগিত করে দিয়ে তখনকার সেনাপ্রধান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে নেয়।

তার অনুগত একটি গোষ্ঠীকে নিয়ে তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা জরুরি সরকার গঠন করে। তাদেরকে সামনে রেখে সেনাপ্রধান সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। নির্বাচন পিছিয়ে সেই অবৈধ শাসনকে দুই বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত করা হয়। আপনি জানেন, আমি এই অবৈধ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করিনি। বরং এখন যারা জনগণের ভোট ছাড়াই অবৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তারাই সেদিন বিপুল উৎসাহ ও উল্লাস নিয়ে সেদিনের অবৈধদের সমর্থন করেছিলেন। বলেছিলেন, ওটা তাদেরই আন্দোলনের ফসল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ অবৈধ শাসকদের আসল চেহারা ও উদ্দেশ্য সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি এবং শেখ হাসিনা, এই দুজনকেই জোর করে 'মাইনাস' করার উদ্দেশ্যে তারা সব ধরনের তৎপরতা শুরু করে। আমাকে গৃহবন্দী করা হয়। বিদেশ সফররত শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তিনি দেশে ফিরে এলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণেই তিনি চরম অশোভন আচরণের শিকার হন। আমি কিন্তু তখন চুপ করে থাকতে পারতাম। কিন্তু অন্যায়কে আমি মেনে নেইনি। গৃহবন্দী অবস্থা থেকেই আমি শেখ হাসিনার প্রতি সেই অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমি আমার বিবৃতিতে তার মুক্তি দাবি করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে সে সময়কার কিছু কথা বলতে হয়। মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের জরুরি সরকার কোনো বৈধ সরকার ছিল না। সেই

সরকার সংবিধান অনুযায়ী গঠিত হয়নি। জোর করে অস্ত্রের মুখে তারা ক্ষমতা নিয়েছিল। প্রায় দুই বছর জরুরি অবস্থা জারি করে অবৈধভাবে ক্ষমতায় ছিল। আমি কখনো কোনোভাবে তাদেরকে সমর্থন করতে পারিনি। তারা আমার সমর্থন চেয়েছিল। আমাকে সপরিবারে নিরাপদে দেশত্যাগ করার জন্য তারা বলেছিল। আমি তাদের কথা মানিনি। আমার নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভাবিনি। আমি তাদেরকে স্পষ্টভাষায় বলেছি, বাংলাদেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই। জীবনে-মরণে আমি বাংলাদেশেই থাকতে চাই।

শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সেই অবৈধ সরকারকেই সমর্থন করেছিল। তারা তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের পরামর্শে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছিলেন। যাবার সময় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে বলে গিয়েছিলেন যে, সেই অবৈধ সরকার তাদেরই আন্দোলনের ফসল। তিনি তাদের সকল কাজের বৈধতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। এমনকি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও আমার বড় ছেলে তারেক রহমানের দিকে ইঙ্গিত করে তাকে গ্রেফতার করার জন্যও সেই অবৈধ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মাননীয় আদালত,

আপনি জানেন, ফখরুদ্দীন-মইনউদ্দিনের অবৈধ সরকার মিথ্যা মামলায় আমাকে এবং আমার দুই ছেলেকে গ্রেফতার করেছিল। বন্দী অবস্থায় পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার বড় ছেলে তারেক রহমান সেই নির্যাতনে পঙ্গু হয়ে এখনও বিদেশে চিকিৎসাধীন। তার উপর বর্বরোচিত দৈহিক নির্যাতনের সকল সনদপত্র সংরক্ষিত আছে। আমার ছোট ছেলেটি আর সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়নি। বিদেশে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই সে অকালে আমাদেরকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে। সন্তানের অকাল মৃত্যুর সেই দুঃসহ ব্যথা বুকে চেপে আমি এখনও দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের অবৈধ সরকারের জুলুম-নির্যাতন ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি।

ব্যবসায়ীসহ যাকে-তাকে মিথ্যা অজুহাতে ধরে নিয়ে সে সময় তারা টাকা আদায় করতো। রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকায় জমি-বাড়ি দখলের কাজেও তারা বিভিন্ন পক্ষে প্রভাব খাটিয়েছে। আইন-আদালত ও বিচার

ব্যবস্থাকে তারা তাদের নির্দেশে চালিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং সাংবাদিকদের উপর তারা নির্যাতন করেছে।

এতো অপকর্ম করেও মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনরা বিদেশে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে। আজ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়নি। তাদের অন্যতম দোসর মাসুদউদ্দিন চৌধুরীকে দীর্ঘদিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে বহাল রেখে লালন-পালন করা হয়েছে।

এসবের কারণ, আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় এসেছিল। ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনা নিশ্চিত করা হয়েছিল। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করলেও মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের পক্ষে যখন আর ক্ষমতায় থাকার কোনো উপায় ছিল না, তখন তারা নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। কেননা আমাদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে দেশের ভিতরে ও বাইরের পরিস্থিতি অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। তারা আমার সঙ্গেও সমঝোতার চেষ্টা করেছে। নানা রকম প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে গেছে। আমি তাদের কোনো প্রস্তাবে রাজি হইনি। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, অবৈধ শাসকদের সঙ্গে কোনো রকম সমঝোতা আমি করবো না। জরুরি অবস্থা তুলে দিয়ে তাদেরকে নির্বাচন দিয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে গোপন সমঝোতা করেই ক্ষমতায় গিয়েছিল। তারপরেও আমরা সাংবিধানিক শাসন ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ঐ কারসাজির নির্বাচনের ফল মেনে নিয়েছিলাম। আমরা সরকারকে সহযোগিতা করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের সহযোগিতার আহ্বানের বিনিময়ে তারা আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে তা সকলেরই জানা।

মাননীয় আদালত,

প্রতিহিংসার বিপরীতে সংযম, সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা আমি বরাবর করে এসেছি। কিছুদিন আগেও আমি একটি সংবাদ-সম্মেলন করে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে ক্ষমার কথা তুলে ধরি। আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করি যে, আমার এবং শহীদ জিয়াউর রহমানসহ আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার ক্রমাগত অশোভন উক্তি এবং প্রতিহিংসামূলক বৈরী আচরণ সত্ত্বেও আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। আমি তার প্রতি কোনো প্রতিহিংসাপ্রবণ আচরণ করবো না।

আমি আহ্বান জানিয়েছিলাম, আসুন, রাজনীতিতে একটি সুন্দর, শোভন ও সহিষ্ণু সংস্কৃতি গড়ে তুলি। যা গণতন্ত্রের জন্য খুবই প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে আমাদের কাছ থেকে ভালো কিছু শিখতে পারে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার পরিবেশ গড়তে আমাদের মরহুম জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সম্মানিত করার ব্যাপারে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যও আমি বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাব দিয়েছি।

এছাড়াও, বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজার ব্যাপারেও আমাদের প্রস্তাব সব সময় ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু তার জবাব আমাদেরকে কোন্ ভাষায় দেয়া হচ্ছে, তার প্রমাণ সকলেই পাচ্ছেন এবং আপনিও জানেন। আমাদের বিরুদ্ধে আলোচ্য মামলাটিও সেই হীন চক্রান্তেই একটি প্রমাণ।

মাননীয় আদালত,

কেন এই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলা? এটি সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। মানবসেবা ও কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল– বিএনপি'র একটি সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগের ফল এটি। এই প্রতিষ্ঠানে সরকারি কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো সংস্থা থেকে কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা কখনো নেয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কোনো তহবিল থেকে এই ট্রাস্টে একটি পয়সাও কখনো নেয়া বা বরাদ্দ করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অথবা প্রধানমন্ত্রী পদের কোনোরূপ প্রভাব খাটিয়ে এই ট্রাস্টের জন্য কোনো অর্থ সংগ্রহ করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কোনো সাক্ষীর অথবা ডকুমেন্টারি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এমন কিছু প্রমাণও হয়নি যে, প্রধানমন্ত্রী পদের কোনো অপব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে কেন এ মামলা? এ মামলার কারণ—এই ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ বিএনপি'র। এর সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা বিএনপি'র চেয়ারপার্সন হিসেবে।

বিএনপি এবং আমাকে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা তাদের প্রতিপক্ষ মনে করে। তাদের বিভিন্ন কথা ও আচরণে প্রমাণিত যে, তারা বিএনপি এবং আমাকে যে-কোনো পন্থায় হেয়, হয়রানি ও হেনস্তা করতে বদ্ধপরিকর। তারা ক্ষমতাসীন হবার পর সম্পূর্ণ হীন সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাই এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। সর্বোপরি, এ ট্রাস্ট করা হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে। তার স্মৃতি ও আদর্শকে অম্লান ও জীবন্ত রাখার

উদ্দেশ্যে। প্রতিহিংসার এটি একটি বড় কারণ। জিয়াউর রহমান আজ আর আমাদের মাঝে নেই। জনগণের নির্বাচিত ও নন্দিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় দেশদ্রোহী কুচক্রীমহলের কুটিল ষড়যন্ত্রে তিনি শহীদ হয়েছেন। কিন্তু দেশে-বিদেশে তার বিপুল জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আজও একটুও ম্লান হয়নি। তার আদর্শ, সততা, দেশপ্রেম, সাহস, অবদান ও কর্তব্যনিষ্ঠা আজও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস। এখনো তার পথ-নির্দেশনা দেশকে আলোর পথ দেখায়। বর্তমান ক্ষমতাসীনরা তাই মৃত্যুর পরেও শহীদ জিয়াউর রহমানকে সহ্য করতে পারে না। তারা মনে করে, জীবিত জিয়াউর রহমানের চাইতেও শহীদ জিয়াউর রহমান আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠিত দল এবং প্রবর্তিত আদর্শ ও কর্মসূচি মোকাবিলা করা তাদের জন্য এখনো খুবই কঠিন। এ কারণেই তারা শহীদ জিয়ার নাম ও স্মৃতিকে মুছে দিতে একের পর এক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। একজন মৃত মানুষের বিরুদ্ধে ক্রমাগত চলছে কুৎসা রটনা ও অসত্য প্রচার। সেই প্রতিহিংসা থেকেই শহীদ জিয়ার নামাঙ্কিত ট্রাস্টের বিরুদ্ধে এই মামলা। কিন্তু, মাননীয় আদালত, মামলা-মোকদ্দমা, আদালতের রায়, সরকারি নির্দেশনা ও ফরমান এবং রাজনৈতিক প্রচার-অপপ্রচার দিয়েই ইতিহাসের মোড় ফেরানো যায় না। ইতিহাসের সত্যকে মুছে দেয়া যায় না। আজ ও আগামীকালের লাখো কোটি মানুষের মন থেকে শহীদ জিয়ার স্মৃতি ও আদর্শকে এভাবে মুছে ফেলা সম্ভব হবে না। চোখে ঠুলি পরলেই প্রখর ও উজ্জ্বল সূর্য মুছে যাবে না। পর্বতের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যাবে না। শহীদ জিয়াউর রহমানকে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা খুবই অন্যায় ও ভুলভাবে বিরোধিতা করে। তিনি নিজে কোনো হিংসাপরায়ণ মানুষ ছিলেন না। সাহসী ও দেশপ্রেমিক জিয়াউর রহমানের কাছে দেশ ও জনগণ ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে। দেশের ডাকে তিনি জীবনকে তুচ্ছ করেছেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কারো নিরাপত্তার কথাও ভাবেননি। ১৯৭১ সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলা ভেঙ্গে বিদ্রোহ করে দেশের প্রয়োজনে নিজের নামে স্বকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। প্রতিরোধ যুদ্ধকে স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে উন্নীত করেছেন। তার মধ্যে কোনো হীনম্মন্যতা ছিল না। তাই অনেকের অনুরোধে তিনি স্বাধীনতার সেই ঘোষণাকে সংশোধন করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতার নাম তাতে যুক্ত করতেও কুণ্ঠিত হননি।

তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। স্বাধীনতার পর সুশৃঙ্খল একজন সেনানায়ক হিসাবে কর্তব্য পালন করেছেন।

তিনি নিজে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেননি। বরং উচ্চাভিলাষী কতিপয় সেনা কর্মকর্তা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সেনাপ্রধানের পদ থেকে তাঁকে অপসারণ ও বন্দী করছিল।

সৈনিক-জনতা তাঁকে মুক্ত করে দেশ পরিচালনার ভার তার ওপর অর্পণ করে।

তখন ছিল এক সীমাহীন শূন্যতা। দেশে সংবিধান স্থগিত ছিল। জারি ছিল সামরিক শাসন। সংসদ ছিল না। বৈধ কোনো সরকার ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না কোনো রাজনৈতিক দলের। শহীদ জিয়াউর রহমানই সামরিক শাসন থেকে সাংবিধানিক শাসন ফিরিয়ে আনেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটান। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের ধারা ফিরিয়ে আনেন। রাজনৈতিক দল পুনর্গঠন করে রাজনীতি চালু করেন। নির্বাচিত সংসদ গঠন করেন। বিচার বিভাগ, মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন। তিনি গণভোটে জনগণের সম্মতি বা ম্যান্ডেট নিয়েই এসকল ইতিবাচক ও শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শেখ হাসিনাকে ভারতে প্রবাসী জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগও জিয়াউর রহমান করে দিয়েছিলেন। তিনিই শেখ হাসিনাকে তাদের পারিবারিক বাড়ি ও বিপুল পরিমাণ সম্পদ ফেরত দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেও জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও অবদান জনগণের হৃদয়ে ও আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

জাতীয় ঐক্য ও উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ গঠন এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি চারণের বেশে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সারা দেশে ছুটে বেড়িয়েছেন। জিয়াউর রহমান সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের মধ্যে কর্মউদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন। তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খননে অংশ নিয়েছেন এই কর্মী রাষ্ট্রনায়ক। সার্ক গঠনের উদ্যোগ নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গনে তার গতিশীল ভূমিকা আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। এসবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তিনি বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন।

তার ভূমিকা ও অবদানের কারণেই তিনি বাংলাদেশের মানুষের বিপুল ভালোবাসা পেয়েছেন। তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হওয়ার পর তার জানাজায় লাখ লাখ মানুষ শামিল হয়েছিলেন। সারা দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এতো বড় জানাজা আর কারো হয়নি। শহীদ জিয়াউর রহমান আমাদের পার্টি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল– বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা। এটা আমাদের জন্য এক পরম গৌরবের বিষয়। তার স্মৃতি ও আদর্শকে অম্লান রাখা আমাদের দলের কর্তব্য। সেই লক্ষ্য নিয়েই বিএনপি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে শহীদ জিয়াউর রহমানের নামাঙ্কিত এই ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, জিয়াউর রহমানকে সহ্য করতে না পেরে এবং আমাদের দল ও আমাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এ মামলা সৃষ্টি করা হয়। এ মামলায় আমার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতার অপব্যবহারের কোনো অভিযোগ সম্পর্কিত কোনো সাক্ষ্য কেউই দেননি।

আমি এ ট্রাস্টের জন্য সরকারি বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে একটি পয়সাও বরাদ্দ দেইনি কিংবা নেইনি। কোনো তহবিল তছরূপ বা আত্মসাতেরও কোনো অভিযোগ নেই। অথচ আমার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ মারফত স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়নি যে, আমি কোনোভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি। কী-ভাবে এবং কোন্ পন্থায়, কোন্ কোন্ পদক্ষেপের মাধ্যমে আমি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি তা-তো স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলতে হবে। শুধু ঢালাও অভিযোগ আনলেই হবে না। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে আদালতে সেগুলো প্রমাণ করতে হবে। সেটা তারা করতে পারেনি। মামলাটি মূলত ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও ইঙ্গিতে সৃষ্ট। তাই আইন, বিধিবিধান, দুদকের এখতিয়ার, আওতা এবং কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার পরিধিকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। সে কারণেই আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। বরং দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা এ মামলাটিই মূলত করা হয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

মাননীয় আদালত,

আমি বিস্মিত হয়েছি আমার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে মামলা দায়ের করায়। ক্ষমতা সম্পর্কে আমার নিজের একটা ধারণা আছে। আমি সে ধারণার কথা বহুবার আমার পাবলিক স্টেটমেন্টসমূহে ব্যক্ত

করেছি। আমার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েও সেই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তা নন। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, দেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণের অনুমোদন ও সমর্থনে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় ও সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালন করতে হয়। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনাকে আমি কখনো ক্ষমতা বলে মনে করি না, বিশ্বাসও করি না। আমি মনে করি এটা দায়িত্ব। যে দায়িত্ব জনগণ ভোটের মাধ্যমে অর্পণ করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে মনে করলে আমি ক্ষমতার ব্যবহার ও অপব্যবহার করেছি কি-না সে প্রশ্ন উঠতে পারতো। আমি রাষ্ট্রীয় ও সরকারি দায়িত্বকে ক্ষমতা মনে করি না। কাজেই আমার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ অবান্তর। আমি শুধু এ মামলার সঙ্গে জড়িত বিষয়ে নয়, কখনো কোনো বিষয়েই ক্ষমতার অপব্যবহার করিনি। কাজেই এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভিত্তিহীন কোনো অভিযোগ প্রমাণেরও প্রশ্ন ওঠে না। সে কারণেই এই আদালতে কোনো প্রমাণ বা সাক্ষ্যে আমার বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ পরিষ্কার, স্পষ্ট, দৃশ্যমান ও বোধগম্য করে তোলা সম্ভব হয়নি। মামলায় অন্তর্ভুক্ত তথাকথিত ঘটনার সময় আমি জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছিলাম, একথা সত্য।

সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, সেটাই কেবল আমার একমাত্র পরিচয় ছিল না। আমি একই সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন ছিলাম। আমি আমার সন্তানদের মা ছিলাম। অনেকের আত্মীয় ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আমার আরো পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়, অবস্থান ও সম্পর্ক ছিল। সেইসব অবস্থান, সম্পর্ক ও পরিচয়ের কারণে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাকে অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালন করতে হয়েছে। এর সবকিছুকে মিলিয়ে ফেলার কিংবা একত্রিত করে উপস্থাপনের সুযোগ নেই। সেটা করলে তা নৈতিক, ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক হবে না। শহীদ জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কোনো কাজ আমি প্রধানমন্ত্রী পদের প্রভাব খাটিয়ে করিনি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লিখিত বা মৌখিক কোনো নির্দেশ কাউকে দেইনি।

প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কোনো অন্যায়, অনৈতিক, বেআইনি বা আইনবহির্ভূত আদেশ

দেইনি। এ মামলায় তেমন কোনো সুস্পষ্ট অভিযোগ নেই এবং সাক্ষ্য প্রমাণে তেমন কিছু প্রমাণিতও হয়নি। তাহলে কেন এ মামলা? কোন্ সাক্ষ্য-প্রমাণকে আমি খণ্ডন করবো?

মাননীয় আদালত,

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন পাস হয়। দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে আমিই স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করি। এই স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান হন একজন প্রথিতযশা অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচারপতি সুলতান হোসেন খান। আইন পরিবর্তন করে দুদক-এর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খর্ব করা হয়। আমি বিস্মিত হয়েছি, দুদক আমার বিরুদ্ধেই এই মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করেছে। এর আগে মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের ইঙ্গিতেও দুদক আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও সে সময় অনেকগুলো মামলা দায়ের করা হয়েছিল। দুদকের আইনজীবী হিসেবে কেউ কেউ এখন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা নিয়ে ভীষণ তৎপর।

মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের সময়ও তো তারা এই রকম অতিউৎসাহীই ছিলেন। মামলাগুলো প্রমাণের জন্য তারা কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর তার বিরুদ্ধের সেই মামলাগুলো আজ কোথায় মাননীয় আদালত?

বর্তমান মামলাটির সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীরা মাননীয় আদালতে উপস্থাপন করবেন।

উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে আমি শুধু বলতে চাই যে, রাষ্ট্রপক্ষে যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে কেউ আমার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের কোনো অভিযোগ মৌখিক বা দালিলিকভাবে উপস্থাপন করেননি। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে পাবলিক সার্ভেন্ট বিবেচনা করে পাবলিক সার্ভেন্ট হিসাবে আমাকে এ মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। একজন প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক দল পরিচালনার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর পরিচালিত হয় আইন, রুলস অব বিজনেস ও সংবিধান অনুযায়ী। একজন প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের

প্রার্থী হিসাবে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পার্লামেন্টে নেতা নির্বাচিত হন এবং সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে পরবর্তীতে সংবিধান মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকার গঠনের আহ্বান জানান।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সমর্থন থাকা পর্যন্ত কোনো প্রধানমন্ত্রীকে কেউ অপসারণ করতে পারে না। কাজেই জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পদকে প্রজাতন্ত্রের কাজে নিযুক্ত এবং বরখাস্তযোগ্য অন্যান্য পাবলিক সার্ভেন্টের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। আমি মামলায় বর্ণিত তথাকথিত ঘটনার সময় বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। প্রচলিত অর্থে কারো দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছিলাম না।

জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নেতা হিসাবে আমাকে সরকার গঠনের আহ্বান জানানো এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আর কোনো বিকল্প ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা বহাল থাকা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে আমাকে অপসারণের কোনো এখতিয়ারও রাষ্ট্রপতির ছিল না। কাজেই আমাকে পাবলিক সার্ভেন্ট বিবেচনা করে অত্র মামলায় অভিযুক্ত করার কোনো আইনগত সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রীর পদকে নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের সংবিধানের চতুর্থ ভাগে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। পাবলিক সার্ভেন্টদেরকে কর্মবিভাগের আওতাভুক্ত করে আমাদের সংবিধানের ৯ম ভাগে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। পাবলিক সার্ভেন্টদের নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, বরখাস্ত ও শাস্তি বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও আইন রয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী যদি পাবলিক সার্ভেন্ট না হন তাহলে মামলায় উল্লেখিত ঘটনার সময় আমি প্রধানমন্ত্রী ছিলাম শুধু এ কারণে এ ধরনের মামলা হতে পারে না।

আমি সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছি। কোনো সাক্ষী তার সাক্ষ্যে এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পদ অপব্যবহারে বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করেননি। রুলস অব বিজনেস, অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী স্ব-স্ব পদে আসীন কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করেননি। সুদীর্ঘ তিন বছর অনুসন্ধান ও তদন্ত চালিয়েও

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ আদালতে হাজির করা হয়নি। কোনো সাক্ষী তেমন কোনো সাক্ষ্য প্রদানও করেননি। সাক্ষ্য-প্রমাণে এমন কোনো বর্ণনা নাই যে, আমি প্রধানমন্ত্রীর পদের প্রভাব খাটিয়ে কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দলীয় বা ট্রাস্টের ফান্ডের জন্য কোনোরূপ অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহণ করেছি। আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার অভিযোগ থেকে প্রথম জানতে পারি যে, আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ২০০৫ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি। মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায় যে, আমার বিরুদ্ধে এই মামলায় ক্ষমতা অপব্যবহারের সেই অভিযোগের ব্যাপারে দুদক ২০০৯ সালের ৫ অক্টোবর থেকে অনুসন্ধান আরম্ভ করে। দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করেও আমার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ তারা সংগ্রহ করতে পারেনি। তারপরও সম্পূর্ণ প্রতিহিংসাবশতঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও আমাকে অন্যায়ভাবে হেয় ও হেনস্তা করতে বিগত ২০১১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে এই মামলাটি দায়ের হয়।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যথাযথভাবে দেশের প্রচলিত ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা এবং নিবন্ধন করা হয়েছে। এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটানো হয়নি। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দলিলে আমার পরিচয় দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয় বরং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন হিসাবে পরিষ্কার উল্লেখ আছে। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের একটি স্থায়ী রূপ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের একটি বাণিজ্যিক এলাকায় ৪২ কাঠা জমি বিক্রেতাকে যথার্থ ও উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে খরিদ করা হয়েছে। বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ টাকা বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় খরচসহ ডকুমেন্ট ভিত্তিক ব্যাংক পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে এবং প্রাপ্তিস্বীকারপত্র আছে। এখানে কোনো অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ে অথবা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে কোনো অর্থ ব্যয় হয়নি। দলীয় তহবিল থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত টাকা দলীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় পদক্ষেপ ও ব্যয় বিভিন্ন পর্যায়ের দলীয় নেতা-কর্মীরা দলীয়ভাবে সম্পন্ন করেছেন।

মাননীয় আদালত,

আপনি জানেন আলোচ্য ট্রাস্টটি বিএনপির একটি উদ্যোগ। সারা দুনিয়ায় রাজনৈতিক দলের তহবিল নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে দান-অনুদান ও চাঁদা গ্রহণের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও আইনসম্মত। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোও একইভাবে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। আপনি কিছুদিন আগে আমাদের দেশে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন দেখেছেন। টানা কয়েকদিন ধরে আলোকসজ্জা হয়েছে নগরীতে। আর সকল ক্ষেত্রে যে জৌলুস করা হয়েছে তাতে ব্যয় হয়েছে কোটি কোটি টাকা। বিপুলভাবে ব্যয় করা সে অর্থের উৎস নিয়ে কোনো মামলা হয়নি। হলে নিশ্চয়ই তারা বলবেন, চাঁদা ও দান-অনুদান থেকেই ওই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দান-অনুদান ও চাঁদা গ্রহণ করেছে। এভাবে তহবিল সংগ্রহ করা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। কেবল আমাদের ক্ষেত্রে কেন প্রশ্ন উঠবে?

এ দেশে রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয় ও জমা-খরচের অডিট এক সময়ে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক ছিল না। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের জন্য তহবিল সংগ্রহের সময়েও দলের আয়-ব্যয় ও জমা-খরচের অডিটের বাধ্যবাধকতা ছিল না।

তা সত্ত্বেও আমরা যতদূর সম্ভব স্বচ্ছতার সঙ্গে সবকিছুর হিসাব সংরক্ষণ করেছি এবং সে হিসাবে কোনো গরমিল নেই।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে জমাকৃত সমুদয় টাকা দলের তহবিলে গচ্ছিত টাকা এবং দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থক ও শহীদ জিয়ার অনুরাগীদের প্রদত্ত দান ও অনুদানের টাকা। সারা দুনিয়ায় দান-অনুদানের অর্থে ট্রাস্ট পরিচালনা একটি সার্বজনীন স্বীকৃত রীতি।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকার কোনো অংশ প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ে অথবা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার অপব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়নি। তেমন অভিযোগ কেউ উত্থাপন করেননি কিংবা সাক্ষ্যও দেননি। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টে জমাকৃত টাকার বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো পর্যায়ে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি।

আমার বিরুদ্ধে মামলাটি প্রতিহিংসামূলক অপরাজনীতির প্রতিফলন মাত্র।

মাননীয় আদালত,

এ মামলায় আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়, কাউকে ভীতি প্রদর্শন বা লোভ দেখিয়ে অনৈতিক কিছু করানোর কোনো অভিযোগ কিংবা তথ্য-প্রমাণ নেই। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই ট্রাস্ট থেকে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো সুবিধা নেয়ার প্রশ্ন নেই। কাজেই ট্রাস্টের জন্য সংগ্রহ করা তহবিলকেও আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে সংগৃহিত হিসাবে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই। ভয়ভীতি দেখিয়ে বা সুবিধা দেয়ার লোভ দেখিয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দান-অনুদান গ্রহণের কোনো অভিযোগ এ মামলায় নেই। দান-অনুদান প্রদানকারী দুই-একজনকে বরং ভয়ভীতি দেখিয়ে মিথ্যা বক্তব্য আদায় করা হয়েছে। কিন্তু কাগজপত্রে প্রমাণ হয়েছে, তারা অসত্য বলেছে। কাজেই তাদের ভীতিতাড়িত অসত্য বক্তব্য আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নয়। দুর্নীতি নিরোধ আইন মোতাবেক আমি কোনো ক্রিমিনাল মিসকন্ডাক্ট অর্থাৎ অপরাধমূলক অসদাচরণ, অনিয়ম বা দুর্নীতি করিনি। আদালতে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিতও হয়নি। তবুও মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়েরের কারণে আমাকে নানাভাবে হয়রানি ও হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে।

মাননীয় আদালত,

এই মামলায় আমাকে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ জাতীয় মামলায় একজন পাবলিক সার্ভেন্ট হিসাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির অভিযোগ একটি আবশ্যিক পূর্ব শর্ত। মামলাটিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক প্রাপ্তির জন্য অভিযোগ হিসাবে একমাত্র পি.ডব্লিউ-১ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এই পি.ডব্লিউ-১ হারুন অর রশীদ ৮/৮/২০১১ইং তারিখে এজহার দায়ের করেন এবং তিনি মামলাটি তদন্ত করে ১৬/১/২০১২ইং তারিখে চার্জশীট দাখিল করেন। এই হারুন অর রশীদ একজন অতি উৎসাহী সাক্ষী। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর আমার বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই সাক্ষী একথাও স্বীকার করেছেন যে, তিনি এই

বর্তমান মামলাটি ছাড়াও আমার বিরুদ্ধে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় এজাহার দায়ের ও চার্জশীট প্রদান করেছেন।

তিনি তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন যে, আমাদের সরকারের আমলে ২/১০/২০০৫ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে দুদকের চাকুরিতে আত্মীকরণ করার জন্য সুপারিশ করেননি। সেকারণে তিনি একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হিসাবে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি পরবর্তীতে রীট মামলাটি Not pressed করেন এবং Rule discharge হয় ১৩/৯/২০০৭ইং তারিখে। দুদকের চাকুরিতে তাকে ২৫/০২/২০০৮ইং তারিখে আত্মীকরণ করা হয় এবং ৪/৫/২০০৮ইং তারিখে এ সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী মাসে ১৫/৬/২০০৮ইং তারিখে তাকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় অনুসন্ধানকারী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়।

মাননীয় আদালত, এই মামলায় পি.ডব্লিউ-১ হারুন অর রশীদ আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ একজন ব্যক্তি হিসাবে নানারূপ কল্প-কাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে চার্জশীটভুক্ত করেছেন। সংবিধানের বিধিবদ্ধ বিধান অনুযায়ী একজন রাজনৈতিক দলের নেত্রী হিসাবে পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আমি এমপি হিসাবে শপথ গ্রহণ করি। পরবর্তীতে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের নেতা হিসাবে নির্বাচিত হলে আমাকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়।

আমি প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্মপরিধি প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র, রুলস অব বিজনেস এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্গানোগ্রাম কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সত্তা ও দলীয় কর্মকাণ্ড পৃথকভাবে চলে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক অবস্থাজনিত কার্যকলাপ সংবিধান ও আইন দ্বারা স্বীকৃত।

মাননীয় আদালত,

একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার করি নাই। ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গঠিত হয়নি। এই ট্রাস্টটি আইন দ্বারা নিবন্ধিত একটি পৃথক প্রাইভেট সত্তা। বর্তমান মামলাটিতে পি.ডব্লিউ-১ হারুন অর রশীদ স্বীকার করেছেন যে, "এই মামলার আসামী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ক্ষমতার

অপব্যবহার করে সরকারি টাকা অপব্যবহারের কোনো অভিযোগ এজাহারে উল্লেখ করিনি। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ডিড-এ ট্রাস্টি হিসাবে বেগম খালেদা জিয়ার নাম রয়েছে এবং তিনি বিএনপি চেয়ারপার্সন হিসাবে উক্ত ট্রাস্ট গঠন করেছেন। ট্রাস্ট ডিড-এ প্রধানমন্ত্রীর অফিস বা সচিবালয়ের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি।"

মাননীয় আদালত,

এই সাক্ষী আমার বিরুদ্ধে দালিলিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ক্ষমতার অপব্যবহারের দাবি করেছেন। এরূপ দাবি নিছক কাল্পনিক, মিথ্যা ও বানোয়াট। মাননীয় আদালতে মামলাটিতে ৩৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দুদকের এই অতি উৎসাহী সাক্ষী হারুন অর রশীদ ছাড়া আর কেউ, কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দফতর হতে কোনো সাক্ষী মৌখিকভাবে অথবা দালিলিকভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো আর্থিক প্রাপ্তির বিষয়ে বা কোনো অপচয়ের বিষয়ে কোনো অভিযোগ করেননি। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টেও অনুকূলে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দলীয় নেতা-কর্মীদের টাকা এবং দলীয় বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট হতে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকা। এখানে প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের সাথে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন রূপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক পেয়িং স্লিপ, ব্যাংক পে-অর্ডার, পে-অর্ডার অ্যাপ্লিকেশন ফরম এগুলি সব Primary documentary evidence। এরূপ evidence-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো মৌখিক সাক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য-আইন বিরুদ্ধ। আমার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষীর বরাতে বা সাক্ষ্য-আইনের নিরিখে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গঠনের বিষয়ে কোনোরূপ আইন বিরুদ্ধ কাজ হয়নি।

৬নং শহীদ মইনুল রোডস্থ আমার এককালীন বাসস্থানটি আমাদের দীর্ঘ দিনের পারিবারিক বাসস্থান ছিল। সেখানে আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রে এক সময় বসবাস করেছি। সেখানেই আমার পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড চলেছে। আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও সেই বাসস্থানে বসবাস করেছি বলেই সেটিকে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন হিসাবে চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ নেই।

মাননীয় আদালত,

সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, ক্ষমতাসীনদের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই মামলা দায়ের করা এবং মামলাটিতে আমাকে

অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যে সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী এ মামলা দায়ের হলো তাদের কী অবস্থা? দেশে গণতন্ত্র নেই। কার্যকর সংসদ নেই। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। খুন, অপহরণ, গুম, নির্যাতন ও বিচারহীনতার এক স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব চলছে। দেদারছে চলছে ক্ষমতার অপব্যবহার। কারাগারগুলো রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতের মানুষ দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে। কথায় কথায় মামলা-হামলা, গ্রেফতার ও নির্যাতন চলছে। প্রতিবাদের কোনো সুযোগ নেই। টুঁ-শব্দটি করলেই নির্যাতনের খড়গ নেমে আসছে।

চলছে সন্ত্রাস, দখল ও দলীয়করণের বিভীষিকা। বয়োবৃদ্ধ মানুষদের পর্যন্ত দিনের পর দিন পুলিশী রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। সংবাদ-মাধ্যম শৃঙ্খলিত। সম্পাদক ও সাংবাদিকরা বন্দী হচ্ছেন। সাংবাদিক দম্পতি নৃশংসভাবে খুন হলেও বিচার হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনে পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। নারী-শিশুরা নির্যাতিত ও নিহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ব্লগার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও বিভিন্ন ধর্মের লোক, এমনকি বিদেশীরা খুন হচ্ছেন। সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কোথাও কারো কোনো নিরাপত্তা ও অধিকার নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে নির্বিচারে গুলি করে প্রতিবাদী মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের হত্যা করা হচ্ছে। এগুলো কি ক্ষমতার অপব্যবহার নয়? ক্ষমতার অপব্যবহার আমি করেছি? শেয়ার বাজার লুট করে লক্ষ কোটি টাকার তছরূপ হয়ে গেল। নিঃস্ব হলো নিম্ন আয়ের মানুষ। ব্যাংকগুলো লুটপাট করে শেষ করে দেয়া হচ্ছে। একটি বেসরকারি সংস্থার হিসাবে গত ৭ বছরে ব্যাংক থেকে চুরি হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী ব্যাংক লুটের হাজার হাজার কোটি টাকাকে 'সামান্য' বলে অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন। কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের নামে দায়মুক্তি দিয়ে সীমাহীন দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। দুর্নীতির প্রমাণিত অভিযোগের সাজা সুপ্রিম কোর্টে বহাল থাকা ব্যক্তিরও মন্ত্রিসভায় ও সংসদে সদস্যপদে বহাল থাকছে। জনগণের অর্থ এবং জনস্বাস্থ্যের তোয়াক্কা না করে পচা গম আমদানির জন্য দায়ী লোকও বহাল তবিয়তে মন্ত্রিত্ব করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নামে আইটি খাতে বিশাল দুর্নীতি চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত রিজার্ভের অর্থ থেকে ৮'শ' কোটি টাকা কারসাজি করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে সম্পন্ন বিচারের নথিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসীপুত্রের সন্দেহভাজন একটি অ্যাকাউন্টেই প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থের কথা এসেছে। সে ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য না করে অপ্রমাণিত অভিযোগে মামলা করে সাংবাদিকদের গ্রেফতার ও হেনস্তা করা হচ্ছে। অপপ্রচার করা হচ্ছে বিএনপির বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের গরীব মানুষের অর্থ চুষে সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টগুলোতে জমানো টাকার স্তূপ ফুলে ফেঁপে উঠছে। ২০১৫ সালে শুধু এক বছরেই এইসব অ্যাকাউন্টে বেড়েছে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। ফাঁস হওয়া পানামা পেপার্সে বিদেশে অবৈধ পথে ক্ষমতাসীনদের পাচার করা বিপুল অর্থের খবর প্রকাশিত হয়েছে। অফসোর কোম্পানিগুলোতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই কেলেংকারি নিয়ে দুদক একটি মামলাও দায়ের করেনি। পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে তহবিল প্রত্যাহারের ঘটনায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। দেশে এখন কোনো খাতই অবাধ লুটপাট থেকে মুক্ত নয়। অথচ এখনো প্রচারণা ও মামলা চলছে আমাদের বিরুদ্ধে। দেশের সম্পদ লুট করে কারা, আর মামলা দিয়ে হেনস্তা করা হয় কাদেরকে? অপপ্রচার চলে কাদের বিরুদ্ধে? আমাদের বিরুদ্ধে তো কম অপপ্রচার করা হয়নি। সারা দুনিয়ায় চষে বেড়িয়ে এবং সব তন্নতন্ন করে দেখে কয় লাখ বা কয় কোটি টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আজ পর্যন্ত আনতে পেরেছে? অথচ তাদের বিরুদ্ধে এক-একটি ঘটনাতেই শত শত, হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ আজ সকলের মুখে মুখে। যাদের কথা এবং কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যারা নিজেরা দুর্নীতি করে অন্যদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়, তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কাজেই মাননীয় আদালত, আমি অনুরোধ করবো এই মামলা পর্যালোচনা ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে আইন ও বিবেকের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আপনাকে সর্বোচ্চ সাবধানতা ও সচেতনতা বজায় রাখতে হবে।

কোনো প্রচারণা, ধূম্রজাল বা কথার মারপ্যাঁচের ওপর নির্ভর না করে, অস্পষ্ট কোনো ধারণা বা অনুমানের ওপর ভিত্তি না করে আপনাকে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে অনুরোধ করবো। সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে আপনাকে প্রমাণ পেতে হবে আমি কীভাবে, কোথায়, কোন্ পদক্ষেপে আইন লঙ্ঘন কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি। আমি আবারো দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আপনাকে জানাতে চাই যে, আমি শহীদ জিয়াউর রহমান

চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কোনো কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচালনা করি নাই। ফলে শহীদ জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সঙ্গে আমার প্রধানমন্ত্রীত্বের কোনো সম্পর্ক নাই।

আমি বিএনপির চেয়ারপার্সন হিসেবে এবং আমার ওপর অর্পিত ট্রাস্টের দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ট্রাস্টের অনুকূলে কোনো কিছু করতে কখনো কোনো নির্দেশনা দেইনি। কিংবা রাষ্ট্রীয় ও সরকারি কোনো মেশিনারিকেও ব্যবহার করিনি। এই প্রক্রিয়ায় দলের নেতা-কর্মী এবং শহীদ জিয়ার সমর্থক, অনুসারী ও সহানুভূতিশীলরাই কেবল জড়িত। আমি সরকারি কোনো অর্থ নিইনি বা নেয়ার নির্দেশ দিইনি। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাউকে অনুদান দিতে বা নিতেও বলিনি। আমার জানা মতে, শহীদ জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্টে সকল লেনদেন সম্পূর্ণ বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। কাউকে কোনো রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে বা অঙ্গীকার করে বা লোভ দেখিয়ে কিংবা কোনো ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে এ তহবিলে কোনো টাকা নেয়া হয়নি। এমন কোনো অভিযোগও কেউ কখনো করেনি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই।

আমার বিরুদ্ধেও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তেমন ধরনের কোনো অভিযোগও উত্থাপন করেনি কিংবা এর কোনো প্রমাণও নেই। কাজেই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমার বিরুদ্ধে এ মামলাই হতে পারে না। তবুও হয়েছে কেবল আমাকে হেনস্তা ও হয়রানি করার উদ্দেশ্যে।

মাননীয় আদালত,

এই প্রসঙ্গে আমি একটি মামলার নজির উল্লেখ করতে চাই। মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের আমলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুদক ঐ মামলাটি দায়ের করেছিল।

বার্জ মাউন্টেড দুর্নীতি মামলা নামে বহুল আলোচিত সেই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল যে, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একটি বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে টেন্ডারের সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর দফতর ১৯৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সার-সংক্ষেপটি গ্রহণ করে। এরপর ১৯৯৭ সালের ৮ অক্টোবর 'বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ধানমন্ডিতে একটি বাড়ি ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা দামে কেনা হয়।

শেখ হাসিনার নিয়ন্ত্রণাধীন 'বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামিট গ্রুপ ও ইউনাইটেড গ্রুপের মালিকগণ। সামিট গ্রুপ ও ইউনাইটেড গ্রুপের সেই মালিকরাই আবার উল্লেখিত টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী মেসার্স ওয়ার্টশিলা গ্রুপের স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন। সেই স্থানীয় প্রতিনিধিগণ ১৯৯৭ সালের ৭ অক্টোবর ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা এবং ১৯৯৭ সালের ৮ অক্টোবর তারিখে ৫৫ লাখ টাকা 'বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এ দান করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা তাদের অনুকূলে ১৯৯৭ সালে ১১ অক্টোবর তারিখে সার-সংক্ষেপ অনুমোদন এবং ১৯৯৭ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বাস্তবায়ন চুক্তি সই করেন। এরপর আবার ১৯৯৭ সালের ২৪ নভেম্বর ঐ স্থানীয় প্রতিনিধিগণ 'বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর জমি কেনা বাবদ আরো এক কোটি টাকা প্রদান করেন। আমাদের হাইকোর্ট বিভাগ ঐ মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন। 'শেখ হাসিনা বনাম রাষ্ট্র' এই মামলাটির বিশদ বিবরণ ৬৩ ডিএলআর ১৬২-তে উল্লেখ রয়েছে।

মাননীয় আদালত,

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে ট্রাস্টের জন্য চাঁদা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণ থাকার পরেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা সে মামলা হাইকোর্টে খারিজ হয়েছিল। যদি সেটা দুর্নীতি না হয়ে থাকে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়ে থাকে, তাহলে আমার বিরুদ্ধে এ মামলার রায় ও ফলাফল কী হওয়া উচিত সেটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কোনো কাজই আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে করিনি। এর সঙ্গে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। কাউকে কোনো সুবিধা দিয়ে অথবা বাধ্য করে ট্রাস্টের জন্য কোনো টাকা নেওয়া হয়নি। সে ধরনের কোনো অভিযোগও নেই। তবুও আমাকে হেয় ও হেনস্তা করার উদ্দেশ্যেই কেবল এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমি মনে করি, এই মামলা দায়েরের ফলে : I am a victim of an unjust situation. আমি চলমান এক অসঙ্গত পরিস্থিতির শিকার মাত্র। আমি জানি এবং আপনিও বুঝতে পারেন যে, আমার বিরুদ্ধে আনীত এই মামলা সরকারি নির্দেশনায়, বেআইনিভাবে প্রভাবিত হয়ে আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার অসৎ উদ্দেশ্যে দায়ের ও পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগ

রাষ্ট্রপক্ষের কোনো সাক্ষী প্রমাণ করতে পারেননি। এখন তাদের নানা প্রচারণা ও ধূম্রজালের মধ্যে সত্যকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা আপনার দায়িত্ব। ন্যায়বিচারের স্বার্থে আপনাকে সেই কাজটিই করতে হবে। কারণ, বিচারক হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সুবিচার মানেই হচ্ছে : The quality of being just, impartial and fair. আপনি এ মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে ও পটভূমি একজন বিজ্ঞ বিচারক হিসাবে নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছেন। আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এজাহার, অনুসন্ধান, অভিযোগপত্র, দুর্নীতি দমন কমিশনের কথিত অনুমোদন এবং মামলার কার্যক্রম বেআইনি ও আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত। আপনার বিবেক ও প্রজ্ঞা নিশ্চয়ই আপনাকে বলছে যে, আমার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উত্থাপিত কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি এবং আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পাওয়ার যোগ্য।

মাননীয় আদালত,

আজ এই মামলায় আমাকে যে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে তা সমগ্র দেশবাসী প্রত্যক্ষ করছে। আপনি জানেন যে, আমাদের বিচার-ব্যবস্থা নিয়ে দেশে-বিদেশে সবখানে আলোচনা চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রিপোর্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টে বাংলাদেশের ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থা নিয়ে সম্প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। আমি আশা করি, আপনি এসব অনাস্থার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করবেন। প্রমাণ করবেন, বাংলাদেশের বিচার-ব্যবস্থা ন্যায়ের মানদণ্ডে পরিচালিত হয় এবং এখানে ন্যায়-বিচারক আছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে : "Not only must Justice be done, it must also be seen to be done."

আমি আবারও পরিষ্কার করে বলতে চাই : আমি সজ্ঞানে, জ্ঞানতঃ, জ্ঞাতসারে কোনো অন্যায় করিনি এবং আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আপনি নির্ভয়ে আমার এ বক্তব্যকে গ্রহণ করে সুবিচার করবেন, সঠিক রায় দেবেন এবং আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন—এ আমার প্রত্যাশা।

মাননীয় আদালত,

আপনাকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আদালতে দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া যে কথাগুলো বলেছেন এতে বাংলাদেশের চলমান চিত্র ফুটে উঠেছে। খালেদা জিয়ার ঐতিহাসিক বক্তব্যে স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাবেদার এবং আধিপত্যবাদী অপশক্তির ষড়যন্ত্রের রূপরেখা। সেই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ এমন এক অপশক্তির কবলে যে সময়টিতে বাংলাদেশের মর্যাদার পক্ষে কথা বলায় আবরারদের মতো দেশপ্রেমিকদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। একজন খালেদা জিয়াকে পরাস্ত করতে গিয়ে শেখ হাসিনা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিকদেরকে পরাধীন করে ফেলেছেন।

২০০৭ সালের কথিত ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মূলতঃ বাংলাদেশের জনগণকে পরাধীন করে রাখার পথটি রচিত হয়। শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্রের পথ ধরে তথাকথিত ওয়ান-ইলেভেনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক মইন-ফখরুদ্দীন চক্র। শেখ হাসিনার ইন্ধনে মইন-ফখরুদ্দীন ক্ষমতা দখল করলেও মইনউদ্দিনের মনে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার লিপ্সা জাগে। ফলে মইন-ফখরুদ্দীনের সরকার আমলের দুদক খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা এই দুই নেত্রীর নামেই মামলা দায়ের করে। সেই সময় দুই নেত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ইলেভেনের সরকারের বেপরোয়া তাণ্ডবে একপর্যায়ে আপসরফার মাধ্যমে জেল থেকে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে দেশ ছেড়ে পালান শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, তিনি ক্ষমতায় ফিরতে পারলে মইন-ফখরুদ্দীনের সকল অপকর্মকে দায়মুক্তি দেবেন।

এদিকে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর খালেদা জিয়াকেও দেশ থেকে বের করে দেয়ার সীমাহীন অপচেষ্টা চেষ্টা চলে। খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগে বাধ্য করতে তাঁর দুইপুত্র বিএনপির তৎকালীন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান এবং প্রশিক্ষিত পাইলট ও বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আরাফাত রহমান কোকোর উপর কারাগারে নির্যাতন চালানো হতে থাকে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজনের মায়া উপেক্ষা করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জিয়াউর রহমান যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একইভাবে মাদার অফ ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়ার কাছেও সন্তান পরিবার পরিজনের চেয়েও গণতন্ত্র, দেশ এবং জনগণের স্বার্থই ছিল মুখ্য।

এ প্রসঙ্গে সাবেক নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মরহুম মাহবুব আলী খানের কন্যা ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জোবাইদা রহমানের একটি লেখা প্রণিধানযোগ্য। ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর পর ডা. জোবাইদা রহমান 'মায়ের কাছে সন্তানের চেয়ে দেশ বড়' শিরোনামে লিখেছিলেন, 'মায়ের (খালেদা জিয়া) কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল—সন্তান (তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান) না কি দেশ? এর উত্তরে মা বলেছিলেন—দেশ। এরপর অমানুষিক নির্যাতন নেমে এলো তাঁর দুই সন্তানের উপর। এরপর আবারো সেই 'মা'কে জিজ্ঞেস করা হলো—আপনার কাছে সন্তান বড় না কি দেশ? উনি কেঁদেছেন। চোখের পানি ফেলতে ফেলতেই বলেছেন—দেশ। এই দেশ আমার 'মা' এই দেশ আমার স্বামী শহীদ জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন। আমি আমার মায়ের কাছেই থাকবো আমার স্বামীর স্বপ্নের দেশেই থাকবো। আমার দুই সন্তানকে আমি আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছি। আমি বেঁচে থাকবো আমার ১৬ কোটি সন্তানদের মাঝে।' (সূত্র : দৈনিক আমাদেরসময় ডটকম, ২৮ জানুয়ারি ২০১৫)।

নির্যাতন নিপীড়ন আর মিথ্যাচার চালিয়েও খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগে রাজি করানো যায়নি। খালেদা জিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বিদেশে তাঁর কোনো বাড়ি নেই, তিনি বাংলাদেশে জন্মেছেন, বাংলাদেশের জনগণের জন্য রাজনীতি করছেন, তিনি দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে বাংলাদেশেই থাকবেন। বাংলাদেশ ছেড়ে তিনি অন্য কোনো দেশে যাবেন না। ফলে মইন-ফখরুদ্দীনের অবৈধ ক্ষমতা দখলে রাখার খায়েশ ফিকে হয়ে আসতে থাকে। তখন খালেদা জিয়া যদি মইন-ফখরুদ্দীনের সঙ্গে আপোষ করে শেখ হাসিনার মতো দেশ ছেড়ে পালাতেন তাহলে মইনের ক্ষমতায় থাকার খায়েশ পূরণ হতো। কিন্তু খালেদা জিয়ার দৃঢ়তায় পাল্টে যেতে থাকে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মইন-ফখরুদ্দীন সরকারের প্রতি জনরোষ বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি যেতে থাকে বিএনপির অনুকূলে। অবস্থা আঁচ করতে পেরে, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী শেখ হাসিনা তড়িঘড়ি করে দেশে ফেরেন। বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে শেখ হাসিনা পুনরায় মইন-ফখরুদ্দীনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। সেই ষড়যন্ত্রের পথ ধরে ২০০৯ সালে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে নেয় শেখ হাসিনা।

সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ওয়ান-ইলেভেন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশে তথাকথিত জঙ্গিবাদের উত্থান, ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের ঘটনা, ওয়ান-ইলেভেনের নাটক, বিডিআর পিলখানায় সেনা হত্যাযজ্ঞ এবং মিথ্যা মামলায় খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রাখা—প্রতিটি ঘটনাই একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেয়া বক্তব্যগুলো প্রণিধানযোগ্য। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তথা দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করতেই অত্যন্ত সুপরিকল্পতিভাবে ’৭৫-এর পরাজিত অপশক্তির ইন্ধনে ২০০৪ সালে সংঘটিত হয় ‘২১ আগস্ট’। ‘২১ আগস্ট’ এবং কথিত ‘ওয়ান-ইলেভেন’ একই সূত্রে গাঁথা। একটি ‘ওয়ান-ইলেভেন’ এর নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছিল ‘২১ আগস্টের ঘটনা’। ’৭৫ সালের নভেম্বরের পরাজিত অপশক্তি যারা তখন দেশকে উল্টো পথে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল, ২০০৭ সালের কথিত ‘ওয়ান-ইলেভেনে’র মাধ্যমে তারা সাময়িকভাবে সফল হয়। কথিত ‘২১ আগস্ট’ আর ‘ওয়ান-ইলেভেনের’ নামে ষড়যন্ত্রের পথ ধরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ’৭৫-এর ৭ নভেম্বরের পরাজিত অপশক্তি। এই চিহ্নিত অপশক্তি মহাজোটের নামে একজোট হয়ে এখন জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিডিআর পিলখানায় সুকৌশলে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যাযজ্ঞ ছিল সেই প্রতিশোধেরই অংশ।

ইতিহাস সাক্ষী, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে, গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে, বাংলাদেশের পক্ষের শক্তির কাছে, জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে ’৭৫-এর ৭ নভেম্বর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার। কারণ যারা দেশের গৌরব এবং মর্যাদার প্রতীক সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল, যারা গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় বাকশাল কায়েম করতে চেয়েছিল, যারা বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তাদের পরাজয় ঘটেছিল। বিজয়ী হয়েছিল দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ, জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ঐক্য ও সংহতি। আর শক্তিমান হয়ে উঠেছিল দেশের শৌর্য বীর্য ও

সাহসের প্রতীক সেনাবাহিনী এবং দেশে মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

সাম্য-মানবিক মর্যাদা-ন্যায় বিচার—এই মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে লাখো মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু গুম, খুন, দুর্নীতি, দুরাচার, তৎকালীন নেতৃত্বের সীমাহীন ব্যর্থতা, সেনাবাহিনীর অস্তিত্ববিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া, ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আওয়ামী-বাকশালী চক্র এবং তাদের দোসর তথা সেই অপশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার কারণে যাত্রার শুরুতেই পথ হারায় স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ। আমরণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে আওয়ামী অপশক্তি গণতন্ত্র হত্যা করে, কুখ্যাত একদলীয় বাকশাল কায়েম করে, মানুষের বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্যে অসহায় হয়ে পড়ে জনগণ, দেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়, সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে সুকৌশলে জন্ম দেয়া হয় রক্ষীবাহিনী কিংবা তথাকথিত সৈনিক সংস্থা। সর্বোপরি ক্ষমতালোভী দুষ্টচক্রের নিজেদের মধ্যকার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে দিক-নির্দেশনাহীন হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। দেশকে এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর রাজপথে নেমে আসে সিপাহী-জনতা। দেশের এমন ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতার ঘোষকের নেতৃত্বে আলোর দিশা খুঁজে পায় বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের পর থেকেই মূলত ‘সাম্য-মানবিক মর্যাদা-ন্যায় বিচার’—মুক্তিযুদ্ধের এই মূলমন্ত্রে প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করতে পেরেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। এ কারণেই বাংলাদেশের পক্ষের শক্তির কাছে ৭ নভেম্বর রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৮১ সালের ৩০ মে স্বাধীনতার ঘোষকের শাহাদাত পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের নিবিড় পর্যবেক্ষক ছিলেন খালেদা জিয়া। তখন পর্যন্ত তিনি রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেননি বটে তবে যৌক্তিক ও সঙ্গত কারণেই প্রতিটি পরিস্থিতিই বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক চিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। আন্দোলিত করেছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাবিরোধী অপশক্তির চক্রান্তে ১৯৮১ সালের ৩০ মে স্বাধীনতার ঘোষকের শাহাদাতের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দেশ এবং জনগণের স্বার্থে সরাসরি রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার জন্য একদিকে দেশপ্রেমিক জনগণের পক্ষ থেকে

খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয় অপরদিকে দলের তথা বিএনপির দায়িত্ব নেয়ার জন্য সারা দেশে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকেও খালেদা জিয়ার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। তবুও খালেদা জিয়া ক্ষমতার প্রতি লোভ দেখাননি। বরং সেই সময়কার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খালেদা জিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। খালেদা জিয়ার সম্মতিতে বিএনপির তৎকালীন ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে দেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের বয়স তখন ৭৬ বছর।

বয়োবৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তার যখন একদিকে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন, অপরদিকে বিএনপির মতো জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল সামলাতে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এই ষড়যন্ত্রের পথ ধরেই এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তারকে বন্দুকের নলের মুখে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। দেশে জারি করেন সামরিক আইন।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে দেশে প্রথমবারের মতো ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল। স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা নেয়ার পর সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেছিলেন। এরপর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেছিলেন সেনাপ্রধান এরশাদ। অথচ এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর সেই সময় এক প্রতিক্রিয়ায় শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ‘আই আমি নট আনহ্যাপি’। এমনকি ’৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম যখন সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন তখনও শেখ হাসিনার ভূমিকা ছিল রহস্যজনক।

অপরদিকে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বন্দুকের নলের মুখে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন যখন এরশাদের মতোই বন্দুকের নলের মুখে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেন তখনও শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ‘ওয়ান-ইলেভেন তারই আন্দোলনের ফসল’। এভাবে গণতন্ত্র হত্যা করে বন্দুকের মুখে যতবারই যেভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে, প্রতিটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গেই শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ

কিংবা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছিল। এ কারণেই দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে গণতন্ত্র থাকে না আর গণতন্ত্র থাকলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকে না। আওয়ামী লীগের কাছে দেশ এবং জনগণ নয়, গণতন্ত্র এবং মানবিকতা নয় বরং যে-কোনোভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই মুখ্য।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সারা দেশে বিএনপির উপর নির্যাতন নেমে আসে। আশাহত হয় গণতন্ত্রকামী মানুষ। দেশে এমন এক অরাজক পরিস্থিতিতে ১৯৮৪ সালের ১০ মে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বিএনপির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নিয়েই বেগম খালেদা জিয়াকে স্বৈরাচারী এরশাদের মতো এক নিকৃষ্ট ক্ষমতালোভীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। জিয়াউর রহমান যেভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন একইভাবে বিএনপির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নিয়েও বেগম খালেদা জিয়াকেও দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করতে হয়েছে।

এরশাদবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়েও খালেদা জিয়াকে বারবার মোকাবিলা করতে হয়েছে নানারকম ষড়যন্ত্র। বিএনপিসহ বিরোধী দল এবং সারা দেশে ছাত্রদের আন্দোলনে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েন সামরিক শাসক এরশাদ। ফলে সামরিক শাসকের অপবাদ ঘোচাতে এরশাদ যেনতেনভাবে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেয়। ১৯৮৬ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে এরশাদ। কিন্তু বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধী দলগুলো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সারা দেশে এরশাদবিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে। আন্দোলনের একপর্যায়ে ১৯৮৬ সালের ১৭ মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, যারা এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে তারা ‘জাতীয় বেঈমান’।

শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে এই ঘোষণা দেয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভোল পাল্টে ফেলেন। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেই ক্ষমতার লোভে এরশাদের প্রলোভনে পা দেন। চট্টগ্রামে ঘোষণা দিয়ে আসার ৪ দিনের মাথায় ১৯৮৬

সালের ২১ মার্চ শেখ হাসিনা 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে নিজেই স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে '৮৬-র নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট থেকে বাম ঘরানার ৫টি দল বেরিয়ে যায়।

ক্ষমতার লোভে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে শেখ হাসিনা বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং ১৫ দল থেকে বেরিয়ে এসে গঠিত ৫ দলীয় জোট এরশাদ পতনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

এদিকে 'জাতীয় বেঈমান' শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল ১৯৮৬ সালের ৭ মে সামরিক শাসক এরশাদের অধীনে কথিত জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়। শেখ হাসিনা এবং জামায়াতে ইসলামীকে সঙ্গী করে নির্বিঘ্নে কথিত জাতীয় নির্বাচন করতে নির্বাচনের দুই দিন আগে স্বৈরাচারী এরশাদ ১৯৮৬ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করে। খালেদা জিয়াকে কারাবন্দি করলেও আন্দোলন দমানো যায়নি। বরং আন্দোলনের কারণে এরশাদ-হাসিনা এবং জামায়াতে ইসলামীর পাতানো সংসদ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট এবং বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বাধীন ৫ দলীয় জোটের তীব্র আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী এরশাদ '৮৭ সালে ভুয়া সংসদ ভেঙে দিতে বাধ্য হয়। সব হারিয়ে শেখ হাসিনা পুনরায় বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার আপোষহীন ভূমিকায় '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হয়। এরশাদ পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি বিজয় লাভ করে। দেশে পুনরায় গণতন্ত্র ফিরে আসে। দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ খালেদা জিয়াকে আপোষহীন নেত্রীর তকমায় ভূষিত করে। এই হলেন বেগম খালেদা জিয়া। যার কাছে ক্ষমতা নয় দেশ, জনগণ এবং গণতন্ত্রই বড়।

বাস্তবতা হলো, এরশাদ থেকে শেখ হাসিনা, দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক বাঁকে, প্রতিটি স্বৈরাচারের প্রথম এবং প্রধান টার্গেট হয়ে পড়েন বেগম খালেদা জিয়া। এর কারণ, খালেদা জিয়া 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি'

আর জিয়া পরিবার দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি তথা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সূতিকাগার। মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র সাম্য-মানবিক মর্যাদা আর সামাজিক সুবিচার এই সুমহান আদর্শে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্বাধীনতার ঘোষককে অপশক্তির হাতে জীবন দিতে হয়েছে। 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি' বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে কারান্তরিত হতে হয়েছে। খালেদা জিয়াকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে বিরত রাখতে না পেরে তাঁর দুই সন্তানকে বারবার নির্মম নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়েছে। স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে যেভাবে তারেক রহমান রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন একইভাবে দুরাচার মইন-ফখরুদ্দীনের সময়ও কারাগারে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমান।

বন্দুকের নলের মুখে গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর বিশেষ করে ১৯৮৪ থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত এই সময়টি ছিল স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের এক উত্তাল সময়। এই আন্দোলনের পুরো সময় জুড়ে খালেদা জিয়ার ধারাবাহিক নেতৃত্ব এরশাদকে বেসামাল করে তোলে। এরশাদ লোভ-লাভ দেখিয়ে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক কূটকৌশলে ম্যানেজ করতে পারলেও খালেদা জিয়াকে কোনোভাবেই আন্দোলন থেকে সরানো যায়নি।

বরং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পাস এরশাদবিরোধী দুর্গ হিসেবে গড়ে উঠে। খালেদা জিয়ার সঙ্গে কোনোভাবেই রাজনৈতিক সমঝোতায় ব্যর্থ হয়ে এরশাদ সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারেক রহমানকে নির্যাতনের টার্গেটে পরিণত করে। তারেক রহমান প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলেও পরে সাবজেক্ট পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে উঠলে তারেক রহমানের শিক্ষাজীবনের উপর খড়গ নেমে আসতে শুরু করে। খালেদা জিয়াকে আন্দোলনের পথ থেকে সরানোর অপকৌশল হিসেবে স্বৈরাচারী এরশাদ তারেক রহমানকে টার্গেট করে। তারেক রহমানের পেছনে এরশাদের বিশেষ গোয়েন্দাদের লেলিয়ে দেয়া হয়।

এরশাদের গোয়েন্দাদের অবৈধ তৎপরতায় তারেক রহমানের জন্য ক্যাম্পাসকে অনিরাপদ করে তোলা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও স্বৈরাচারী এরশাদের গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি কলেজ থেকে তারেক রহমানকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করতে হয়েছে। স্বৈরাচারী এরশাদের কারণে তারেক রহমানের স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন যেমন ব্যাহত হয়েছে একইভাবে সেই সময় দেশের অসংখ্য শিক্ষার্থীকেও একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

লক্ষণীয়, পুত্র তারেক রহমানের বিপদ জেনেও গণতন্ত্রের স্বার্থে খালেদা জিয়া স্বৈরাচারের সঙ্গে আপোষ করেননি। ফলে এরশাদকে গণঅভ্যুত্থানে বিদায় নিতে হয়েছে। শুধুমাত্র স্বৈরাচারী এরশাদের সময়ই নয়। শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্রে মইন-ফখরুদ্দীন ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পরও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখনও বেগম খালেদা জিয়ার দুই পুত্র বিএনপির তৎকালীন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ও প্রশিক্ষিত পাইলট বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব (মরহুম) আরাফাত রহমান কোকোকে নির্যাতনের টার্গেটে পরিণত করা হয়।

অথচ, মইন-ফখরুদ্দীন চক্র ক্ষমতা দখল করলে খালেদা জিয়া, তারেক রহমান কিংবা আরাফাত রহমান সবারই দেশ ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। মইন-ফখরুদ্দীন চক্র সবাইকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। নিরাপদে দেশ ত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ দেশ ছেড়ে যাননি। দেশত্যাগে রাজি করানোর জন্য খালেদা জিয়ার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে মইন-ফখরুদ্দীন চক্র প্রথমেই ২০০৭ সালের ৭ মার্চ তারেক রহমানকে গ্রেফতার করে।

তারেক রহমানের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তবুও খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগে রাজি করতে না পারায় ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসভবন থেকে খালেদা জিয়া এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে কারান্তরীণ করা হয়। মইন-ফখরুদ্দীন চক্র শেখ হাসিনাকে দেশত্যাগে রাজি করাতে সক্ষম হয়। মইন-ফখরুদ্দীনের শর্ত মেনে শেখ হাসিনা প্যারোলে মুক্তি নিয়ে ২০০৮ সালের ১২ জুন দেশত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। দেশত্যাগের আগে বিমানবন্দরে শেখ হাসিনা বলেন, মইন-ফখরুদ্দীনের সরকার তার

আন্দোলনের ফসল এবং তিনি কখনো ক্ষমতা পেলে মইন-ফখরুদ্দীনের বিচার করবেন না।

শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী মইন-ফখরুদ্দীন চক্র খালেদা জিয়ার উপর দেশত্যাগের জন্য ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি খালেদা জিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করতে কারাবন্দি তাঁর দুই সন্তান তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমানের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এমনকি কারাভ্যন্তরে তারেক রহমানের প্রাণনাশের চেষ্টা চালানো হয়। তবুও খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগে রাজি করতে পারেনি মইন-ফখরুদ্দীন চক্র। খালেদা জিয়া স্পষ্টই জানিয়ে দেন, বিদেশ নয়—বাংলাদেশই জিয়া পরিবারের শেষ ঠিকানা। খালেদা জিয়ার আপোষহীনতায় ক্রমেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি মইন-ফখরুদ্দীনের নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে সুযোগ বুঝে নানারকম নাটকের মধ্যে দিয়ে তড়িঘড়ি দেশে ফেরেন শেখ হাসিনা। এসেই মইন-ফখরুদ্দীনের সঙ্গে আঁতাত করে ২০০৯ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শেখ হাসিনা মইন-ফখরুদ্দীন চক্রকে নিরাপদে দেশ ছাড়ার সুযোগ করে দেন। আর এদিকে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে প্রথমেই দেশের সেনাবাহিনী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিকে যেকোনো উপায়ে পরাস্ত করে রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে শেখ হাসিনার ক্ষমতা দখলের দুই মাসের মাথায় বিডিআর পিলখানায় ঘটে নৃশংস সেনা হত্যাযজ্ঞ। বিডিআর বিদ্রোহের নামে ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। এরপর স্বাধীনতার ঘোষকের স্মৃতি বিজড়িত ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। দেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। মাদার অফ ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়।

তবে এভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেও স্বাধীনতার ঘোষকের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা যায়নি। খালেদা জিয়ার ইমাজে বিনষ্ট করা যায়নি। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, গণতন্ত্র হত্যাকারী কুখ্যাত একদলীয় বাকশালী অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া যেমন দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, একইভাবে স্বৈরাচারী এরশাদকে হটিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। একইভাবে বর্তমানে স্বৈরাচারিণী শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন

দেশনায়ক তারেক রহমান। অর্থাৎ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপির ইতিহাস দেশে স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

'৭৫-এর ৭ নভেম্বরের সেই পরাজিত অপশক্তি মহাজোটের নামে একজোট হয়ে এখন গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। দেশের স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার ঘোষকের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালাচ্ছে, মাদার অফ ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। শেখ হাসিনা যতই অপপ্রচার করুক, দেশের চলমান বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বার্থ আর জিয়া পরিবারের স্বার্থ এখন একাকার। আওয়ামী অপশক্তি ষড়যন্ত্র করলেও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া, মাদার অফ ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া, দেশনায়ক তারেক রহমান তথা জিয়া পরিবারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কারণ জিয়া পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

যুগে যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই সকল রাষ্ট্রেই জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নানা প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। খালেদা জিয়াও ব্যতিক্রম নন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে খালেদা জিয়া হঠাৎ করেই আবির্ভূত হননি কিংবা লোভ-লাভের আশায় রাজনীতিতে জড়াননি। দেশ এবং জনগণের প্রয়োজনেই একটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে খালেদা জিয়ার আবির্ভাব। যারা ভেবেছিল স্বাধীনতার ঘোষককে হত্যা করে বাংলাদেশকে বিপথে নিয়ে যাওয়া যাবে—রাজনীতিতে খালেদা জিয়ার আগমন তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষকের মতোই বেগম খালেদা জিয়াও আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনিবার্য নাম। নির্লোভ, কৌশলী, বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকায় খালেদা জিয়া আজকের বাংলাদেশে এক আপোষহীন সংগ্রামী নেত্রীর নাম। দেশে-বিদেশে গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে খালেদা জিয়া 'মাদার অফ ডেমোক্রেসি'।

বেগম খালেদা জিয়া—হৃদয়ে প্রোথিত নাম

রুমিন ফারহানা

বেগম খালেদা জিয়া—কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি বাংলাদেশের হৃৎস্পন্দন, ১৭ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক ও বাহক, গণতন্ত্রের আরেক নাম। ১৯৮০-র দশকে স্বৈরাচারবিরোধী এক দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হন বেগম খালেদা জিয়া। তার গৃহবধূ থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধান হয়ে ওঠার পথটি খুব মসৃণ ছিল না। তিনি ছিলেন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেড ফোর্সের অধিনায়ক, বীর উত্তম, সাবেক সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপতি এবং আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের যোগ্য সহধর্মিণী। চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে বহুবার রাজপথে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, গৃহবন্দী হয়েছেন তিনি। তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র নেতা যিনি কোনও নির্বাচনে কোনও দিন কোনও আসন থেকে পরাজিত হননি। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত তার নাম।

আমরা প্রায়ই বলি 'পৃথিবীতে কেউ অপরিহার্য নয়'। প্রায় সব ক্ষেত্রে কথাটা সত্যিও। তারপরও কিছু কিছু মানুষের কীর্তি এমনভাবে সবকিছু ছাপিয়ে যায় যে 'কেউ অপরিহার্য নয়'-এর সীমা ছাড়িয়ে যায়। বেগম খালেদা জিয়া তাদেরই একজন। একটার পর একটা প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন করা কর্তৃত্ববাদী চরিত্রের এই সরকার তার ক্ষমতা প্রলম্বিত করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করেছিল দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের এই প্রধানকে। আর সেই কারণেই এক এগারোর

সময়ে যে নেতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা ছিল ৪টি, গত এক যুগে এই সরকারের আমলে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭টিতে। এমনকি ২০১৮ সালে বর্ষীয়ান সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে কারাবরণও করতে হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ এক কালো অধ্যায়।

কীভাবে মিথ্যা অভিযোগে বেগম জিয়াকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, সেটার খুঁটিনাটি তথ্য এই দেশের মানুষ জানে। সেই বিষয়ে তাই আর বিস্তারিত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। শুধু এটুকু বলি, একজন আইনজীবী হিসেবে আমি নিজে দুদকের মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের মামলায় কাজ করেছি এবং আপিল গ্রহণকালেই জামিন পেতে দেখেছি। স্থায়ী জামিন নিয়ে তাদের অনেকেই এখন বিদেশেও আছেন। এটা যদি হয় একজন সাধারণ অভিযুক্তের ক্ষেত্রে, তাহলে বেগম জিয়ার মতো একজন মানুষের ক্ষেত্রে কী হওয়ার কথা ছিল?

জামিন লাভের ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়, তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো—ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থান। আর যে বিষয় আদালত দেখে তা হলো—অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা এবং সাক্ষীকে ভয়ভীতি দেখানো বা আলামত নষ্ট করার ভয় আছে কিনা। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আদালত যেকোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক জামিন দিতে পারেন। এই আশঙ্কাগুলোর কোনটি বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে সত্য, সেটা বিচারের ভার আমি পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। পরবর্তীতে নির্বাহী আদেশে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি মিললেও কার্যত গৃহবন্দীই ছিলেন তিনি। কোনও ক্রমেই যেন রাজনীতি তার কাছ ঘেঁষতে না পারে তা নিশ্চিত করেছিল সরকার।

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির তথ্য কমবেশি দেশের প্রতিটা মানুষের কাছেই আছে। এর মধ্যে ১১ এপ্রিল দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার করোনা ধরা পড়ে। শারীরিক পরীক্ষার জন্য গত ২৭ এপ্রিল তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে সিসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়। শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর বিদেশে চিকিৎসার সুপারিশ করলে দেশনেত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বিদেশে চিকিৎসার আবেদন জানানো হয়।

আবেদনটির ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হলে আইনমন্ত্রী জানান, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় খালেদা জিয়ার সাজা ও দণ্ডাদেশ স্থগিত করে যে শর্তে তাকে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তা শিথিল করে এখন তাকে বিদেশে যেতে দেওয়ার সুযোগ নেই। আইনগতভাবে এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়, কারণ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৪০১ ধারায় সরকারকে ক্ষমতায় দেওয়া হয়েছে সাজাপ্রাপ্ত আসামীর বিষয়ে শর্তহীন কিংবা শর্তযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার। ৪০১ (১) এবং ৪০১(৪ক) ধারা ভালো করে পড়লে দেখা যায়, আদালত যদি বিদেশ যেতে নিষেধ করে কোন আদেশও দেয় তাহলেও সরকার বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে। অর্থাৎ ৪০১ ধারা অনুযায়ী সরকার চাইলে যে কোন সময়, যে কোনও দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য যেতে পারেন বেগম খালেদা জিয়া।

৪০১.(১) When any person has been sentenced to punishment for an offence, the Government may at any time without conditions or upon any conditions which the person sentenced accepts, suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced.

(4A) The provision of the above sub-sections shall also apply to any order passed by a Criminal Court under any section of this Code or of any other law, which restricts the liberty of any person or impose any liability upon him or his property."

৪০১(৪ক) ধারা পড়লে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, কোন আইনে যদি কোন আদালত কোন ব্যক্তির (সাজাপ্রাপ্ত কিংবা সাজাপ্রাপ্ত নয়) চলাফেরার স্বাধীনতা খর্ব করে কোন আদেশ দেন সেক্ষেত্রেও সরকার তা স্থগিত করে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে । এই ক্ষমতা সরকারের সহজাত। দুদক আইন, ২০০৪ এ সরকারের এই ব্যাপক সহজাত ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়নি। ফলে, দুদকেরও এখানে বলার কিছু নেই। অতীতের নজির বলে এরকম অবস্থায় বহু রাজনীতিবিদই বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে।

বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া কেবল তিন বারের প্রধানমন্ত্রীই নন, তিনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ, জনপ্রিয়তম দল বাংলাদেশ

জাতিয়তাবাদী দলের প্রধান। করোনা মহামারীতে পুরো বিশ্ব যখন কাঁপছে, প্রতিদিন আক্রান্ত আর মৃতের সংখ্যাকে ছাপিয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে তখন সরকার ৭৬ বছরের অসুস্থ সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ন্যূনতম মানবিকতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষ আশা করেছিল অন্তত এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করবে না সরকার। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী আবারও শিকার হলেন সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার। বিষয়টি দেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ ও হতাশ করেছে। কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের অমানবিকতার আরও একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে এই ঘটনাটি।

লেখক : *জাতীয় সংসদ সদস্য ও আইনজীবী*
২৮ মে ২০২১

বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার লড়াই আপনারও

রুমিন ফারহানা

আমরা প্রায়ই বলি 'পৃথিবীতে কেউ অপরিহার্য নয়'। প্রায় সব ক্ষেত্রে কথাটা সত্যিও। কিন্তু একজন নোয়াম চমস্কি কিংবা অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা স্লোভো জিজেক যখন থাকবেন না, তখন পৃথিবীতে তৈরি হওয়া নতুন কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনা বা প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশ্লেষণ করার মতো মানুষ থাকবেই, কিন্তু চমস্কি কিংবা জিজেকের বিশ্লেষণের অভাব কি আমরা বোধ করবো না? কীর্তি এভাবেই কিছু মানুষকে 'অপরিহার্য নয়'-এর সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই দেশে একজন বেগম জিয়া আমাদের প্রায় সবার জন্য প্রযোজ্য 'কেউ অপরিহার্য নয়' এর সীমা পেরিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছেন।

এটা প্রমাণ করা খুব সহজ—একটা চরম কর্তৃত্ববাদী সরকার তার অনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মনে করেছে বেগম জিয়াকে কারারুদ্ধ করে রাখাকে। শুধু কারারুদ্ধ করে রাখাই যথেষ্ট হয়নি, একজন খালেদা জিয়া এরপরও এতই ভীতি ছড়ান যে, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা এবং শরিক দলের চাটুকাররা ক্রমাগত বিষোদগার করেই যাচ্ছেন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে। এতেই প্রমাণিত হয়, এই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য একজন বেগম খালেদা জিয়া কতটা অপরিহার্য।

আমরা নিশ্চয়ই এটা ভুলে যাইনি, স্বৈরাচারী এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সরকারি দল নির্বাচিত সরকার হটিয়ে তার ক্ষমতা দখলকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিল তারা অসুখী নন। আমরা ১৯৮৬ সালকেও ভুলে যাইনি। নির্বাচনে অংশ নিয়ে স্বৈরাচারী এরশাদকে বৈধতা দিয়ে আরও অনেক দিন ক্ষমতায় রেখে দেওয়ায় তাদের যে চেষ্টা সেটি কাজ করেনি একজন খালেদা জিয়ার আপসহীন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কারণে। এরপর বর্তমান সরকারের 'আন্দোলনের ফল' এক এগারোর সরকারের সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিদেশে চলে গেলেও, খালেদা জিয়া তাতে রাজি হননি। অসাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে আবার রুখে দাঁড়ান বেগম জিয়া, যেটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফিরে আসতে সাহস জোগায়। জনগণের সামনে আবারও প্রমাণ হয়, বর্তমান বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একমাত্র প্রতীক বেগম খালেদা জিয়া।

খালেদা জিয়ার প্রতি স্বৈরাচার, কর্তৃত্ববাদের ভীতি ছিল, আছে সব সময়ই। তাই রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী বা কর্তৃত্ববাদী শাসন চালিয়ে যাওয়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে তাকে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করা। বেগম জিয়ার এই চরিত্র এরশাদ জানতো, জানতো মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং জানে বর্তমান সরকারও। তাই মিথ্যা মামলায় বেগম জিয়া আজ কারারুদ্ধ।

কীভাবে মিথ্যা অভিযোগে বেগম জিয়াকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, সেটার খুঁটিনাটি তথ্য এই দেশের মানুষ জানে। সেই বিষয়ে তাই আর বিস্তারিত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। শুধু এটুকু বলি, একজন আইনজীবী হিসেবে আমি নিজে দুদকের মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের মামলায় কাজ করেছি এবং আপিল গ্রহণকালেই জামিন পেতে দেখেছি। স্থায়ী জামিন নিয়ে তাদের অনেকেই এখন বিদেশেও আছেন। এটা যদি হয় একজন সাধারণ অভিযুক্তের ক্ষেত্রে, তাহলে বেগম জিয়ার মতো একজন মানুষের ক্ষেত্রে কী হওয়ার কথা ছিল?

জামিন লাভের ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়, তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো—ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থান। আর যে বিষয় আদালত দেখে তা হলো—অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা এবং সাক্ষীকে ভয়ভীতি দেখানো বা আলামত নষ্ট করার ভয় আছে কিনা। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আদালত

যেকোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক জামিন দিতে পারেন। এই আশঙ্কাগুলোর কোনটি বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে সত্য, সেটা বিচারের ভার আমি পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

তাই আমার আইনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, বেগম জিয়ার মামলার মেরিট, তার শারীরিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, বয়স, জেন্ডার সবকিছু বিবেচনায় বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী তিনি তাৎক্ষণিক জামিন লাভের যোগ্য। জামিন পাওয়া তার অধিকার। আর সবকিছু বাদ দিলেও বর্তমানে তার যে শারীরিক অবস্থা, শুধু সেটাও যদি বিবেচনায় নিই, তাহলে আদালত যদি ন্যূনতম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন, তাহলে তাকে জামিন দিতে বাধ্য হতেন।

তার সাম্প্রতিক শারীরিক অবস্থা নিয়ে আমাদের দলের মহাসচিব দুই দিন আগে সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হয়েছে। তিনি এখন বিছানা থেকেই উঠতে পারছেন না। তাকে সবসময় দু'জন সাহায্য করতে হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে, সম্প্রতি তার জিহ্বায় ক্ষত তৈরি হয়েছে। তিনি ভালোভাবে খেতে পারেন না; তীব্র দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। তার নতুন শারীরিক জটিলতা হিসেবে যুক্ত হয়েছে ডায়াবেটিস, যা একেবারেই নিয়ন্ত্রণহীন। সঙ্গে তার হাত-পায়ে আগের তীব্র ব্যথা তো আছেই। তার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় অনেকেই আশঙ্কা করছেন, তিনি হয়তো আর কখনোই পুরোপুরি সুস্থ হবেন না।

গ্রেফতারের পর যখন আদালত থেকে তাকে কারাগারে নেওয়া হচ্ছিল তখনো তিনি সুস্থ শরীরে হেঁটে গাড়িতে ওঠেন, তারপর ক্রমান্বয়েই তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। যেহেতু কারাগারে তিনি সম্পূর্ণ সরকারের হেফাজতে ছিলেন, সুতরাং তার স্বাস্থ্যের এই ক্রমাবনতির জন্য একমাত্র দায়ী করা যায় সরকারকে।

এটা একেবারেই স্পষ্ট, বেগম জিয়া ন্যূনতম প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও পাচ্ছেন না। শুরু থেকেই সরকার তার পছন্দের হাসপাতালে তাকে চিকিৎসা নিতে দিচ্ছে না। কারা অন্তরীণ অবস্থায়ও চিকিৎসার খরচ নিজে বহন করার শর্তে ব্যক্তিগত পছন্দের হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার নজির অনেক আছে। এক এগারোর সরকারের সময় আওয়ামী লীগ নেতা

আবদুল জলিল ও মোহাম্মদ নাসিমকে ল্যাবএইড হাসপাতালে আর শেখ ফজলুল করিম সেলিমকে বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও এই সুবিধা গ্রহণ করে স্কয়ার হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।

এমনকি বর্তমান অবস্থায় পছন্দের হাসপাতালে চিকিৎসার অনুমতিও কোনোভাবেই যথেষ্ট না। বেগম জিয়ার শরীর এখন এতটাই ভেঙে পড়েছে যে, যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুক্ত জীবনে ফিরে আসতেই হবে। আবারও বলছি, শুধু তার বর্তমান শারীরিক অবস্থাই তাকে জামিন দেওয়ার জন্য যথেষ্টের বেশি।

সরকারকে এভাবে দোষারোপ করতে দেখে সরকার এবং তার 'উচ্ছিষ্টভোগী' বুদ্ধিজীবীরা যে কুতর্ক করে, সেটা কেউ করতে চাইতে পারেন, যুক্তি দিতেই পারেন—বেগম জিয়ার জামিন তো আদালতের এখতিয়ার, এখানে সরকারের কিছুই করার নেই। মজার ব্যাপার হলো, এই দেশের অতি সাধারণ মানুষও জানে, দেশে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা বলে আদৌ কিছু বিরাজ করে না। এজন্যই এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কোনও অপরাধ ঘটলে আমরা দেখি ভুক্তভোগীর স্বজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চান। এতে এটা প্রমাণিত হয়, যে বিচার একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার হওয়ার কথা, সেটাও এই দেশে চাইতে হয়। আরও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, বিচার চাইতে হয় নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর কাছে। ওই মানুষগুলোও জানেন, বিচার বিভাগ বলে স্বাধীন কোনও প্রতিষ্ঠান নেই বাংলাদেশে, সবকিছুই আসলে সরকারের হাতে।

এক এগারোর অবৈধ সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে।

এক এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একই ধরনের মামলা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও হয়েছিল। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর সেইসব মামলা হাইকোর্টে 'খারিজ করানো' হয়। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সেই মামালার আপিল করা হয়নি। কেন আপিল করা হয়নি, এমন প্রশ্নের জবাবে দুদকের আইনজীবী মিডিয়ায় জানান, দুদক থেকে তাকে আপিল করতে বলা হয়নি। সেই আপিল করা হলেও কী হতে পারতো, সেই বিষয়ে কথা না হয় না-ই বললাম। এদিকে বেগম জিয়ার মূল মামলা তো বটেই, এমনকি তার জামিন ঠেকানোর জন্য পর্যন্ত সরকার সর্বোচ্চ

আদালতে 'যুদ্ধ করে' যাচ্ছে। এই সরকারের সময়ে এই দেশের বিচার বিভাগ, 'All are equal but some are more equal than others' উক্তিটির এক দুর্দান্ত প্রতিচ্ছবি।

সরকারের হাত থেকে নিম্ন আদালতকে মুক্ত করে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন করার চেষ্টার মাশুল দিয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এসকে সিনহা। শুধু যে তার নামে যে শুধু মামলা দেওয়া হয়েছে তা নয়, পরিস্থিতি তাকে ভিনদেশে অ্যাসাইলাম চাইতেও বাধ্য করেছে। এ ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা দেশের নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সব আদালতকেই একটা স্পষ্ট বার্তা দেয়। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করবো নিম্ন আদলতের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির নীতিমালা সংক্রান্ত শুনানিতে প্রধান বিচারপতির সেই বিখ্যাত উক্তি, 'দেশে আইনের শাসন নেই', 'সরকার নিম্ন আদালত কব্জা করার পর উচ্চ আদালতের দিকেও হাত বাড়িয়েছে'।

বেগম জিয়ার জেলে থাকা মানে শুধু একজন ব্যক্তির জেলে থাকা না, তার জেলে থাকা মানে দেশের আপসহীন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হওয়া মানুষটির জেলে থাকা। তার জেলে থাকা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অনেক ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন করা আমাদের দেশটির সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মতো বিচার বিভাগও একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এই রাষ্ট্র এখন কার্যত টোটালিটারিয়ান চেহারা নিয়েছে।

বেগম জিয়ার জেলে থাকা আসলে একটি উপসর্গ, যেটা আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভেঙে পড়াকেই প্রমাণ করে। তাই বেগম জিয়ার অধিকারের পক্ষে কথা বলা মানে আসলে আমাদের রাষ্ট্রটির কাঠামো টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে শামিল হওয়া।

বেগম জিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে যে কারো দ্বিমত থাকতেই পারে, তার কাজের সমালোচনাও থাকতে পারে যে কারো মনে। সেই দ্বিমত প্রকাশিত হোক, সমালোচনা হোক। কিন্তু তারপরেও সব শ্রেণি-পেশার মানুষের তার মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হওয়া জরুরি। এই লড়াই শুধুমাত্র একটি বিশেষ দল বা মতাদর্শের মানুষের নয়।

আমাদের এটা বোঝা দরকার, এটা শুধু বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার লড়াই না, এটা আসলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি আর ২০১৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাতে উপর্যুপরি রুদ্ধ হওয়া গণতন্ত্রকে মুক্ত করার

সংগ্রাম, আইনের শাসন আর ন্যায়বিচার কায়েমের সংগ্রাম, নির্বাহী বিভাগের কড়াল থাবা থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত করার সংগ্রাম, রাষ্ট্রের মালিকানা গণমানুষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম। তাই এই সংগ্রাম আপনার, আমার, আমাদের সবার।

লেখক : *আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে বিএনপির দলীয় সংসদ সদস্য।*

৩০ জুলাই ২০১৯

ম্যাডাম থেকে মমতাময়ী মায়ের আসনে বেগম জিয়া

মোবায়েদুর রহমান

বেগম জিয়াকে সাজা দেওয়ার পরবর্তী ১১ দিনের ঘটনাবলী দেখে আওয়ামী লীগ ও সরকারি নেতাদের রীতিমত আক্কেল গুড়ুম। তারা ভাবলেন কি, আর হলো কি। খালেদা জিয়ার সাজাকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত কোথাকার পানি কোথায় দিয়ে দাঁড়াবে সেটা এখনো সঠিকভাবে বলতে পারা না গেলেও ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে গড়াচ্ছে তার ফলে আওয়ামী লীগের সব হিসেব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ফলে তারাও এসব বিষয় নিয়ে নতুন করে হিসাব নিকাশ করতে বসেছে এবং দাবার ছক নতুন করে সাজাতে শুরু করেছে। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে, আওয়ামী লীগ এই খেলায় প্রথম রাউন্ডে প্রচণ্ড হোঁচট খেয়েছে। গত ১৭ তারিখ বিকালে গুলশান যাচ্ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে ড্রাইভার বললেন যে, আওয়ামী লীগ নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি প্রশ্ন করলাম, কেন? তার উত্তর, আওয়ামী লীগ এবং পুলিশের ছকটি সাজানো ছিল এভাবে : বেগম জিয়ার ৫ বছরের জেল হবে। জেল হওয়ার রায়টি শুনেই তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে শুরু হবে হুলুস্থুল কাণ্ড। বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ বেগম জিয়ার নেতা কর্মী ও সমর্থকরা সাথে সাথেই আন্দোলনের নাম করে ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক তৎপরতায় মেতে উঠবে। তারা বেপরোয়াভাবে গাড়ি ভাংচুর করবে, গাড়ি ঘোড়ায় আগুন লাগিয়ে দেবে, পুলিশের প্রতি অবিরাম ইষ্টক বর্ষণ করবে এবং সারা শহরে বোমা বা ককটেল ফাটাবে। তাদের এসব কর্মযজ্ঞের ফাঁক দিয়ে এজেন্ট প্রোভোকেটিয়ারা মিছিল বা জনতার মাঝে অনুপ্রবেশ করবে এবং পেট্রোল বোমা বা গুলি করার মতো নাশকতা

চালাবে। ফলে সহানুভূতির পরিবর্তে বেগম জিয়া তথা বিএনপির প্রতি জনগণের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে। এই সুযোগে সরকার ঢাকা মহানগরী থেকে শুরু করে গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত সন্ত্রাস দমনের নামে বিএনপির বিরুদ্ধে চিরুনী অভিযান চালাবে এবং হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করবে। ৮ ফেব্রুয়ারির আগেই কদম ফোয়ারার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ৪ হাজার ২ শত নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই নতুন করে নাশকতার বিভিন্ন মামলা দেওয়া হয়েছে। তাদের অনেককেই এর মধ্যেই রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি রায়ের পর বিএনপি যদি হরতাল বা অবরোধের মতো কর্মসূচিতে যেত তাহলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্তও জাল বিছিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে ছেঁকে তোলা হতো। এদেরকে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে জেলে রাখা হতো এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ইলেকশনের আগে মুক্তি দেওয়া হতো না। এভাবে আওয়ামী লীগ ফাঁকা মাঠে সমানে গোল দিত।

কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব তাদেরকে সেই সুযোগ দেয়নি। গত ১১ দিন ধরে বেগম জিয়ার রায়ের পরে বিএনপি যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে সেটি এক কথায় কারান্তরীণ নেত্রীর অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচায়ক। নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে বিএনপি রাজপথ থেকে পালিয়ে যায়নি। বরং অতীতের যেকোনো সময়য়ের চেয়ে আরো বেশি সংখ্যায় রাজপথ সরব রেখেছে। এবার শুধু জনগণ নয়, আওয়ামী লীগ এবং সরকারের কাছেও স্পষ্ট প্রতিভাত হলো যে, বিএনপির এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পেছনে রয়েছে জনগণের সর্বাত্মক সমর্থন। সেই সাথে একটি সাধারণ ধারণা সব শ্রেণীর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে যে সরকার বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলার মাধ্যমে দণ্ড দিয়েছে যাতে করে বেগম জিয়া এবং তার দলকে নির্বাচনের বাইরে রাখা যায়। এখন এটি ওপেন সিক্রেট যে বিএনপি যদি নির্বাচনে যায় এবং জনগণ যদি ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত যেতে পারে তাহলে শাসকদল শুধু যে হারবে তাই নয়, তাদের হারাটা হবে একেবারে গো-হারা।

এখন বেগম জিয়ার কারাদণ্ড আওয়ামী লীগ এবং সেই সুবাদে তাদের সরকারের জন্য হয়েছে শাঁখের করাত। এধারেও কাটে, ওধারেও কাটে।

এখন তারা কি করবেন? বিভিন্ন ছলছুতা করে বেগম জিয়ার কারাবাস দীর্ঘায়িত করবেন? নাকি তার জামিনের পেছনে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না? এই দুইয়ের দোলাচলে এখন দুলছে আওয়ামী লীগ।

দুই

আওয়ামী লীগ ৬৫ বছরের একটি পুরাতন পার্টি। রাজনীতির বাতাস তারা মোটামুটি বুঝতে পারে। এই ১১ দিনেই তারা বুঝে গেছে যে কারাদন্ড দেওয়ার ফলে প্রতিটি দিন যাচ্ছে আর বেগম জিয়ার জনপ্রিয়তা হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন বেগম জিয়ার জনপ্রিয়তা হবে হিমালয়ের মত উঁচু এবং তিনি হবেন মহা নেতা। ইতোমধ্যেই তিনি সম্মান, সহানুভূতি এবং জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে অনন্য উচ্চতায় উঠে গেছেন। এখন তার লাখ লাখ নেতা ও কর্মী তাকে আর ম্যাডাম ডাকে না। জেলে যাওয়ার পর থেকেই তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন এক মমতাময়ী মাতৃ রূপে। অন্যের কথা বাদই দিন, এমনকি কিশোরগঞ্জের সাবেক এমপি মেজর আকতারুজ্জামান পর্যন্ত মিছিল করছেন এবং আওয়াজ তুলেছেন তিনি এবং তার সমর্থকরা তাদের মাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনবেনই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মেজর আকতারুজ্জামান বিএনপির এমপি ছিলেন। কিন্তু তার কিছু কার্যকলাপ দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তিনি দল থেকে বাদ পড়েন। এখন সেটি ভুলে যেয়ে তিনিও দেশনেত্রীকে মা হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং মায়ের মুক্তির জন্য রাস্তায় নেমেছেন। দেশনেত্রী বা ম্যাডাম থেকে মায়ের মর্যাদায় আসীন হওয়া বাংলাদেশের ৪৭ বছরের ইতিহাসে আমরা দেখিনি। তার প্রতি সমর্থন এবং দরদ যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা যে কতটা গভীর তার কিছু নজির দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আমি অনেক কিছুই বলতে পারতাম। কিন্তু তাতে করে লেখাটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তবুও দুয়েকটি ঘটনা না বললেই নয়।

ধানমন্ডি এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাটে আমি থাকি। এখানকার অধিকাংশ ফ্ল্যাট মালিকদের স্ত্রীরা গৃহিণী। তারা উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু তারা পেশাজীবী বা চাকরিজীবী নন। গত রবিবার ৪জন গৃহিণী এসে বললেন, আমরা তো বেগম জিয়ার জন্য কিছুই করতে পারছি না। বলুন তো ভাই আমরা যদি তার মুক্তির দাবিতে লিখিত গণস্বাক্ষরে সই দেই তাহলে কি

তিনি মুক্ত হবেন? আমি বললাম, মুক্ত হবেন কিনা জানি না, তবে আপনাদের যতটুকু করার ততটুকু তো করলেন। ঐ মহিলারা অতঃপর ৪ জনে একটি গাড়িতে উঠে নয়াপল্টনে গিয়ে স্বাক্ষর দিয়ে এসেছেন। বনানীর একটি বহুতল বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের কয়েকজন নিরাপত্তা প্রহরী এবং ফ্ল্যাট মালিকদের কয়েকজন ড্রাইভার নিজেরা কন্ট্রিবিউট করে জেল গেটে গিয়েছিলেন খাবার নিয়ে। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় তাদেরকে ফিরে আসতে হয়েছে।

এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে মনে হয় সেদিন আসছে, যেদিন এই ঢাকা মহানগরীতেই গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ের কিছু ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী ঘটনা গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে ফিরে আসতে পারে।

এসব দেখে শুনে শাসকদের চিত্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ১১ দিন ধরে মামলার সার্টিফায়েড কপি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। হয়তো এই লেখাটি যেদিন প্রকাশিত হলো তার আগের দিন অর্থাৎ সোমবার তাদেরকে কপি দেওয়া হবে এবং আজ হয়তো তারা আপিল করবেন এবং জামিন চাইবেন। কেন রায়ের এই নকল নিয়ে এমন টালবাহানা করা হলো? এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ ড. কামাল হোসেন বলেছেন যে নকল নিয়ে যা করা হলো সেটি ছিল একটি প্রহসন। এসব রায়ের কপি পেতে তিন দিনও লাগে না। আর এরা ১০ দিনেও সেটি দেয় না। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বেগম জিয়াকে হয়রানী করা।

তিন

প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে শাসক দল একটি নতুন খেলা শুরু করেছে। টেলিভিশন টকশোগুলোতে ৩ জন করে আলোচক আনা হচ্ছে। এরা হলেন একজন আওয়ামী লীগার, একজন জাতীয় পার্টির আরেকজন বিএনপির। আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি তো একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। সুতরাং তারা হয়ে যাচ্ছে দুই, আর বিএনপি হচ্ছে এক। বিএনপির কোনো সিনিয়র নেতা বা অভিজ্ঞ আলোচক আসছেন না। বরং বলা যায় আসতে পারছেন না। এলে পরেই তো টক শো শেষে একেবারে লাল ঘরে। আসল কথা হলো, সরকারের পরিকল্পনা। দুষ্ট লোকে বলে যে আগামী নির্বাচনে সরকার জাতীয় পার্টিকে দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি এবং জাতীয় সংসদে

বিরোধী দল হিসেবে সাজাতে চায়। আর বিএনপিকে থার্ড পার্টি। তবে ইংরেজিতে একটি কথা আছে না Man proposes God disposes.

সেজন্য আওয়ামী লীগের সব ধরনের নেতা এবং টেলিভিশন টকশোর আওয়ামী এবং জাপা পন্থী আলোচকদের মুখে এখন শুধু বিএনপির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। একটি কথা টকশোতে প্রায়ই বলা হচ্ছে যে বেগম জিয়া যেমন কাজ করেছিলেন তেমন ফল পাচ্ছেন। বেগম জিয়া নাকি এরশাদকে গ্রেফতার করেছিলেন। এখন তিনিও গ্রেফতার হয়েছেন। এদের অজ্ঞতা দেখে করুনা হয়। এরা জ্ঞানপাপী। তাদের জানা উচিৎ যে এরশাদকে বেগম জিয়া গ্রেফতার করেননি। তাকে গ্রেফতার করেছিলেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপিত সাহাবুদ্দীন আহমেদ। এরশাদ পদত্যাগ করেন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। সেই দিনই প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালের ১২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট এরশাদ অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার হন। আর খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ। অর্থাৎ এরশাদ গ্রেফতার হওয়ার ২ মাস ৭ দিন পর খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। তবে দুঃখের বিষয়, এসব তথ্য জনগণের কাছে পরিষ্কারভাবে বলতে পারে না বিএনপি। মনে হয় না তাদের কোনো থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে। অতীতেও ছিল না। এখনো নাই।

আরেকটি তথ্য আমার জানা ছিল না। তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে শনিবার ১৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোর ১১ পৃষ্ঠায়। প্রকাশিত নিবন্ধের এক স্থানে বলা হয়েছে, জনতা টাওয়ার মামলায় আপিল বিভাগ এরশাদের সাজা বহাল রাখলে তিনি ২০০০ সালের ২১ ডিসেম্বরে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং মাননীয় বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। তাঁকে কারাগারে পাঠানোর প্রতিবাদ জানিয়ে চার দলের শীর্ষ নেতারা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে খালেদা জিয়ারও সই ছিল। আজ বিএনপি নেতারা যেমন বলছেন, সাজানো মামলায় খালেদাকে ফাঁসানো হয়েছে, সেদিন জাতীয় পার্টির নেতারাও দাবি করেছিলেন, চারদলীয় জোটে যাওয়ার কারণেই সরকারের রোষের শিকার হয়েছেন এরশাদ। এই ঘটনা থেকে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে বেগম জিয়া কোনো সময় নিচু ও সংকীর্ণ মনের মানুষ ছিলেন না। তাই এরশাদের শাস্তির বিরুদ্ধেও তার মুক্তি চেয়ে প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি সই দিয়েছিলেন। অথচ সেই জাতীয় পার্টিই আজ সমস্বরে

এই মর্মে মিথ্যাচার করছে যে বেগম জিয়াই নাকি তাকে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন। ওপরে যেসব ঘটনা বিবৃত করলাম সেসব ঘটনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির রাজনীতির প্রধান ভিত্তিই হলো মিথ্যাচার এবং মিথ্যা প্রোপাগান্ডা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই আজ আলোচনা করা সম্ভব হলো না। সেটি হলো বেগম জিয়ার জামিন পেতে কত সময় লাগবে? এই সব মামলা মোকদ্দমা পেরিয়ে তিনি কি আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন? এ সম্পর্কে আমি লেখার ইচ্ছে রাখি আগামী মঙ্গলবার। অবশ্য এর মধ্যে যদি ভিন্ন ঘটনা ঘটে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।

আজকে এটুকু বলছি যে, বেগম জিয়ার ইলেকশন করা না করার ব্যাপারে আমি কয়েকটি উদাহরণ দেব। এরমধ্যে থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জেনারেল এরশাদ, ভারতের পরলোকগত জয় ললিতা জয়ারাম, ম খা আলমগীর, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, এমপি বদি প্রমুখ।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
উৎস : দৈনিক ইনকিলাব

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবদানের বিপরীতে তাঁর অন্তরীণ থাকা : দেউলিয়া রাজনীতির ঐতিহাসিক স্মারক

প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপি'র সম্মানিত চেয়ারপারসন, গণতন্ত্রের জীবন্ত কিংবদন্তি যোদ্ধা, দেশমাতা, আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ক্ষমতার প্রলোভন, অর্থের প্রলোভন, আপসকামিতা কিংবা ব্যক্তিত্বের অমর্যাদা—কোনোটার কাছেই তিনি মাথা নত করেননি। অবিচলভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৮৬ সালের পাতানো নির্বাচনে না গিয়ে তিনি জনগণের কাছে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করেন। তার সেই আপসহীনতা ও শক্ত ভূমিকা স্বৈরাচার এরশাদের পতনকে সেদিন ত্বরান্বিত করে এবং জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে স্বৈরাচার এরশাদ নিরূপায় হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। অতঃপর আসে ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচন। মানুষ বিপুলভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে ভোট দিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়যুক্ত করে। ইতিহাসের এই যে সংগ্রাম এটি খালেদা জিয়াকে উজ্জ্বল করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নানা প্রলোভন, ফাঁদ খালেদা জিয়া সবসময় উপেক্ষা করেছেন। সরকার তার অবৈধ ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য বিভিন্ন সময় যে অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেছেন, তার সবটাই খালেদা জিয়া সহ্য করেছেন কিন্তু নত হননি। তিনি টিকে আছেন। শুধু একটাই কারণ তার

পিছনে অতীতের মতো এখনো জনগণ অছেন। জনগণকে গুরুত্ব না দিলে আজ ক্ষমতার রাজনীতির হালুয়ারুটির ভাগ তার জন্যও বরাদ্দ হতো। কিন্তু যুগে যুগে স্বৈরাচার হটানোর জন্য জনগণের নেতারা যেভাবে সংগ্রাম করেছেন খালেদা জিয়াও তাই করেছেন। তার দলও তাই করেছে। Strength and Growth Come only through Continuous Effort and Struggle—একদা একথা বলেছিলেন গ্রীক বীর নেপোলিয়ন। বেগম খালেদা জিয়া এই মন্ত্রে সকলকে উজ্জীবিত রেখেছেন।

বাংলাদেশের নিকট অতিত পর্যালোচনা করলেও যে রাজনৈতিক পরিবেশ এখন বাংলাদেশে বিরাজ করছে তা বিবেচনা করলে, এ কথাটা নিসংকোচে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খালেদা জিয়া প্রকৃত অর্থেই গণতন্ত্রের মা (Mother of Democracy)। বাংলাদেশের ৮৫% জনগণ এটা বিশ্বাস করে।

গণতন্ত্রের প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' ও 'ডেমোক্রেসি হিরো' সম্মাননা দিয়েছে কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও)। 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' এবং 'ডেমোক্রেসি হিরো' পদকে ভূষিত হওয়ায় মা, মাটি মানুষের নেত্রী, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আপসহীন নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রক্তিম শুভেচ্ছা ও বিপ্লবী অভিনন্দন। বাংলার অহংকার, বাংলাদেশের অহংকার ও আমার অহংকার। মায়ের গর্বে আমরা গর্বিত। আপসহীন মনোভাবই বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আসা শুরু হয় ১৯৮১ সাল থেকে। ১৯৮১ সালের ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক ও বিশিষ্ট সেক্টর কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে সার্কিট হাউজে কিছু সেনা সদস্যের গুলিতে শহীদ হন। স্বামীর সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর পরই খালেদা জিয়া বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। বলাবাহুল্য, রাজনীতিতে আসার আগ পর্যন্ত খালেদা জিয়া একজন সাধারণ গৃহবধূ ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি বিএনপিতে যোগ দেন এবং ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে তিনি বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল দলের বর্ধিত সভায় তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। পরবর্তীতে, বিচারপতি

সাত্তার অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর, ১৯৮৪ সালের ১০ মে পার্টির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন এবং সেই থেকে এখন পর্যন্ত তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রশ্ন হলো, মা কে? মা কেন? কাকে বলা হয় মা? কেন খালেদা জিয়াকে প্রতিকী অর্থে 'গণতন্ত্রের মা' বলা হচ্ছে আজ? এই লেখার স্বল্প পরিসরে, আমি বাংলাদেশের অতীত রাজনীতির ইতিহাস, কিছু ঐতিহাসিক অজানা অধ্যায় আলোচনা করে এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

আমরা সবাই জানি যে, মা হলো জন্মদাত্রি, অর্থাৎ তিনি সন্তান জন্ম দেন। বাংলাদেশে সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বাদ যদি কোনো মানুষ পেয়ে থাকেন, কোনো মানুষ যদি তার ভোটাধিকার প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতাটি উপভোগ করে থাকেন তবে সেটি সম্ভব হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার কারণে; কারণ, তিনি জনগণের এই গণতন্ত্রকে জন্ম দিয়েছেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রক্তাক্ত একটি অভ্যুত্থানে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিহত হলে বাংলাদেশের রাজনীতি স্বৈরাচার এরশাদের স্বৈরশাসনের জোয়ালে বাঁধা পড়ে যায়। টানা নয়টি বছর তাঁর বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সেই সংগ্রামে আপসহীন ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া।

১৯৮৬ সালের কথা স্মরণ করুন। শেখ হাসিনা জনগণের কাছে দেয়া ওয়াদা সেদিন রক্ষা করেননি। তিনি স্বৈরাচার এরশাদের পাতানো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় বেঈমান খেতাব পান। একথা আজ সবাই একবাক্যে বলবেন যে, এই পাতানো নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণে জনগণের সংগ্রাম সেসময় বাধাগ্রস্ত হয় ও মানুষের দুর্দশা দীর্ঘায়িত হয়। ইতিহাসের এই ক্ষণগুলি কি কখনো মুছে ফেলা যাবে? এটি আছে ও থাকবে। মানুষকে শুধু মনে করিয়ে দিতে হবে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যেমন মানুষকে বহুদল, মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধনকরতঃ সহনশীলতার রাজনীতির পাঠ দিয়েছেন, তার বিয়োগান্তক প্রস্থানের পর, স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও সেই মন্ত্রে উজ্জীবিত রেখেছেন তাঁর দল বিএনপিকে ও দেশের মানুষকে। গণতন্ত্রের জন্য আজও তিনি সংগ্রাম করে চলেছেন।

সংগ্রাম সবসময় যে জ্বালাও পোড়াও মারদাঙ্গা হবে তা নয়। আজ বিএনপি যে সংগ্রামের মধ্যে আছে সেটি তার একটি দূরদর্শী রাজনৈতিক কৌশল। কারণ বিএনপি আগামী দিনের রাজনীতির রসায়ন ও কৌশলটা রপ্ত

করেছে ভালো মতোই। তাই তারা অযথা কর্মীদের শক্তির অপচয়ে আর বিশ্বাসী নয়। ভুলে গেলে চলবে না, ক্ষমতায় থেকে রাজনীতি করা যত সহজ কিন্তু ক্ষমতার বাইরে থেকে দলকে টিকিয়ে রাখা তত কঠিন, সেই কঠিন কাজটি বর্তমানে দৃঢ়তার সাথে করে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত যে চারটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে বিভিন্ন জেলার ১৮টি সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে সবকটিতেই জয়লাভ করেছেন। এখানেই তিনি অনন্য ও অসাধারণ। জনগণ তাকে সবসময় ভালোবেসেছেন। কারণ তিনি সবসময় ছিলেন মা, মাটি ও মানুষের কাতারের সবার প্রিয় দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

২০০৬ সালে যখন মইনউদ্দিন ও ফখরুদ্দীন গংদের ষড়যন্ত্র চলছিল, তখনো খালেদা জিয়া সবরকম চেষ্টা চালিয়েছিলেন সেটি রুখতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আজ যদি সেই দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রটি বিএনপির পক্ষে রোখা সম্ভব হতো তাহলে দেশের ইতিহাস অন্যরকম হতো। বাংলাদেশ সেই যে, পররাষ্ট্রের ক্রীড়নক হতে শুরু করলো, সেই অমানিশার অন্ধকার ক্রমশঃ আজ বেড়ে চলেছে। মইনউদ্দিন ফখরুদ্দীন গং যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেছিলেন সেখানে যে দমনপীড়ন জারি ছিল বিএনপির বিরুদ্ধে, তাতে বিএনপি নির্বাচনের মাঠে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড পায়নি। ফল যা হওয়ার তাই হলো। নির্বাচনী ম্যাজিকের মাধ্যমে বিএনপিকে ধরাশায়ী করা হলো ঠিকই, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতাটাও সেই সাথে চলে গেল। সেই যে পরাজয় বরণ করলো বিএনপি, সেদিন বিএনপি একা পরাজয় বরণ করেনি, দেশের আপামর জনসাধারণের পরাজয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের গণতন্ত্রও পরাজয় বরণ করেছিল সেদিন।

ষড়যন্ত্রের একটা পর্যায়ে এলো ২০১৩ সালের গণজাগরণ মঞ্চ। কীভাবে কোমলমতি তরুণদের আবেগকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী স্বচ্ছতার দাবিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করলো, তা সবার জানা। বিএনপি শুরু থেকে প্রহসনের সবরকম নৈর্বাচনিক উদ্যোগকে সন্দেহের চোখে দেখেছে, যা আজ সময়ের আবর্তে, ঠেকে ও ঠকে, মানুষ সত্য ও সঠিক হিসেবে বিবেচনা করছে। বিএনপি যা বলেছে তাই সত্য হিসেবে পরবর্তীতে প্রতিভাত হয়েছে। এই সরকারের আমলে মানুষ দুটি নির্বাচন পার করেছে। একটাতেও তারা ভোট দিতে পারেনি। মানুষের ভোট দেওয়ার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে কী নির্মমভাবে এই সরকার হরণ করেছে।

একদিকে ভোটারবিহীন সরকার ও অন্যদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন, একদিকে সীমাহীন দলাদলি, অন্যদিকে বিরোধী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে চরম নির্যাতনের স্টিমরোলার। কথায় কথায় মামলা ও হামলা। গুম ও খুন। বাংলাদেশের মানুষ আজ যারপরনাই ত্যক্ত, বিরক্ত ও দিশাহারা। মানুষ এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু কীভাবে তাদের মুক্তি আসবে তা কেউ জানেন না। কবে মানুষের মুক্তি মিলবে, কবে মানুষ বুক ভরে শ্বাস নিতে পারবে, নিসংকোচে ভোট দিতে পারবে তা কেউ জানেন না। জানে না কারণ সবচেয়ে বড় বিরোধীদলটি আজ সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার।

চূড়ান্ত গণতন্ত্রমনা মানুষটি, বেগম খালেদা জিয়া, আজ সবচেয়ে ন্যক্কারজনক অবিচারের শিকার। মিথ্যা, সাজানো মামলায়, প্রহসনমূলক বিচারে খালেদা জিয়াকে বলপূর্বক অন্তরীণ রাখা হয়েছে। তিনি কোথাও যেতে পারছেন না, কোনো বক্তৃতা দিতে পারছেন না, মতপ্রকাশ করতে পারছেন না। এমন কি, তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আজ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবাটুকু নিতে পারছেন না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে মহাজালিয়াতির নির্বাচনের পর অবৈধ শাসকগোষ্ঠী যেন আরও বেশি নিষ্ঠুর বেপরোয়া ও উদ্ধত হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষ দমনে। মিথ্যা জয়ের গরিমায় ধরাকে সড়া জ্ঞান করার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তারা। দেশটা এখন আর জনগণের নেই, সেটা আওয়ামী লীগের একক তালুকদারীতে পরিণত হয়েছে। তাই সরকার বিদ্বেষ ও উগ্রতা দিয়ে বেগম জিয়াকে জুলুম ও নাজেহাল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। আজ খালেদা জিয়া যেন সমগ্র দেশের মানুষের প্রকৃত অবস্থার প্রতীকী উদাহরণে পরিণত হয়েছেন। এই কারণে, আমি খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবদানের বিপরীতে তাঁর অন্তরীণ থাকাটাকে তাই আখ্যা দিয়েছি আওয়ামী লীগের দেউলিয়া রাজনীতির ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে। লিখে রাখুন, ইতিহাস আওয়ামী লীগকে এই প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য একদিন কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

পরিশেষে, আমি একটি কথা বলতে চাই, গণতন্ত্র ও মুক্তি এখন খালেদা জিয়ার মুক্তির সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িয়ে গেছে। আমি আশা করবো, সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে ও তারা খালেদা জিয়ার বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের পথ হতে সরে আসবে। তারা যদি খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার বিচারিক ও প্রশাসনিক

উদ্যোগ করে তাহলে বিএনপির জন্য যতটা ভালো হবে তার চেয়ে বেশি ভালো হবে আওয়ামী লীগের জন্য। আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে জনগণের রোষাণলের হাত হতে কিছুটা হলেও রেহাই পাবে। তা না হলে যে কোনো একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরি হতে পারে যা শেষ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ হবে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিক তারা। গণতন্ত্রের জননী বেগম খালেদা জিয়ার নামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক সকল মিথ্যা-মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিক। অতঃপর, অনতিবিলম্বে বিদেশে তাঁর উন্নত সু-চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব থেকে মুক্তি পাক।

লেখক : *প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম; নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়*

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও বেগম খালেদা জিয়া

অধ্যক্ষ মোঃ তারিকুল ইসলাম

এই ধরাদামে মানুষ এসেছে, আবার প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময় মানুষ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। খুবই সামান্য সংখ্যক মানুষ তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অদম্য মনোবল, দুর্জয় সাহস, অনন্য ত্যাগ, দেশ ও জাতির প্রতি নির্ভেজাল মমত্ববোধ এবং সর্বোপরি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। সময়ের পথ পরিক্রমায় কোনো নিষ্ঠুর বাস্তবতাও তাকে মানুষের মনের মণিকোঠা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে তেমন একটি মহিমা সমৃদ্ধ, গৌরবোজ্জ্বল, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, দ্য আয়রন লেডি, মাদার অব ডেমোক্রেসি। অতিসম্প্রতি কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচ আর আইও) আমাদের মাতৃসম নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের প্রতি তার অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে "মাদার অব ডেমোক্রেসি অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করেছেন। গণতন্ত্রের জন্য এখনও এই ৭৭ বছর বয়সেও তিনি অনমনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন বলেই ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে কারাবন্দী জীবনযাপন করছেন। নিদারুণ ও ঝুঁকিপূর্ণ শারীরিক অবস্থাও তাঁকে তাঁর কমিটমেন্ট থেকে বিছিন্ন করতে পারেনি। কানাডিয়ান হাইকমিশন এই সম্মাননাকে এ্যাডোস করলেও অসৎ উদ্দেশ্যে সদানিয়োজিত বিকৃতচারী কিছু চিহ্নিত ব্যক্তি এ নিয়ে ও অপ্রত্যাশিত বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলে চলেছেন। এসব নিকৃষ্ট মানুষের কোন কথার বিপরীতে কিছু বলা রুচিবহির্ভূত মনে

করছি। শুধু উল্লেখ করতে চাই, একই ধরনের কৃতিত্বের কারণে ২০১১ সালের ২৪ মে নিউ জার্সি স্টেট সিনেটে বেগম জিয়াকে "ফাইটার ফর ডেমোক্রেসী" পদক প্রদান করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট সিনেট কর্তৃক কোনো বিদেশী ব্যক্তিত্বকে এধরনের সম্মান প্রদানের ঘটনা এটাই ছিল প্রথম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি যে, এই সম্মান ও সম্মাননা প্রাপ্তির সময় কিন্তু খালেদা জিয়া ক্ষমতায় ছিলেন না, তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে লিপ্ত থেকে চরম প্রতিকূল পরিবেশেই এগুলি অর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য কেউ কিন্তু একঝুড়ি ড. ডিগ্রি প্রিভিলেজ পিরিয়ডে সংগ্রহ করেছেন।

William Shakespeare এর "Hamlet" থেকে অসাধারণ উক্তিটি উল্লেখ করছি : "Some are born great, some aquire greatness and some are great-greatness thrust upon them" অর্থাৎ পৃথিবীতে কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করে মহৎরূপে, কিন্তু মানুষ মহত্ব অর্জন করে, আবার কোনো কোনো মানুষ মহৎ এ কারণে যে, তাদের উপর মহত্ব আরোপ করা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব, বীরত্ব—এগুলো চাপিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হবে না কারণ এসব তিনি অর্জন করেছেন। এমনকী ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি কানাডা বা যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোনো প্রভাবশালী রাষ্ট্র কিংবা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ক্রেস্ট বা সম্মাননা এগুলো বাংলাদেশের মানুষের নিরঙ্কুশ আস্থা অর্জনের চেয়ে বড় হতে পারে না। নিশ্চয়ই উল্লিখিত প্রাপ্ত সম্মান বা স্বীকৃতি উদ্দীপনামূলক। কিন্তু আমার দেশ, দেশের বিস্তীর্ণ সবুজ-শ্যামল জনপদ, এই প্রান্তরের স্বার্থবুদ্ধিবর্জিত বিবেকবান, সত্যাশ্রয়ী সিংহভাগ সরলপ্রাণ মানুষ খালেদা জিয়াকে গণতন্ত্রের মা হিসেবে ধারণ করেছেন এটাই সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে অনুপ্রেরণার।

১৯৮১ সালের ৩০ মে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা হয় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের ইতিহাসে সফলতম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। এরপর দলের নানা স্তরের নেতাকর্মীদের আহ্বান দল ও দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে উপেক্ষা করতে পারেননি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি বিএনপিতে যোগ দেন তিনি। ১৯৮৩ সালে দেশে এরশাদের সামরিক শাসনে অবসান ঘটাতে দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দলের তৎকালীন চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তার সাহেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে

তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালের ১০ মে দলের চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। মূলত এইসময় থেকেই তাঁর নেতৃত্বেই বিএনপির রাজনৈতিক দল হিসেবে পূর্ণ বিকাশ হয়।

১৯৮২ সালে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ এম এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরশাসনের পতনের পূর্ব পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন দৃঢ়চেতা নেতৃত্বেই বাংলাদেশ গণতন্ত্র আলোর মুখ দেখেছিল। ক্রিয়াশীল প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের স্বৈরশাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ থাকলেও ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ দফা দাবিতে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট ও অন্যান্য দল এবং জোট তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেও এ বছরের ২১ মার্চ তাতে ছন্দপতন ঘটে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পিঠে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে শত শহীদের রক্তের সাথে গাদ্দারী করে আওয়ামী লীগ এরশাদের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ্রগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তারপূর্বে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী চট্রগ্রামের লালদীঘি ময়দানের জনসভায় যারা এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাবে তারা জাতীয় বেঈমান এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনা ঘোষিত জাতীয় বেঈমানের উপাধি তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া! দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সংবাদপত্রের বৃহৎ অংশ, এমনকী বিশিষ্ট নাগরিকগণের উল্লেখযোগ্য অংশের বিএনপি'রও নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিত, না হলে রাজনীতির মেইন স্ট্রীম থেকে ছিটকে পড়ার আশঙ্কা আছে বিএনপি'র এমন সব নছিহত গায়ে না মেখে অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে চরম প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রায় একা তাঁর কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ইট ওয়াজ এ ভেরী রিস্কি চ্যালেজ। কিন্তু বেগম জিয়া ছিলেন অবিচল, লক্ষ্য অর্জনে স্থির, অকুতোভয়ী এক কাপ্তান। শহীদ জিয়ার মন্ত্রিসভার ডাকসাইটে বড় একটা অংশ মন্ত্রী ও সিনিয়র নেতারা এরশাদের ছিটিয়ে দেয়া হালুয়া রুটিতে ভাগ বসাতে দল ও জনগণের সাথে বেঈমানী করেছিল। এমন কি আন্দোলন চলাকালীন অবিশ্বস্ত আচরণের দায়ে বিএনপি'র ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী হিসেবে খ্যাত মহাসচিবকে ড্রপ করে দিয়ে রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচয়ের বনেদি এক ব্যারিস্টারকে মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে সবাইকে যেমন তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি পরে

প্রমাণিত হয়েছিল যে ঐ ঘটনা বেগম জিয়ার অতুলনীয় দূরদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। ১৯৮৭ সালে এককভাবে নেতৃত্ব দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া 'এরশাদ হটাও' শীর্ষক একদফার আন্দোলনের ঘোষণা দেন। একজন দক্ষ কাপ্তানের মতো তাঁরই নেতৃত্বে সামরিক স্বৈরশাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার ইপ্সিত বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছিল। এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দালনকালীন তিনি ৩ বার কারাবন্দীত্বের শিকার হন। গণতেন্ত্রের জন্য সংগ্রামের দীর্ঘ অভিযাত্রায় এ পর্যন্ত তিনি সর্বমোট ৫ বার বন্দী জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন এবং এখনো কার্যত তিনি বন্দী। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৪ সালের ৩ মে এবং ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বর তিনি বন্দী হন। ২০০৭ সালে সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঐ বছরের সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ তাঁকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ এক বছর সাত দিন আটক রাখা হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে বিশ্বাস-অযোগ্য এক মামলায় সরকারের সন্তুষ্টি অর্জনে নিয়োজিত আদালত তাঁকে সাজা দিলে তিনি অদ্যাবধি বন্দী জীবনের নিষ্ঠুরতা ভোগ করছেন।

গণতন্ত্র ও দেশের জনগণের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি অভাবনীয় আস্থা স্থাপন করেন বাংলাদেশের মানুষ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। দেশী বিদেশী সকল প্রভাবশালী মিডিয়া ও বিশ্লেষকদের প্রেডিকশনকে হার মানিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে অবাক করা এক উপাখ্যানের জন্ম দিয়েছিলন বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি। তিনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় মহিলা সরকার প্রধান (পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো প্রথম) হিসেবে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী হন। ফোর্বস সাময়িকীয় বিশ্বের ১০০ ক্ষমতাবান নারী নেতৃত্বের তালিকায় ২০০৪ সালে বেগম জিয়ার অবস্থান ছিল ১৪তম, ২০০৫ সালে ২৯তম এবং ২০০৬ সালে ৩৩তম।

১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর মাত্র ২ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ২ এপ্রিল পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংসদে বিল উত্থাপন করে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটিও তার একটি বড় অবদান। ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ সংসদে এবং ২০০১ সালে অষ্টম সংসদে তিনি নির্বাচিত হয়ে

দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কতকগুলি যুগান্তকারী পদক্ষেপ তাকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। একটি জাতির উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে শিক্ষা। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আদলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি দেশের শিক্ষা বিস্তারে কতখানি অবদান রেখেছে তা বিস্তারিত বর্ণনা করে বলার প্রয়োজন হয় না। নেপলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তি আমাকে শিক্ষিত মা দাও আমি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব— মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বে এই ব্যবস্থা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আজকের বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর যে আধিপত্য তার সূচনা দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার পবিত্র হাতে।

১৯৯১-এর পূর্বে জাতীয় বাজেটে সিংহভাগ ছিল বিদেশ নির্ভরতা। ঋণ এবং সাহায্য ছিল যার মূল। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ অন্যান্য যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে আমরা তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিলাম তাঁর নেতৃত্বেই। অর্থনীতিতে ইমারেজিং টাইগার বা উদীয়মান ব্যাঘ্র হিসেবে আমাদেরকে অভিহিত করেছিল অন্যান্যরা।

কেবল সংসদ নেত্রী হিসেবে নন, সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবেও বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদে ১১৬টি আসনে বিজয়ী হয়ে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়েছে বিএনপি।

বেগম জিয়ার আরেকটি কৃতিত্ব যার কোনো ভাগীদার নেই, বাংলাদেশে তো বটে বিশ্বের ইতিহাসে নজীরবিহীন। তিনি মোট পাঁচবার জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সর্বমোট ২৩টি আসনের ২৩টিতেই বিজয়ী হয়েছেন, রাজনৈতিক জীবনের কোনো নির্বাচনেই তিনি পরাজিত হনটি। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রথম ৪টি নির্বাচনে ৫টি করে আসন এবং সর্বশেষ নির্বাচনে ৩টি আসনে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। এই সীমাবদ্ধতা না থাকলে সংখ্যাটা কত হতে পারতো তা বোধহয় কল্পনা করা যায়। ১৯৯১ সালে বগুড়া-৭, ঢাকা-৫, ঢাকা-৯, ফেনী-১, চট্টগ্রাম-৮। ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-১, ফেনী-২, বগুড়া-৭,

রাজশাহী-২, সিরাজগঞ্জ-২। ১৯৯৬ সালে ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, ফেনী-১, লক্ষ্মীপুর-২, চট্টগ্রাম-১। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদে বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, খুলনা-২, ফেনী-১, লক্ষ্মীপুর-২। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদে বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, ফেনী-১ আসনে তিনি নির্বাচিত হন। এ এক অনন্য রেকর্ড। আমি মনে করি গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বেগম জিয়ার এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব স্থান পাওয়ার যোগ্য।

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বেগম জিয়ার রাজনৈতিক উদারতা, মানবিক আচরণ এবং অন্যকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদানে কার্পণ্য না করা এসব গুণাবলী অন্যদের জন্য অনুকরণীয়। অন্যকে ঘায়েল করতে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মূল হাতিয়ার সেখানে বেগম জিয়ার মনোভাব ও কর্মকাণ্ড রাজনীতিতে তিনি যে একজন অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব সেটা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের এক সপ্তাহ পর সামনে আসে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। দিবসটিতে তিনি তাঁর বাণীতে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার নাম উল্লেখ করার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতির ইতিহাসে কার্যকর অবদানের জন্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নাম যথাযথ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে উল্লেখ করেছিলেন। তাছাড়া প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবর রহমানের মাজার জিয়ারত করেছিলেন। অথচ পক্ষান্তরে অন্যপক্ষের প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের মহাসাক্ষীতো দেশের জনগণ।

স্বাধীনতার পর আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির প্রবল প্রতাপে দেশের মানুষ যখন আত্মপরিচয় ও মর্যাদাবোধের সংকটে পড়েছিল তখন শহীদ জিয়ার কালজয়ী রাজনৈতিক দর্শন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যড়যন্ত্র ১৯৮১ সালের ৩০ মে শহীদ জিয়াকে হত্যার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের নিরবিচ্ছন্ন পথচলাকে বিঘ্নিত করেছিল। ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ এরশাদের ক্ষমতা দখল মূলত সেই শক্তির তাবেদারীর আরেক ভার্সন। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথ পায়ে মাড়িয়ে রাজপথে কঠিনতর তপ্ত রাজনীতির মাঠে বেগম খালেদা জিয়ার পদার্পণ জাতির

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ঘটেছিল। শহীদ জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জেল জুলুম হামলা উপেক্ষা করে ইস্পাতসম দৃঢ়চিত্তে লড়াই করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জনগণের আস্থার একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেই থেকে বহুবিধ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শহীদ জিয়ার আদর্শকে বুকে ধারণ করে আন্দোলন-সংগ্রাম-নির্বাচন, দেশ পরিচালনা এবং তাবেদারী প্রতিরোধের সংগ্রামে সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে হয়ে উঠেছেন দেশনেত্রী থেকে মাদার অব ডেমোক্রেসি। অন্যের হুকুমের দাস বানাতে ৭৫ পূর্বাবস্থায় দেশকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা থেকে একমুহূর্তও বিরত থাকেনি চিহ্নিত কুশীলব এবং তাদের প্রভুরা। তাই তো সাম্রাজ্যবাদী, আগ্রাসনবাদী ও সম্প্রসারণবাদী সেই শক্তি বাংলাদেশকে ঘিরে তাদের স্বার্থ হাসিলের প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিয়েছে বিএনপি এবং তার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। ১/১১ সরকারের সময় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং শহীদ জিয়ার পবিত্র আমানত তাঁদের দুই পুত্রের উপর যে অমানুষিক শরীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য। কথিত দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে একাধিক প্রমাণঅযোগ্য ও বিশ্বাস-অযোগ্য মামলা দিয়ে বিএনপি এবং জিয়া পরিবারের চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করেছিল শেখ হাসিনার সমর্থনপুষ্ট সামরিক সরকার। সেই অস্বাভাবিক সরকারের স্বাভাবিক উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান আওয়ামী সরকারও জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে একই পথে হাঁটছে।

দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি এবং উল্লেখ করার মতো। ১৯৮৬ সালে বেগম জিয়াও যদি পাতানো নির্বাচনে অংশ নিতেন তাহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত কী হতো? আবার ১/১১ সরকারের চাপের কাছে শেখ হাসিনার মতো নতি স্বীকার করে খালেদা জিয়াও যদি দেশের বাইরে চলে যেতেন তাহলে আজকের বাংলাদেশের পরিনতি কী হতো? রাজনীতি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণে সক্ষম বোদ্ধামহলে প্রশ্নগুলি রেখে দিলাম।

বিশেষ করে ১/১১ সরকারের প্রবল চাপ, দুই পুত্রের উপর নিষ্ঠুর অমানবিক অত্যাচারের ভিডিওচিত্র দেখিয়ে কোমল মাতৃহৃদয়ে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টার কাছে হার মানেননি বেগম জিয়া, তাঁকে জোর করে বিদেশ পাঠানোর ষড়যন্ত্র তিনি রুখে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছো, আমি বিধবা হয়েছি কিন্তু তোমরা আমার দুই পুত্রকে যদি মেরেও ফেল তবে আমি সন্তানহারা হবো না। এ দেশের লক্ষ কোটি

দেশপ্রেমিক তরুণ আমার সন্তান, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে শুধু দুই পুত্রকে বাঁচানোর জন্য আমাকে তোমরা দেশছাড়া করতে পারবে না। আমি জন্মেছি এই মাটিতে, অবধারিত যে মৃত্যু সেই মৃত্যুর পরে স্থায়ী ঠিকানা তাও হবে ইনশাআল্লাহ এ মাটিতে। এ মাটিই আমার প্রথম ও শেষ ঠিকানা। সত্যিই তিনি মা! গণতন্ত্রের মা—'মাদার অব ডেমোক্রেসী'।

লেখক : শিক্ষক, সাবেক ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক কর্মী

বেগম জিয়ার প্রস্তাবনা—একটি স্থায়ী নির্বাচন কমিশন গঠনের রূপরেখা

জাকারিয়া চৌধুরী

সকল রাজনৈতিক দল অথবা স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল দল বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে কোন না কোন সময়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে তাঁদের অথবা সেসব দলের প্রতিনিধিদের সমন্বিত জোটের ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্থায়ী নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। গেল ১৮ নভেম্বর হোটেল ওয়েস্টিনে দেশ বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম, বিএনপি সহ বিশ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ, দেশি বিদেশী অতিথিসহ সমাজের নানান শ্রেণী পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সামনে তিনি তাঁর প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। যার মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতির প্রতি জোটের পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরেন।

তাঁর পুরো বক্তব্যে যে সকল বিষয় স্পষ্ট হয়ে সামনে এসেছে তা হচ্ছে—অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ, সৎ, দক্ষ ও সাহসী নির্বাচন কমিশন গঠনের কোন বিকল্প নেই। এ ধরনের একটি কমিশন গঠনের মৌলিক প্রক্রিয়া, যোগ্য লোক বাছাইয়ের মাধ্যমে সমন্বিত করণ, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনমনের ভীতি দূরীকরণ ও জন আস্থা ফিরিয়ে এনে একে আনন্দমুখর করে তোলা। প্রজাতন্ত্রের বিতর্কিত ও প্রকাশ্য আনুগত্য পোষণকারী কর্মচারীদের চিহ্নিত করণ এবং তাদেরকে যে কোন নির্বাচনী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখা, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা-ই ছিল এই প্রস্তাবের মূল বিষয়।

বর্তমানে যে আজব দুর্গন্ধময় এবং সঙ'য়ে পরিপূর্ণ, প্রকাশ্যে আনুগত্যকারী ভাসমান, পদলেহনকারী নির্বাচন কমিশন রয়েছে তাঁর মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মে শেষ হবে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ এবং এ কমিশনের পরে নতুন যে কমিশন গঠিত হবে, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সেটার অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বুকে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক, চাতুর্যপূর্ণ, প্রহসনে ভরা, কুকুর বেষ্টিত যে নির্বাচন (যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পেছনে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার দোহাই দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যেই সকলের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি আরেকটি নতুন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। এ জাতি শেখ হাসিনাকে যেমন জানেন, নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা তেমন ব্যবহার করেছেন। বেমালুম ভুলে গেছেন পুরো বিষয়টা) হয়েছিল। এরপর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নানা দিক দিয়ে গুরুত্ব বহন করে। আর এ কারণেই নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন, নির্বাচনী কাঠামোকে যুগোপযোগী করা তথা নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন ও শক্তিশালী করণ এবং নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সরকারের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়—একটি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্নকরণ এবং নির্বাচনোত্তর শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে।

গণতন্ত্র একদিনের কোনও পায়ে হাঁটা সহজ পথ নয়। আজকের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রই হয়তো একশ বছর পার করে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের রূপ পায়। আর এ কাঠামোর মাধ্যমেই জনমতের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। বাংলাদেশের সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে, 'দেশের সকল ক্ষমতার উৎস এর জনগণ'। সেই জনগণ তাঁদের স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতি পাঁচ বছর পর ভোটের মাধ্যমে তাঁদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন। আর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এই জনপ্রতিনিধিরা জনগণের কাছে তাঁদের জবাবদিহিতা দিতে বাধ্য। আবার যেসকল সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নন, তাঁদের জবাবদিহিতার প্রশ্ন হুমকির মুখে পড়ে। ফলে গণতন্ত্রের অন্যান্য বাহন বা নিয়ামক যেমন—আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, সুশাসন, মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার, বিচার বিভাগের

স্বাধীনতা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা সবই সেই অনির্বাচিত সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকারকে তখন তার ন্যায্যতা, যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্ষমতা প্রমাণ করতে গিয়ে নানান ফন্দিফিকির আর ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়। নতুন নতুন ফর্মুলার মুলা ঝুলিয়ে জনগণকে চমক দেখিয়ে ব্যস্ত রাখতে হয়। গত ক'বছরে আমরা এমন সব আজব কর্মকা দেখেছি। 'আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র', 'বেশি উন্নয়ন কম গণতন্ত্র', 'সীমিত গণতন্ত্র' ইত্যাদি নানা অগণতান্ত্রিক ফন্দি, যার কোনোটিই সাংবিধানিক পথ নয় এবং এসব কলা রাষ্ট্র, সরকার বা জনগণের জন্য শুভ পরিণতি বয়ে আনে না। আবার গণতন্ত্রের প্রধান বাহন যে নির্বাচন—তা যদি একটি দক্ষ, যোগ্য, সৎ, নিরপেক্ষ, সাহসী ও কার্যকর নির্বাচন কমিশনের অধীনে না হয়—তাহলে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এ কারণেই একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রথম ও প্রধান শর্ত। নির্বাচন কমিশন গঠন সম্পর্কে আমাদের সংবিধানের ১১৮ ধারায় পরিষ্কার বলা আছে—'প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দান করবেন।'

দুঃখজনক হলেও সত্য, এ আইন বা বিধানাবলি আজো প্রণীত হয়নি। ঠিক সে কারণেই নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে বিতর্কের ধারাও অব্যাহত আছে। আর তাই নির্বাচন কমিশন গঠন ও তা শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে, একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায়, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন বাঞ্ছনীয়। তবে যত দিন পর্যন্ত না আইন করে নির্বাচন কমিশন গঠনসংক্রান্ত স্থায়ী ব্যবস্থা প্রণীত হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত সবার ঐক্যমতের ভিত্তিতে কী করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন ও তা শক্তিশালী করা যায়, সেটিই ছিল বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপরিউক্ত সুপারিশমালা প্রদানের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের সদ্য সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেত্রীর নির্বাচন কমিশন নিয়ে পুনর্গঠন প্রস্তাবনা চর্বিতচর্বণ ও অন্তঃসার শূন্য। তাঁর এ প্রস্তাবনা প্রমাণ করেছে যে, তিনি জনগণের উপর আস্থাশীল নন। তিনি এমন কিছু প্রসঙ্গ এনেছেন যা ইতোমধ্যেই আমাদের সংবিধান বা নির্বাচনী আইনে অন্তর্ভুক্ত আছে। তিনি আওয়ামী লীগের পুরানো অভ্যাসমত কথায় কথায় অতীত টেনে এনে বলেন, বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতিকে যে সংলাপ অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন, তা খুবই হাস্যকর। কারন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংলাপ আহ্বানকে অসম্মান দেখিয়েছেন। তাঁর পুত্র বিয়োগের পর প্রধানমন্ত্রী তাকে সমবেদনা জানাতে গুলশান কার্যালয়ে গেলে তিনি কার্যালয়ের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিয়ে সংলাপের সম্ভাবনাকে চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। (পাঠক, খেয়াল করুন নির্বাচনের আগে হাসিনার উসিলা ছিল সংবিধান সুরক্ষা এবং আজকে ওবায়দুল কাদেরের উসিলা হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া কেন দুয়ার বন্ধ রাখলেন সেজন্য আলোচনা হবে না। অথচ, কিছুদিন আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতারা মুখে ফেনা তুলে ফেলছিলেন এই বলে যে, বেগম খালেদা জিয়া কেন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করছেন না। এটি যেন মেষ শাবক আর সিংহের একই ঘাঁটে পানি খাওয়ার গল্পকে মনে করিয়ে দেয়।) তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, ‘কোনও প্রেসক্রিপশন দেওয়ার আগে খালেদাকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ানো, যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার চেষ্টা, মানি লন্ডারিং ... ইত্যাদি ইত্যাদির জন্যে। এখানে পাঠকদের আরেকটা বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই। যারা শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে সাংবাদিকরা যখন হাসিনার মতামত জানতে চাইলেন তখনও তিনি ওবায়দুল কাদেরের কথাগুলোই যেন প্রতিধ্বনিত করলেন। একটা শব্দ কিংবা একটা বর্ণ পর্যন্ত এদিক সেদিক হয়নি। এর মানে দাঁড়ায়, বেগম খালেদা জিয়ার প্রস্তাবনা শুরুর আগেই তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত ছিল। তাঁদের দুজনের কেউই এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে এগিয়ে এলো না, বেগম খালেদা জিয়া তাঁর প্রস্তাবনায় কি কি ভুল করেছেন, কোথায় কোথায় তাঁরা দ্বিমত করছেন কিংবা কোথায় কোন সমস্যা আছে যার কারনে একে গ্রহণ করা যাচ্ছে না? তাঁদের

আচরন রয়ে গেল ৬০-এর দশকের আওয়ামী লীগের মতই যা তাঁদের মত নয় তা অবশ্যই শত্রুদের মত। সুতরাং, ভিন্ন মত দেখলেই চালাও তলোয়ার। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় জনমানসের মনে আশা যুগিয়েছে। যে প্রস্তাবনা আওয়ামী লীগ ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে সে প্রস্তাবনই গ্রহন করেছে এদেশের সাধারন মানুষ, কিছু কূটনীতিক এবং সাবেক দুই-একজন নির্বাচন কমিশনার। তাঁরা বলেছেন এটি ভাল প্রস্তাব এবং নিঃসন্দেহে এটি আলোচনার দাবি রাখে। মাঝখানে জামাতকে টেনে এরা আবারো আগের মতই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করেছিল যা হালে পানি পায়নি।

এই বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী অন্য এক আলোচনা সভায় বলেন, ‘বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের প্রধান নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এ নিয়োগ কোন পদ্ধতির মাধ্যমে হবে সেটা সংবিধানে উল্লেখ নেই। এ সমস্যাটির সমাধান রয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার প্রস্তাবনায়।’ জনাব খসরু সাহেব বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দেবার পরেও এরা আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি বলেছেন, তিনি আর কোনো প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন চান না। প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন আসলে কেউই চায় না। কিন্তু নির্বাচন যাতে আর প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকেই। প্রশ্নমুক্ত নির্বাচনের প্রাথমিক শর্তই হলো একটি প্রশ্নমুক্ত ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন। তাই সরকারের এ বিষয়ে সদিচ্ছা কতটুকু বা পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন সরকার আসলে কেমন দেখতে চায়, সেটা পরিষ্কার হবে ২০১৭ সালের নির্বাচন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়েই।

** বিভিন্ন সূত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে।*

৬ ডিসেম্বর ২০১৬

বেগম জিয়া—একদলীয় শাসনের পথে একমাত্র বাধা

ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে তথাকথিত দুই কোটি টাকার মিথ্যা দুর্নীতি মামলার সাজানো রায়ে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক হিংসার কারণে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। করোনাভাইরাস মহামারির কারণে ২৫ মাসের বেশি সময় পর দুইটি শর্তে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। সেগুলো হলো, এই সময়ে তাঁর ঢাকায় নিজের বাসায় থাকতে হবে এবং তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না। কিন্তু, বেগম জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর থেকেই বিএনপি ও সমমনা জোট তার মুক্তির দাবিতে রাজপথে নানা কর্মসূচি পালনসহ আদালতে বিচারকি প্রক্রিয়ায় জামিনের চেষ্টা করেছে। জামিন যোগ্য মামলায় বারবার তার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে আদালতে। এমনকি সুচিকিৎসার জন্য মানবিক কারণেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

বেগম খালেদা জিয়াকে, জিয়া পরিবার ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিকে ধ্বংস এবং রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে ২০০৭ সালের এক এগারোর সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে-বিদেশে জিয়া পরিবার ও বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির তৎকালীন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে টার্গেট করে এগোতে থাকেন। দুর্নীতি ও বিদেশে অর্থ পাচারসহ বিভিন্ন কল্পকাহিনী তৈরির মাধ্যমে বেগম জিয়া ও তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার করে শারীরিক ও

মানসিক ভাবে নির্যাতন এবং চরিত্র হনন করেন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তার ধারাবাহিকতায় বর্তমান ভোটারবিহীন মিডনাইট অবৈধ সরকার ও তার দোসরা জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে জনগনের কাছে হেয়প্রতিপন্ন ও ধ্বংস করার জন্য বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষনা করেন। বর্তমান মিডনাইট অবৈধ সরকার বেগম জিয়া ও তারেক রহমান'র বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির নামে এক পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে। এসবের সাথে সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন যন্ত্র, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মি এবং বর্তমান দালাল মিডিয়ার কিছু অসৎ লোকজন জড়িত। ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ১১ বছর অনেক চেষ্টা তদবির করেও বর্তমান অবৈধ সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও প্রমান করতে পারেনি। তারপরও অবৈধ সরকার, আওয়ামী লীগ ও দালাল মিডিয়ার অসৎ লোকজনের বেগম জিয়া ও তারেক জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার থামেনি।

অক্টোবর ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশ সফর করে এসে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। বিদেশ সফরের বিষয়বস্তু নিয়ে এরকম সংবাদ সম্মেলন একটি চিরাচরিত বিষয়। কিন্তু তখনকার সংবাদ সম্মেলনে লক্ষণীয় বিষয় ছিল বিদেশ সফরের বিষয়বস্তুর বাহিরে সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে ভোটারবিহীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উষ্মা প্রকাশ করে দেশের গণমাধ্যমের প্রতি গুরুতর অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার পরিবার সৌদি আরবসহ বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করেছেন এবং সেখানে মার্কেটসহ আরো অনেক কিছুতে বিনিয়োগ করেছেন। এসব সংবাদ বিদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশের পরও দেশের তিনটি পত্রিকা ছাড়া আর কোনো পত্রিকা সেই সংবাদ প্রকাশ করেনি। এই অভিযোগ এনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমকে শুধু অভিযুক্তই করেননি, রীতিমতো ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অসত্য কল্পকাহিনী। এই মিথ্যা কল্পকাহিনী ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে বক্তব্যের মাধ্যমে। সেসময় জাতীয় সংসদে তিনি বলেন,

জিয়া পরিবারের ১২টি দেশে ১২শ' কোটি টাকা পাচার সংক্রান্ত গ্লোবাল ইন্টিলিজেন্স নেটওয়ার্ক (জিআইএন) রিপোর্ট সরকারের হাতে এসেছে। এ নিয়ে তদন্ত চলছে। তদন্তে প্রমাণিত হলে যারা দেশের জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে পাচার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সঙ্গে পাচারকৃত অর্থ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে ফেরত আনা হবে। এত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দেশের গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলার আগে কেনো প্রকাশিত হলো না। এজন্যেও তিনি গণমাধ্যমকে ভর্ৎসনা করেন। এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অসত্য কল্পকাহিনী প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভূমিকা যে দু-তিনটি গণমাধ্যম পালন করেছে তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী সম্পাদিত দ্য ডেইলি অবজারভার। তারপর থেকে ডেইলি অবজারভার ও সরকারের আজ্ঞাবহ কিছু দালাল মিডিয়া জিয়া পরিবারের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ পাচারের কল্পকাহিনীর বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করছে। জিয়া পরিবারের দুর্নীতির এসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর সংবাদের উৎস বলা হয়েছে, আরবভিত্তিক একটি টিভি চ্যানেল জিআইএনকে (গ্লোবাল ইন্টিলিজেন্স নেটওয়ার্ক) উদ্ধৃত করে এবং কানাডার টিভি চ্যানেল দ্য ন্যাশনাল এই খবর দিয়েছে। রোহিঙ্গা ইসুতে বাংলাদেশের চেতনাধারী দালাল মিডিয়ার যে সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে শান্তিতে নবেল পাইয়ে দিচ্ছিলেন, সে সাংবাদিক জিয়া পরিবারের দুর্নীতির তথ্যসূত্র হিসেবে 'আরব নিউজ' পত্রিকার কথা বললেন। তিনি বললেন, 'আরব নিউজসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরও কিছু পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আরব নিউজের সম্পাদক আল জাজিরার সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়েও জিয়া পরিবারের টাকা পাচারের কথা বলেছেন। গত সেপ্টেম্বরে দৈনিক জনকণ্ঠ লিখেছিল জিয়া পরিবারের দুর্নীতির প্রমাণ সরকারের হাতে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদেও যা বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের পর বিএনপির পক্ষ থেকে দুর্নীতির বিষয়টি কাল্পনিক ও অসত্য বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা না চাইলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এর উত্তরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আল জাজিরা এবং গার্ডিয়ান জিয়া পরিবারের দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই সময় সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা জিয়া পরিবারের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের উপর বিশ্লেষণধর্মী ও অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেছেন। তিনি জিয়া পরিবারের দুর্নীতির খবরটির

কোনো সত্যতা বা অস্তিত্ব খুজে পাননি। ইন্টারনেটে অনেক খুঁজে জিয়া পরিবারের দুর্নীতির খবরতো দুরের কথা গ্লোবাল ইন্টিলিজেন্স নেটওয়ার্ক এবং দ্য ন্যাশনাল নামে কানাডার কোনো টিভি চ্যানেলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আরব নিউজ, আল জাজিরা এবং গার্ডিয়ান বিভিন্ন পত্রিকার ওয়েবসাইটে ঢুকেও অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার দাবিকৃত জিয়া পরিবারের দুর্নীতি বিষয়ক কোনো সংবাদের লিংক বা অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

পক্ষান্তরে, দেশিবিদেশি গনমাধ্যমে প্রতিনিয়ত দেশের দুর্নীতি, অর্থ লুটপাট ও বিদেশে অর্থ পাচারের খবর প্রকাশিত হয়। গত দশ বছরে শুধু বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে থেকে ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকারও বেশি লুটপাট, চুরি বা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড়? ও কুখ্যাত অর্থ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত রাষ্ট্রীয় সোনালী ব্যাংক। ২০১০ এবং ২০১২ সালে সোনালী ব্যাংকের ঢাকাস্থ এক শাখা অবৈধভাবে ৪৫৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করে। জনশ্রুতি আছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৎকালীন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডা. মোদাসেরের তদবিরে ৩৪৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ হলমার্ক গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ ও তার স্ত্রী জেসমিন ইসলামকে দেওয়া হয়। এই ঋণ অবৈধভাবে কোম্পানি ক্রেডিটের কল্পিত, মিথ্যা, জাল ও প্রতারণামূলক চিঠির বিপরীতে ইস্যু করা হয়। শেয়ারবাজার থেকে ২০১০ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৫,০০০ কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছে। শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে লাখ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সর্বস্বান্ত হয়েছে। ইনভেস্টিগেশনে মূল অভিযুক্তের তালিকায় সালমাল এফ রহমান, ফালু, লুৎফর রহমানের প্রতিষ্ঠানসহ আরও অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উঠে আসে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত কারও নামে বা কোন প্রতিষ্ঠানের নামে সরকার মামলা করে নাই। ডেসটিনির মাধ্যমে ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ৪,১১৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই অর্থ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত রফিকুল আমীন। ২০১২-২০১৩ সালে বেসিক ব্যাংক থেকে ৪,৫০০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ বা লুটপাট করা হয়েছে। এই ঘটনার সাথে জড়িত ও মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী এবং বর্তমান ক্ষমতাসীনদলের আশীর্বাদপুষ্ট। বিসমিল্লাহর মাধ্যমে ২০১১-২০১২ সালে দেশের সাধারণ মানুষর ১, ১০০

কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছে। খাঁজা সোলায়মান এবং নওরীন হাসিব এই অর্থ কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ৮০০ কোটি টাকা চুরির হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশী-বিদেশী প্রভাবশালী কর্মকর্তা, পর্দার আড়ালের রাঘববোয়াল ও একটি সংঘবদ্ধ চক্র এই অর্থ লুটপাট এবং চুরির সাথে জড়িত। এসবের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশের দুর্নীতি এবং বিদেশে অর্থ পাচারের সাথে জড়িত সরকারি ও বিরোধী দলের রাঘববোয়ালসহ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম পানামা পেপারস এবং প্যারাডাইস পেপারসে আছে। সরকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল দুর্নীতি, অর্থ লুটপাট ও অর্থ পাচারের তদন্ত করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা। কিন্তু, বর্তমান সরকার দুর্নীতি ও অর্থ কেলেঙ্কারির মূল নায়ক এবং অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় না নিয়ে উল্টো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এইসব লুটেরাদের ছাড় দিচ্ছে। বিপরীতে, অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও তাদের দালাল মিডিয়া জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের কাল্পনিক ও অসত্য কাহিনী প্রচার করাচ্ছে। বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে ধ্বংস এবং রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য সুপরিকল্পিত বেগম জিয়া ও তারেক রহমান বিরুদ্ধে এক পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে। এত কিছুর পরও ব্যর্থ হয়ে, ২০১৮ সালে ফেব্রুয়ারি ৮ বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে তথাকথিত মিথ্যা দুর্নীতি মামলার সাজানো রায়ে ৫ বছরের জেল এবং দুই কোটি টাকা জরিমানা করে কারাগারা বন্দি করে। গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের কোনো সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও ১০ অক্টোবর ২০১৮ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়ার মাধ্যমে পুনরায় প্রমাণিত করলো যে, এদেশে কোনো নাগরিকেরই আর সুবিচার পাওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়াও, গত ১৩ বছরে বিএনপির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ, আর তাতে আসামী করা হয়েছে ১৮-২০ লক্ষ নেতাকর্মীকে। বিগত বছরগুলোতে বিএনপির ১২-১৪ হাজারের বেশি নেতা-কর্মী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার এবং ৩০০-৩৫০ নেতাকর্মী গুম হয়ে এখনো ফিরে আসে নাই। এসব জিয়া পরিবার ও বিএনপির বিরুদ্ধে সম্প্রতি সময়ে দেশে চলমান বিদ্বেষপূর্ণ, ঘৃণ্য, প্রতিহিংসামূলক ও অসুস্থ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। তাই,

বিএনপি ছাড়াও দেশের সাধারণ জনগণ, অরাজনৈতিক সুশীলসমাজ, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী রাষ্ট্র বেগম জিয়ার বিচারের বিশ্বাসযোগ্যতা ও ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং বেগম জিয়া ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে। খালেদা জিয়াকে রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য বর্তমান অবৈধ সরকার পরিকল্পিতভাবে এসব করছে। সরকার মনে করেছিল দলের চেয়ারপার্সনকে কারাগারে নিলে তার মুক্তির জন্য বিএনপির নেতাকর্মীরা জ্বালাও, পোড়াও এবং ধ্বংসাত্মক আন্দোলন করবে এবং দলের ঐক্য বিনষ্ট হবে। বিএনপি চেয়ারপার্সনের নির্দেশমতো বিএনপি দলীয় নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে নিয়ে ক্ষমতাসীনদের বৈরী আচারণ সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছে। বর্তমান অবৈধ সরকার ও সরকারি দল শত চেষ্টা করেও বিএনপিতে ভাঙ্গন ধরাতে পারেনি। এটা বিএনপির এক বিস্ময়কর সাফল্য। বিএনপি এখন সারা দেশ অনেক বেশি সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ। তাই অবৈধ সরকারের চক্রান্ত সফল হয় নাই। পক্ষান্তরে, কারাবন্দি পর বেগম জিয়া আগের চেয়ে এখন আরও বেশি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী। ৮ ফেব্রুয়ারি মিথ্যা মামলার সাজানো রায়ের পর বেগম জিয়া দেশনেত্রী থেকে দেশমাতাতে পরিণত হয়েছেন। তিনি দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও রনাঙ্গনের যোদ্ধা এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী এবং দেশের জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তিনি জিয়ার আদর্শ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গনতন্ত্রের প্রতীক। শত বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম, নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যে থেকেও তিনি যেটা অন্যায় মনে করেন তার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবেন। তিনি কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি এবং করবেনও না– এটা মানুষের বিশ্বাস। দেশের মানুষ মনেপ্রাণে এটাও বিশ্বাস ও কামনা করে যে, বিএনপির চেয়ারপারসন দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সমুন্নিত রাখবে এবং মানষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জয়ী হবে।

লেখক : *সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র*
১৫ আগস্ট ২০২০